অদ্রীশ বর্ধন
দ শ র হ স্য
১ম পর্ব

# দশ রহস্য

## ১ম পর্ব

## অদ্রীশ বর্ধন

সঙ্কলন - বাবুই পাখি

পশ্চিমবঙ্গ

# সূচীপত্র

নিছক ভালোবাসা থেকে এক সময় নিজের পছন্দের গল্প- উপন্যাস বা অন্য ধরনের রচনা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করতে থাকি।

বাজারে যতই সেই বইটি পাওয়া যাক, কিম্বা সমগ্র হিসেবে মিলুক, মূল লেখা এবং তাঁর অলঙ্করণ কেউ কোনো মূল্যেই ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কালের গর্ভে তা হারিয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে অনুজপ্রতিম এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিল, এই অমূল্য সংগ্রহ শুধু নিজের জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে উৎসাহিতদের সঙ্গে শেয়ার করে নেবার জন্য। তাই একে একে এধরনের নতুন একটা সংগ্রহ সকলের সঙ্গে শেয়ার করতে চেয়েছি।

১৯-২০ থেকে গল্প সংগ্রহ দিয়েছি।

এভাবেই এবারে নিয়ে আসছি অদ্রীশ বর্ধনের রহস্য গল্প সংগ্রহ "দশ রহস্য"। গল্প গুলিকে সহজে খুজে পাবার জন্য সুচীতে হাইপারলিংক করে দিলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই এ ধরনের প্রয়াস চলতে থাকবে।

– সংকলক।
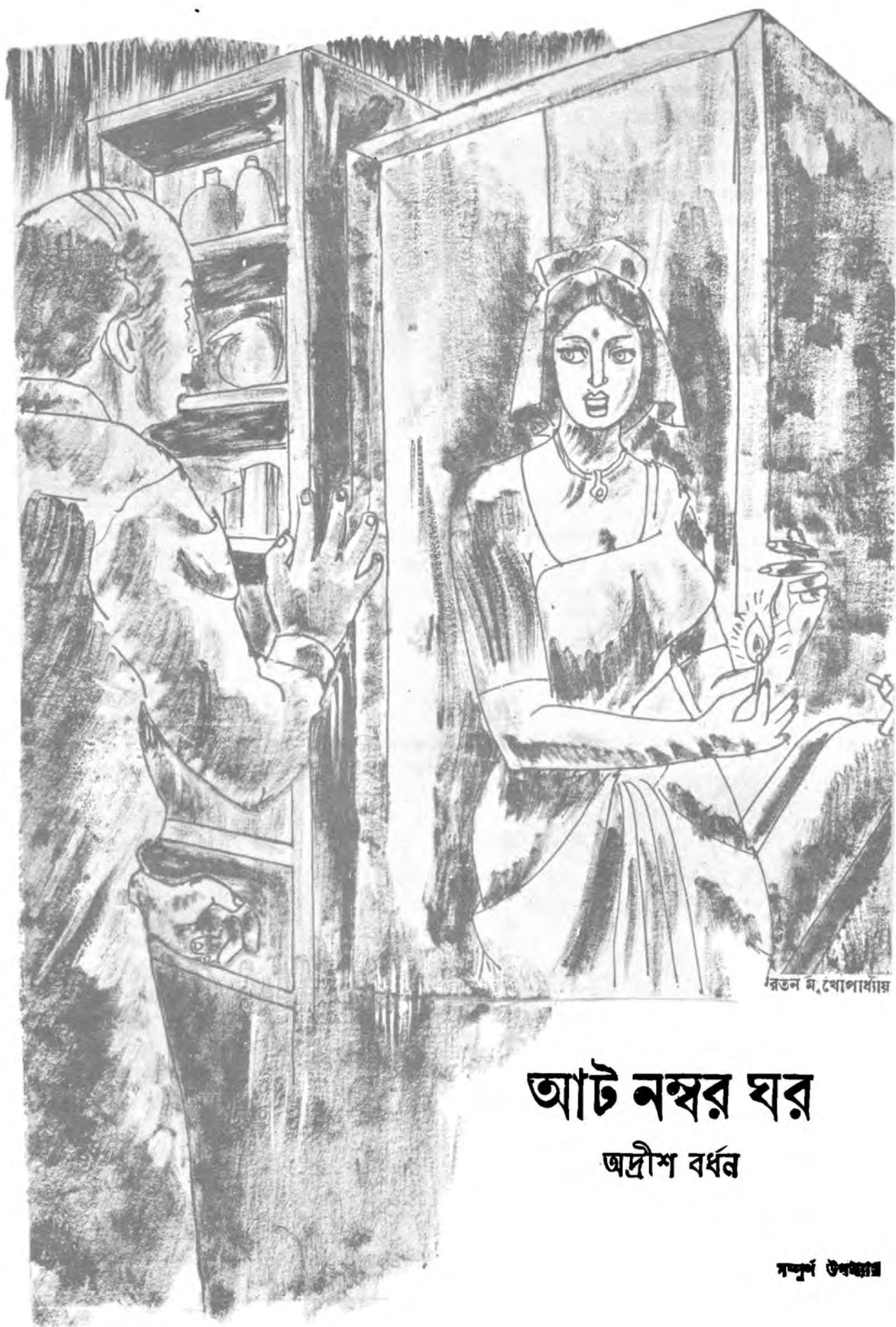
# আট নম্বর ঘর

অদ্রীশ বর্ধন

সম্পূর্ণ উপন্যাস

একটু ভনিতা

ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে যাঁরা চেনেন, জানেন, ভালবাসেন —অবিশ্বাস্য এই কাহিনী শুধু তাঁদের জন্যে। তাকে যারা চেনেন না, জানেন না, ভালবাসেন না—তাঁদের জন্যে নয়।

কারণ, ইন্দ্রনাথ রুদ্র, গোয়েন্দা ইন্দ্রনাথ রুদ্র, শুধু একটা চলমান বিস্ময়ই নয়—তার কীর্তিকলাপও অতীব বিস্ময়কর এবং ধাঁধার দ্বন্দ্ব জাগায় মনের মধ্যে।

কিন্তু এই যে কাহিনীটা আজ আমি লিখতে বসেছি, এরকম রোমাঞ্চকর আর আশ্চর্য কাহিনী এর আগে কখনও লিখিনি। ইন্দ্রনাথ নিজেও বলেছে মৃগাঙ্ক, তুই বিশ্বাস কর, কলকাতার বুকেই যে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে চলেছে—দুদিন আগেও তা কেউ বললে বিশ্বাস করতাম না।

হ্যাঁ, এই ঘটনা, গায়ে-কাঁটা দেওয়া ঘটনাই বলতে পারেন, শুরু হয়েছিল মাত্র দু'দিন আগে— শেষ হয়েছে আজ ভোরে।

জানি না, সম্পাদক মশায় লেখাটা ছাপবেন কি না? যদি ছাপেন, মৃত্যু-মহিল শিহরিত করবে অনেককেই। তখন কি আর এই ভয়াবহ প্রতিষ্ঠানের কাণ্ডকারখানা চেপে রাখা সম্ভব হবে?

ক্রাইসিস্ ম্যানেজার ওরফে ভাঙাকুলো

যদিও তিনি আর্ট ডিরেকটর, কিন্তু কোম্পানীতে তাঁর নাম হয়ে গেছিল ক্রাইসিস্ ম্যানেজার। ম্যানেজিং ডিরেকটর অবশ্য তার বাংলা তর্জমা করেছেন—ভাঙাকুলো।

ভাঙাকুলোই বটে। কোম্পানীর যেখানে যত সমস্যা, সব কিছুর সমাধান করে চলেছেন এই ভদ্রলোকটি। চেহারাটাও তেমনি। রীতিমত খানদানী। ইয়া গোঁফ, টকটকে ফর্সা রঙ, ছ ফুট হাইট, ঈগল পাখির মত নাক, ঢাকের বাদ্যির মত গুরু-গম্ভীর গলা।

শিল্পী নির্দেশকবললতেই যে বাংলা চেহারার আকৃতি চোখের সামনে ভেসে ওঠে—মোটেই সেরকম নয়।

বন্ধুরা অবশ্য তাঁকে মালু বোস ডাকে। ক্রাইসিস্ ম্যানেজার মালু বোস। মাল হজম করতে তার মত ওস্তাদ এ প্রতিষ্ঠানে আর কেউ নেই। মাল অর্থে, সুপের সুরা। মন্দা বাংলায়—মদ।

আকণ্ঠ খেতেও পারেন বটে মালু বোস। না খেলে নাকি ব্রেনও খোলে না। চার-চারখানা ম্যাগাজিন বার করতে হয় সাতদিন আর পনের দিন অন্তর। নাইট ডিউটি পড়ে হরদম। মালু বোস তাঁর জাদরেল বপুটা নিয়ে রাতের আসর জমিয়ে দেন স্রেফ মাল খেয়ে এবং ভয়ানক স্পীডে কাজ করে। সাতদিনের বাকি কাজ তুলে দেন একরাতেই। কঠিন কঠিন ছবির কল্পনা ভুড়ভুড় করে ওঠে মগজের মধ্যে নাইট ডিউটি আর বোতলের যুগল মিলন ঘটলেই

এই রকমই একটা রাতে পৃথিবী বলে মেয়েটা আলুথালু বেশে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে ঢুকল তাঁর চেম্বারে।

মালু বোস তখন অরণ্য গভীর মার্কা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে আর চিৎপুরের লুঙ্গি পরে মনের আনন্দে মাল খাচ্ছেন আর ভারি সুন্দরী মেয়ের ছবি আঁকছেন।

পৃথিবীকে দেখেই মুখ তুললেন। কিন্তু চমকালেন না। মালু বোস কোন ব্যাপারেই চমকান না। সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন, ক্রাইসিস্ যতই সাংঘাতিক হোক না কেন—মালু বোসের কাছে তা নিবেদন করলেই হল। তিনি নির্বিকার মুখে তা শুনবেন এবং একটা সমাধান করবেনই।

পৃথিবী তাই এত রাতেও ছুটে এসেছে তাঁর কাছে। এসেছে ট্যাক্সিতে। নার্সের পোশাক দেখে ড্রাইভার টাঁ-ফুঁ করেনি—ট্রাফিক পুলিশও আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চায়নি।

পৃথিবী মেয়েটি ভারি মিষ্টি। রঙটা ফর্সা নয় ঠিকই—তা হোক। কিন্তু চোখ মুখের ধার আর ঔজ্জ্বল্য যে কোনো পুরুষের বুকের রক্ত ছলকে দিয়ে যায়।

সেই পৃথিবীকেই আলু থালু বেশে ধাঁ করে চেম্বারে ঢুকে পড়তে দেখে মালু বোস চোখ তুললেন এবং যথারীতি নির্বিকার মুখে চেয়ে রইলেন।

ধপ করে চেয়ারে বসল পৃথিবী। চোখ বড় বড় করে বললে—নিমুদা, তোমাকে তো সবাই ক্রাইসিস্ ম্যানেজার বলে ডাকে এখানে—তাই না?

মালু বোসের বাপ-মা'র দেওয়া নাম নিমাই বোস। নিমুদা বলে ডেকেছে পৃথিবী সেই কারণেই।

বোতল প্রায় খালি করে এনেও মালু বোস তখন পুরোপুরি ধাতস্থ রয়েছেন কণ্ঠস্বরও স্খলিত নয় মোটেই। চোখজোড়াও ঢুলু ঢুলু নয়। মালু বোস নাম তাঁর অকারণে হয়নি।

পৃথিবীর মিষ্টি মুখ আর বিস্ফারিত চোখের দিকে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাকিয়ে থেকে ভরাট গম্ভীর গলায় বললেন—কোনো ক্রাইসিসে পড়েছিস মনে হচ্ছে?

রুম নাম্বার এইটের সমাধান করে দিতে পারবে?

রুম নাম্বার এইট! গোয়েন্দা কাহিনী ভক্ত মালু বোস এবার হাতের তুলি নামিয়ে রাখলেন।

থ্রিলিং কেস নিমুদা, ইন্দ্রনাথ রুদ্র ছাড়া এ প্রবলেম কেউ সমাধান করতে পারবে না। উনি তো তোমার বন্ধু?

নড়ে চড়ে বসলেন মালু বোস—কেসটা কি বলতো?

কেসটা, বললে পৃথিবী—মানুষের কঙ্কাল নিয়ে।

কঙ্কাল! মালু বোসের হাতটা অজান্তেই এগিয়ে যায় টোব্যাকো

পাইপের দিকে। তামাক ঠাসাই ছিল। তুলে নিয়ে দাঁতের ফাঁকে রাখতে রাখতে বললেন—কঙ্কাল নিয়ে আবার কেস হয় নাকি? ইন্দ্রনাথ রুদ্রর কারবার তো কঙ্কাল হওয়ার আগে পর্যন্ত। কঙ্কাল একবার হয়ে গেলে তো ল্যাটা চুকেই গেল। ধর আমার বডিখানা যদি এখন কঙ্কাল হয়ে যায়, ইন্দ্রনাথ রুদ্রর বয়ে গেছে আমাকে নিয়ে—মানে, আমার কঙ্কালকে নিয়ে মাথা ঘামাতে। অবশ্য তুই যদি কঙ্কাল হয়ে যাস, তখন অবশ্য কেসটা ইন্টারেস্টিং হয়ে দাঁড়াবে। যা একখানা বিউটি তুই, তোর কঙ্কালখানাও নিশ্চয় বিউটিফুল হবে। তারপর যদি সেই কঙ্কালের নাচ আরম্ভ হয়ে যায়—যে একখানা সীন হবেরে পৃথিবী—গোটা পৃথিবীটাই হুমড়ি খেয়ে পড়বে তোর ওপর। আর যদি—

পাইপখানায় আর আগুন লাগাতেও দিল না পৃথিবী। খপ করে ছিনিয়ে নিল দাঁতের ফাঁক থেকে। বললে দাঁত কিড়মিড় করে—সব বলে দোব বৌদিকে। এত মাল টানলে মাথার ঠিক থাকে কারো?

মাল টেনেছি? আমি? এবার অট্টহাস্য করলেন মালু বোস। গোটা বিখ্যাত প্রকাশনী থর থর করে কেঁপে উঠল সেই অট্টহাসিতে। দারোয়ান পিনাকী থেকে আরম্ভ করে চীফ আর্টিস্ট অরবিন্দ পর্যন্ত দৌড়ে এল দুপ দাপিয়ে। হাতের হুলুনি দেখিয়ে প্রত্যেককেই চেম্বারের এদিকের আর ওদিকের দরজা থেকে খেদিয়ে দিলেন মালু বোস—আরে, মালই আমাকে টানে—আমি মাল টানতে গেছি কখনো?

নিমুদা, কেসটা লোমহর্ষক। আট নম্বর ঘরে গেলেই ভাল ভাল রুগীদের ব্রেনের বারোটা বেজে যায় কেন, এ রহস্যের সমাধান তোমাকে করতেই হবে।

আট নম্বর ঘর! ব্রেনের বারোটা—কি সব আবোল তাবোল বকছিস্ পৃথিবী এত রাতে? নাইট ডিউটির ডাক্তারের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করে এলি নাকি?

নিমুদা—প্লীজ।

তাহলে পাইপটা দে—সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

এই নাও। ইন্দ্রনাথদাকে ফোন করবে এক্ষুনি?

আব্বিব্বাস! দাদা পাতিয়ে ফেললে না দেখেই? তা রাজ-যোটক হবে তোদের—যা ফিগার ইন্দ্রনাথের—প্রিন্স বললেই চলে!

নিমুদা, এবার কিন্তু বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

"বোতল! আঁৎকে ওঠেন মালুবোস—বোতলের দিকে নজর কেন সিস্টার? আমার সেকেণ্ড ওয়াইফকে ছুঁড়ে ফেলে দিবি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—অমন কাজটা করিসনি। আট নম্বর ঘরটা কোথায় আগে বল।"

"হাসপাতালে।"

"মানে তুই যেখানে নেচে নেচে বেড়াস"—

"নার্স ইউনিয়নকে লেলিয়ে দেব তোমার পেছনে।"

"ওরে বাবা। তোর বৌদি মিডওয়াইফও যে মাঝে মাঝে অমন হুমকি ছাড়েরে।"

"বৌদি তো টিচার—মিডওয়াইফ হল কবে?"

'ফুলওয়াইফ হত যদি টিচারি না করত। যাকগে, আট নম্বরে কাদের ব্রেন ফেল করে বলতো?

'ভাল ভাল পেসেন্টদের।

'কি রকম ভাল?'

"ধরো কারো ঠ্যাঙ ভেঙেছে, কারো অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ হয়েছে, কারো—"

"যাকগে, যাকগে সিম্পল কেস নিয়ে ঢুকছে আট নম্বরে—বেরিয়ে যাচ্ছে ব্রেন ফেল করে—এই তো?"

'হ্যাঁ, নিমুদা। গত তিন বছর ধরে চলছে এই কাণ্ড।'

'তিন বছর।'

"তবে আর বলছি কী।"

"এত দিন ধরে ঘুমোচ্ছিল সবাই?"

"এখনও ঘুমোচ্ছে—জেগেছি শুধু আমি।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। যে রকম আলুথালুভাবে এসেছিস কঙ্কালের কবলে পড়েছিলিস মনে হচ্ছে।"

"কঙ্কালের কবলেই বলতে পারো। মর্গে ঢুকে—"

"মর্গে! কঙ্কালদের আড্ডায়।"

"মর্গে মড়া থাকে, নিমুদা—কঙ্কাল নয়।"

"তবে অত কঙ্কাল—কঙ্কাল করে চেঁচাচ্ছিস কেন?"

"চেঁচাচ্ছি কি আর সাধে? কাগজে পড়োনি কঙ্কাল পাচার হচ্ছে বিলেতে আমেরিকায় লাখ লাখ টাকায়। জ্যান্ত মানুষ মেরে, কঙ্কাল বানিয়ে চলোও কারবার চালাচ্ছে কঙ্কাল-কারবারিরা?"

চোখ কুঁচকে তাকালেন মালু বোস। ভদ্রলোককে এমনিতেই দেখতে সিনেমার হিরোর মত—চোখ কুঁচকোলে সুন্দর চোখের বাহার যেন আরও খুলে যায়।

বললেন—"তুই কি তাহলে বলতে চাস, হাসপাতালেই জ্যান্ত মানুষ মেরে কঙ্কাল বার করে পাচার হচ্ছে বাইরে?"

"তাই তো বলতে চাই?"

মর্গ যার চার্জে, তার কবলে। উফ! মাল খেয়ে চুর হয়েছিল নিমুদা, তারপর যখন ঐ কঙ্কালের মত চেহারাখানা নিয়ে তেড়ে এল আমার দিকে—

"কি করলি?"

পালাতে গেলাম। কিন্তু দেখছো কি অবস্থা আমার করেছে।

"বেশি কিছু করেনি তো?" চোখ মিটমিটিয়ে বললেন মালু বোস।

কয়বার তালেই তো ছিল—আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু কাল থেকে আমার চাকরিও বোধহয় নট হয়ে যাবে—নয়তো আমাকেই মড়া বানিয়ে—

কঙ্কাল বানাবে।

নিমুদা!

ওরকমভাবে তাকাসনি, পৃথিবী ভস্ম হয়ে যাবো। চাকরি নষ্ট হয়ে যাবে বলছিস কেন? মর্গে ঢোকা তো নার্সদের পক্ষে অপরাধ নয়।

আমি যে সদ্য মরা লাশটা খুঁজছিলাম।

বটে। বটে। পেয়েছিস?

পেয়েছি—প্যাকিং কেসের মধ্যে।

প্যাকিংকেসের মধ্যে মড়া।

তালাটায় পেরেক ঠোকবার তালে ছিল—আমি গিয়ে দেখে ফেলতেই—

তোর দিকে তেড়ে এল। তা বেশ করেছিল। হাজার হোক পুরুষ মানুষ তো—দোষ তোর—ওরকম উর্বশী ফিগার নিয়ে রাতবিরেতে—

"নিমুদা ফের ?"

প্যাকিংকেসে ভরছিল কেনরে ?

ভ্যানে করে চালান দেবে বলে।

ভ্যানে করে ?

নার্স কোয়ার্টার থেকে বছর খানেক ধরে লক্ষ্য করছি ব্যাপারটা তার আগে অত খেয়াল করিনি। আট নম্বর ঘর থেকে ডেড বডি মর্গে এলেই রাত্রে একটা ভ্যান এসে দাঁড়ায়—একটা প্যাকিংকেস ওঠে ভ্যানের মধ্যে। খটকা লেগেছিল। তাই—

ফুক ফুক করে পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মালু বোস বললেন, এসেছিস ক্রাইসিস্ ম্যানেজারের কাছে। দেখি ইন্দ্রনাথকে ধরা যায় কি না।

বলে, টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন ক্রাইসিস্ ম্যানেজার ওরফে ভাঙাকুলো।

**ইন্দ্রনাথ রুদ্র ওরফে ছিদ্রান্বেষী রুদ্র**

বৎস ইন্দ্রনাথ, 'তারের ওপ্রান্তে রিং থেমে গিয়ে 'হ্যালো' শব্দটা ভেসে আসতেই এ প্রান্তে হুঙ্কার ছাড়লেন বিখ্যাত প্রকাশনীর মালু বোস।

ওপ্রান্তে সুবিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র তার অতীব সুদর্শন বপুখানাকে শয্যায় শায়িত রেখেই রিসিভারখানাকে কানে লাগিয়ে বললে, ছড়িদার মালু বোস ?

ছড়িদার নয়, ছড়াদার। টেক কেয়ার অফ ল্যাংগুয়েজ। নিমাই বোসের এক-একখানা ছড়া এখন এক এক লাখে বিকোয়।

ছড়ায় ছড়ি ঘুরিয়ে আর কতদিন মালের খরচ জুটোবে ব্রাদার ?

আর বোলো না, যেন ককিয়ে ওঠে মালু বোস—শালা গভর্ণমেন্ট দাম বাড়িয়েই চলেছে। এক এক রাতে ষাট-বাষট্টি টাকা স্রেফ জল হয়ে যাচ্ছে।

জল হয়ে গিয়ে পেটে তো যাচ্ছে। তা এই রাতে হাড় জ্বালানোর কোনো দরকার ছিল কী ? মাল খেয়ে নাইট ডিউটি করছ করো—

টেলিফোনের মধ্যে খানিকটা মাল ঢেলে দেবো ফের ফালতু কথা বললে।

ঢালবার দরকার নেই, মালু বোস—গন্ধেই টের পাওয়া যাচ্ছে। ওল্ড মঙ্ক মনে হচ্ছে ?

সেইটাই আমার ব্র্যাণ্ড, 'গদ গদ স্বর মালু বোসের।

ওটা তো পাইরেটদের ব্র্যাণ্ড ছিল এক কালে।

আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাও ইণ্ডিয়ান পাইরেট ছিল এককালে। মাল আমার রক্তে আছে। রক্ত পিওর রাখবার জন্যে—

মাল তুমি খাবেই। তা খাও, ভাল করেই খাও। তা এখন, এই নিশুতি রাতে, আমাকে ঘুম থেকে তুললে কেন ? মাল খাওয়াতে নাকি ?

বেরসিকদের মাল খেতে ডাকবো ? ছোঃ ছোঃ—

পৃথিবী ঝঙ্কার দিল এবার—কি হচ্ছে নিমুদা।

গর্জনের রেশ পৌঁছালো ওপ্রান্তে ইন্দ্রনাথ রুদ্রর কানে। ঝট করে অর্ধেক উঠে বসে বললে—মাইডিয়ার মালু বোস, ও কার কণ্ঠ ?

পৃথিবীর কণ্ঠ।

পৃথিবী ! পৃথিবীও আজকাল নাইট ডিউটি দিচ্ছে তোর সঙ্গে ? ক বোতল হল আজ ?

এ পৃথিবী সে পৃথিবী নয়। সৌর জগতের তৃতীয় গ্রহ নয়। আমার নাইট ডিউটির দুষ্ট গ্রহ—মেজাজটাই নষ্ট করতে এসেছে।

নিমুদা। আবার উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হয় পৃথিবী।

তোর পৃথিবীর গলায় খুব সুর আছে তো, বললে ইন্দ্রনাথ। দেখতে কি রকম ?

খাসা। তোর মত ব্যাচেলরের সঙ্গে মিলবে ভাল।

খপ করে রিসিভারখানা কেড়ে নিল পৃথিবী। বললে মাউথপিসে—ইন্দ্রনাথদা—পরিচয় নেই, তবুও দাদা বলেই ডাকছি, আমার নাম পৃথিবী পাল—পেশায় নার্স।

হাসপাতালে, না, নার্সিং হোমে ? ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

মোহন সিং হাসপাতালের।

সে তো ক্লাসওয়ান হাসপাতাল। কয়েক বছরের মধ্যেই নাকি আমেরিকান কায়দায় সাজিয়ে ফেলেছে চারতলা পর্যন্ত ?

ঠিকই শুনেছেন, ইন্দ্রনাথদা। ঘরগুলো দেখবার মত। কায়দাকানুন চোখ ছানাবড়া করে দেওয়ার মত। ব্যবস্থাপনা আক্কেল গুড়ুম করে দেওয়ার মত।

"ফাইন, ফাইন। তা সিস্টার, এত রাতে এই অধীনকে মনে পড়ল কেন ?"

আট নম্বর ঘরের রহস্য আপনাকে ভেদ করতে হবে।

রিসিভারখানা আবার ছিনতাই হয়ে গেল পৃথিবীর হাত থেকে। বজ্র কণ্ঠে মালু বোস বললেন—'ছিদ্রান্বেষী রুদ্রকে আর একটা চান্স দেওয়া হচ্ছে, আট নম্বর ঘরে কোথাও একটা ছিদ্র, আই মীন, গোলমাল আছে, সেটাকে অন্বেষণ করতে হবে।

ছিদ্রান্বেষী নয়—সত্যান্বেষী, চিৎকার করে বললে পৃথিবী এবং রিসিভারখানা ফের করতলগত করে বললে ইন্দ্রনাথকে—

যা বললে, তা আগেই বলা হয়েছে।

শুনে টুনে খাট থেকে নামতে নামতে বললে ইন্দ্রনাথ—মোহন সিং হাসপাতাল—কঙ্কালের চোরাচালান—নার্স পৃথিবী পাল—আট নম্বর ঘর। হাইলি ইন্টারেষ্টিং কেস। আমি যাচ্ছি, ঠিক আধ ঘন্টার মধ্যে।

নিজের পাইপখানা পকেট থেকে বার করে ইন্দ্রনাথ বললে, মাইডিয়ার মালু বোস, একটু ফরেন টোব্যাকো হবে?

পাইপের খোল তো নয়, জাহাজের চিমনী। বেশি নিওনা—বিয়াল্লিশ টাকা এক কৌটোর দাম—খেয়াল রেখো।

'রাখবো, বলে এক খামচা তুলে নিয়ে বিশাল পাইপটায় ঠাসতে ঠাসতে বললে ইন্দ্রনাথ—পৃথিবী, তোমার মত ডেয়ারিং মেয়েকেই কাজে লাগাতে চাই।

বলুন কি করতে হবে, ইন্দ্রনাথের ইন্দ্রকান্তির পানে নির্নিমেষে চেয়ে বললে পৃথিবী।

আমার সাগরেদি করতে হবে—শুধু এই কেসে।

কিভাবে?

মোহন সিং হাসপাতালের সিকিউরিটি বড় কড়া। ভিজিটর-দের মাথা পিছু দুখানার বেশি পাশ দেয় না—তাও বিকেলের দিকে। বিশেষ রুম আর বেড ছাড়া অন্যত্র ঘুরঘুর করতে দেওয়া হয় না। কারেক্ট?

বিলকুল।

তাহলে আমার পক্ষে সেখানে ঘোরাফেরা করা মুশকিল। তোমার পক্ষে সহজ। ক্লিয়ার?

একেবারে।

কিভাবে কি করতে হবে, কি কি খবর আনতে হবে, তা বলবার আগে তোমার মুখেই শুনতে চাই কয়েকটা কথা।

বলুন কি বলতে হবে?

আট নম্বর ঘর নিয়ে সন্দেহটা তোমার মাথায় এলো কখন থেকে? কি দেখে?

দুচোখ জ্বল জ্বল করে উঠল পৃথিবীর। ছবির মত বলে গেল পর পর কয়েকটা ঘটনা।

মালবিকা দত্ত চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আট নম্বর ঘরের অপারেটিং টেবিলে। বড় বড় চোখে চেয়ে আছে মাথার ওপরে ঝোলানো বিশালকায় কেটলড্রাম আকারের আলোর দিকে। মনকে শক্ত করছে মালবিকা। চেষ্টা করছে শান্ত থাকার। অপারেশন শুরু করার আগে যে সব ইঞ্জেকশন নিতে হয়—সবই দেওয়া হয়েছে তাকে। তখনই তাকে বলে দেওয়া হয়েছে ঘুমপাড়ানোর জন্যেই দেওয়া হচ্ছে ইঞ্জেকশন। সেই সঙ্গে মনটা ভরে উঠবে অনাবিল সুখে। কিন্তু মালবিকার চোখে ঘুম নেই, মনে সুখ নেই।

ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর থেকেই বেশি নার্ভাস আর শঙ্কিত হয়ে পড়েছে মালবিকা। নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছে। বাইশ বছরের জীবনে এরকম পরিস্থিতিতে কখনও তাকে পড়তে হয়নি। বুদ্ধি-শুদ্ধি যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা রয়েছে তার গলা থেকে পা পর্যন্ত। এত নামী হাসপাতাল, অথচ চাদরটার কিনারা থেকে সুতো বেরিয়ে পড়েছে। এক কোণে একটা ছেঁড়াও রয়েছে। মনটা খুঁতখুঁত করছে সেই কারণেই। অথচ সামান্য এই ব্যাপারে কেন যে বিচলিত হচ্ছে, তা ভেবে পাচ্ছে না। চাদরের তলায় তার পরণে রয়েছে হাসপাতালের গাউন। ঘাড়ের পেছনে বাঁধা রয়েছে ওপরের অংশ। নিচের অংশ নেমে রয়েছে উরুর মাঝখান পর্যন্ত। পিঠের দিকে কিছু নেই - খোলা। এছাড়া রয়েছে স্যানিটারি ন্যাপকিন। ভিজে গেছে নিজেরই রক্তে—বেশ টের পাচ্ছে মালবিকা। মনে মনে মুণ্ডপাত করছে মোহন সিং হাসপাতালের। ইচ্ছে হচ্ছে গলার শির তুলে চেঁচিয়ে ওঠে। ছিটকে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় নিচে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। হাসপাতালের নির্দয় পরিবেশ আর এই রক্তক্ষরণ তার মনে একটা চিন্তাই অঙ্কুরিত করে চলেছে। মৃত্যু চিন্তা। আয়ু বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে মালবিকার।

কলকাতার আকাশ তখন নীল। বাতাসে ঈষৎ উষ্ণতা। গোটা শহর গম গম করছে সকালের যানবাহন ও পথচারীর ভিড়ে।

কিন্তু এহেন ব্যস্ততার চিহ্নমাত্র নেই মোহন সিং হাসপাতালের মধ্যে। অপারেশন রুম যে অঞ্চলে, সেদিককার প্রতি বর্গ ইঞ্চি ঝকঝক করছে উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট বিদ্যুৎ বাতির আলোয়। ব্যস্ততা রয়েছে অন্য ব্যাপারে। কাঁটায় কাঁটায় আটটায় শুরু করতে হবে অপারেশন। ছোট ছোট হুকুমের মধ্যে দিয়ে চলছে তার প্রস্তুতি। ঠিক আটটায় স্ক্যালপেল চামড়া কেটে বসে যাবে—এক সেকেণ্ডও এদিক ওদিক হলে চলবে না। পেসেন্টকে বেড থেকে এনে, অপারেশনের জন্যে তৈরি করে, অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া পর্যন্ত শেষ করতে হবে তার আগে।

কাজেই শশব্যস্ত এখন সকলেই। রুম নম্বর এইটে তো বটেই। এমন কিছু বিশেষত্ব নেই এই ঘরের। অপারেটিং রুম যে রকম হয়, ঠিক সেই রকম। নিউট্রাল রঙের টালি বসানো দেওয়াল। ফুটকি ফুটকি দাগের ভিনাইল বসানো মেঝে। ঠিক আটটার সময়ে রুটিনমাফিক হবে কিউরেটাজ—জরায়ু চেঁচে সাফ করে দেওয়া—অবাঞ্ছিত টিশু পরিষ্কার করে দেওয়া। এ ধরনের কাজ হামেশাই হচ্ছে এখানে—অভিনব কিছু নয়।

নার্স পৃথিবী পাল হাতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে অসীম মমতা নিয়ে চেয়ে আছে মালবিকার পানে।

গত এগারো দিন ধরে ব্লিডিং হয়ে চলেছে মালবিকার। প্রথমে ভেবেছিল মামুলি রজঃ। মাসিক ঋতু। যদিও আরম্ভ হয়েছে বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই। ঋতু শুরু হওয়ার আগে যে অস্বস্তি হয়, সে রকম কিছুও হয়নি। প্রথম যেদিন রক্তের ছিটে দেখেছিল, সেদিনই ভোরের দিকে পেশীতে একটু টান টান ব্যাথা অনুভব করেছিল। তারপর থেকেই কিন্তু ব্যাথাহীন রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে কখনো কম—কখনো বেশি। প্রতি রাতেই ভেবেছে, এবার বুঝি শেষ হয়। কিন্তু পরের দিন ভোরে দেখেছে রক্তে-ভেজা স্যানিটারী ন্যাপকিন। মালবিকার সঙ্গে আলাপ ছিল পৃথিবীর। টেলিফোনে ব্যাপারটা নিয়ে প্রথমে কথাবার্তা হয় তার সঙ্গেই। তারপর সান্ত্বনা দিয়েছিলেন গাইনিকোলজিস্ট ডক্টর বিপুল ব্যানার্জি নিজেই। কমে যাবে একটু একটু করে। এত ভাবনার কি আছে?

কিন্তু না ভেবেও পারেনি মালবিকা। অত্যন্ত অসময়ে যেখানে সেখানে ন্যাপকিন ভিজে গেলে অস্বস্তি তো হবেই। এমনিতেই সে খুঁতখুঁতে নিজের শরীর নিয়ে। চেহারার বনেদী ছাপ তো আছেই—মনটাও চায় সদা পরিচ্ছন্নতা। কোথাও একটু নোংরা লাগলে মেজাজ যায় বিগড়ে। একনাগাড়ে ব্লিডিং হওয়ায় তাই তার মেজাজ খিঁচড়ে গেছিল একেবারে। শেষকালে বেশ ভয়ও পেয়েছিল। বন্ধ হচ্ছে না কেন ব্লিডিং?

বাড়াবাড়ি হল গতকাল। সোফায় শুয়ে দু'পা মুড়ে বাহু বন্ধনে রেখে ম্যাগাজিন পড়ে যাচ্ছিল মালবিকা। হঠাৎ মন সরে গেল পত্রিকার পাতা থেকে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে যোনি প্রদেশে। এরকম অনুভূতি এর আগে কখনও হয়নি। যেন একটা কবোষ্ণ নরম বস্তু ভেতর থেকে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে চাইছে। প্রথমে বুঝতে পারেনি অনুভূতিটা আসছে কোত্থেকে। তারপরেই টের পেল সুড়সুড় করছে উরুযুগলের ভেতর দিক। তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ছে পাছার খাঁজ বেয়ে।

অযথা উদ্বিগ্ন হয়নি মালবিকা। রুমমেট গীতালিকে ডাক দিয়েছিল ধাড়ফিড়িয়ে—একটা ট্যাক্সি ডেকে দিবি?

কেন রে? বলেছিল গীতালি।

খুব বেশি ব্লিডিং হচ্ছে, শান্ত স্বরে বলেছিল মালবিকা। ঘাবড়াসনি। পিরিয়ড বেড়ে গেছে। হাসপাতালে কথা বলাই আছে। এক্ষুনি যাব।

ট্যাক্সি থেকে নেমে এমার্জেন্সি রুমে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হয়নি মালবিকাকে। ডক্টর বিপুল ব্যানার্জী আসতেই খুশিতে ভরে উঠেছিল মনটা। অথচ পুরুষ ডাক্তারকে দিয়ে স্ত্রীঅঙ্গ পরীক্ষার বিষম বিরোধী সে। কিন্তু উপায়ও তো নেই। রোগ যখন ঝাঁকিয়ে আসে, তখন ডাক্তারের বাছ বিচার করলে চলে না।

এমার্জেন্সি রুমে ডক্টর ব্যানার্জী যেভাবে তাকে এগজামিন করেছে, তা মোটেই ভাল লাগেনি মালবিকার। ভাল যে লাগবে না, তা নিজেও জানত। একটি মাত্র পর্দা ঝুলছে দরজায়। হাওয়ায় উড়ছে। ফাঁক দিয়ে ও ঘরের সবাই যেন তার দিকেই চেয়ে আছে বলে মনে হয়েছে মালবিকার। আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে তার খুবই। কিন্তু নির্বিকার থাকা ছাড়া উপায় নেই। কয়েক মিনিট অন্তর ব্লাড প্রেসার দেখা হয়েছে। রক্তও নেওয়া হয়েছে সিরিঞ্জে। তারপর নিজের পরিধেয় ছেড়ে পরতে হয়েছে হাসপাতালের গাউন। প্রতিবারেই পর্দা সরে গেছে। ও ঘরের একগাদা মুখ ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থেকেছে তার দিকে। পাশের বেডপ্যানের দিকেও চেয়ে থেকেছে চোখগুলো।

বেডপ্যান ভর্তি কালচে লাল রক্তের ডেলা। ডক্টর ব্যানার্জী এর মধ্যেই তার দুই উরুর ফাঁকে হাত গলিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। নার্সকে ডেকে হুকুম দিয়েছেন। সজোরে চোখ বন্ধ করে মনে মনে কেঁদে গেছে মালবিকা।

অভয় বাণী শুনিয়ে গেছেন ডক্টর ব্যানার্জী। বেশি সময় না—ভয় কী? জ্ঞান দিয়েছেন জরায়ুর লাইনিং সম্পর্কে। স্বাভাবিক ঋতুচক্রে কিভাবে পালটায় এই লাইনিং এবং না পাল্টালে কি হয়, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন সুন্দরভাবে। রক্তনালিকা সম্পর্কে কি যেন সব বলে গেছেন। জরায়ু থেকে ডিম্বকোষের বেরিয়ে যাওয়াটা যে একান্তই দরকার, তা বলেছেন ডায়ালেশন আর কিউরেটাজ করলেই সেরে ওঠা যাবে একেবারে। রাজি হয়েছে মালবিকা। তবে বাবা মা যেন জানতে না পারে। ওয়ার্কিং গার্ল তো—কলকাতায় থাকে হোস্টেলে। এ সব অপারেশনের নাম শুনলেই ভাববে—এই রে! মেয়ে বোধহয় প্রেগন্যান্ট হয়েছিল এ্যাবরসন্ করিয়ে এল।

মাথার ওপরকার বিরাট অপারেটিং লাইটটার দিকে তাকিয়ে ভাবল মালবিকা, আর তো কিছুক্ষণ বড় জোর আধঘণ্টা—আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে জীবন। আলোর দিকে ছাড়া অন্য কোনো দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। অপারেটিং রুমের কাণ্ড-কারখানা তার মোটেই ভাল লাগছে না।

ভাল লাগছে?

ডান দিকে তাকায় মালবিকা। সার্জিক্যাল হুডের সিনথেথিক ফাইবারের ফাঁক দিয়ে একজোড়া চোখ চেয়ে আছে তার পানে। পৃথিবী পাল। ডান বাহুর ওপরকার চাদর টান টান করে গুঁজে দিচ্ছে খাটের পাশে—আরও অনড় হয়ে যাচ্ছে মালবিকা।

হ্যাঁ, নির্লিপ্ত গলায় বলে মালবিকা। আরাম না ঘেঁচু! এর চাইতে নরকবাসও বুঝি ভাল। খাবার ঘরের ফরমাইকা টেবি-লের চাইতেও শক্ত এই অপারেটিং টেবিল। কিন্তু দু-দুটো ঘুমের ওষুধ এর মধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে মেরিব্রাম-এর গভীরতায়। জ্ঞান টনটনে রয়েছে বটে মালবিকার, কিন্তু চার পাশের পরিবেশ থেকে যেন নিজেকে অনেকটা সরিয়ে আনতে পেরেছে মালবিকা। অ্যাট্রাপিন দেওয়ার ফলেও কাজ শুরু হয়ে গেছে। শুকনো হয়ে আসছে গলা আর মুখের ভেতরটা—আঠা আঠা হয়ে গেছে জিভ।

অ্যানেস্থেসিয়ার ডাক্তার ব্যস্ত তাঁর মেশিন নিয়ে। স্টেনলেস্ স্টীলের মেশিন! ওপর দিকে রয়েছে ম্যানোমিটার আর কম-প্রেসড গ্যাসের রঙচঙে কয়েকটা সিলিণ্ডার। হ্যালোথেনের একটা ব্রাউন বোতল বসানো মেশিনের ওপর। কি যেন লেখা রয়েছে লেবেলে। অ্যানাস্থেটিক এজেন্ট। রুগীর লিভারের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে এই বিশেষ এজেন্টটি। তবে তা কদাচিৎ ঘটে। লিভার ড্যামেজের সম্ভাবনা থাকলেও হ্যালো-থেনের অন্যান্য গুণাবলী কিন্তু অনেক। মালবিকা জানে না, অ্যানেস্থেসিয়ার এই ডাক্তারটি—ডক্টর শম্ভু সান্যাল—হ্যালোথেন নিয়ে গবেষণা করছেন এবং মনে মনে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার স্বপ্নও দেখছেন।

ধাপে ধাপে চেকলিস্ট দেখে কাজ অনেকটা এগিয়ে এনেছেন ডক্টর শম্ভু সান্যাল। পৃথিবীর দিকে চাইতেই সে মালবিকার বুকের ওপর থেকে চাদর টেনে একটু নামিয়ে দিলে—জেগে রইল কেবল স্তনবৃন্ত যুগল। বিচ্ছিরি লাগছে মালবিকার এভাবে বুক খোলা অবস্থায় শুয়ে থাকতে। বুকের ওপর কয়েকটা ইলেকট্রোড বসিয়ে দিল পৃথিবী। বললে ফিসফিস করে—হার্টের অবস্থা মনিটর করা হবে—ঘাবড়ে যেও না যেন। তিন জায়গায় রঙবিহীন জেলী লাগিয়ে দিল কথা বলতে বলতে। আরও খারাপ লাগছে মালবিকার। মুখে কিছু বলছে না।

শম্ভু সান্যাল মালবিকার বাম বাহুর ওপর মৃদু থাপ্পর মেরে শিরা বার করে এনেছেন। কব্জিতে রবারের টিউব জড়িয়ে দিচ্ছেন। মালবিকার মনে হল যেন আঙুলের ডগায় পৌঁছে গিয়ে ধুকপুক করে চলেছে হৃৎপিণ্ডটা।

ডক্টর ব্যানার্জী এলেন ঘরে। মালবিকার পাশে গিয়ে বললেন—এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে—ঘুম হবে ফাইন। বাম বাহুতে ছুঁচ বিঁধে গেল কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে। কব্জির রবারের বন্ধনও খুলে গেল। তোড়ে রক্ত ধেয়ে গেল হাতের মধ্যে দিয়ে। মাথার মধ্যে যেন অশ্রুর প্লাবন অনুভব করে মালবিকা।

এইভাবেই চলল একটার পর একটা। দুই ডাক্তারে কথা কথা বলছেন আর হাত চালিয়ে যাচ্ছেন। ডক্টর সান্যাল অ্যানে-স্থেসিয়া মেশিন এনে মালবিকার মাথার কাছে রেখেছেন। এক ডোজ পেনটোথাল একটু আগেই দিয়েছেন সিরিঞ্জে করে ইনট্রা-ভেনাস লাইনের মধ্যে।

বলছেন—এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত গুণে যান।

পনেরোর বেশি গুণতে পারবে না মালবিকা, ডক্টর সান্যাল তা ভাল করেই জানেন। যে কোনো রুগীর মগজকে হুকুমের দাস বানিয়ে রাখবার এই ক্ষমতা তাঁর হাতের মুঠোয়। আত্ম-প্রসাদও অনুভব করেন প্রতিবার রুগীর ব্রেনকে ঘুম পাড়ানোর সময়ে। মালবিকা অবশ্য কড়া ধাতের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। ওয়ার্কিং গার্ল তো। তেজিয়ান। তাই গণনা শুরু হতেই আর এক ডোজ পেনটোথাল ফুঁড়ে দিলেন ডক্টর সান্যাল। মালবিকা সাতাশ পর্যন্ত গুণেই ঘুমিয়ে পড়ল। শেষ ঘুম।

চেক লিস্ট দেখে নিলেন ডক্টর সান্যাল। ঠিকমত হয়েছে সব কিছুই, নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে মগজ। মুখোসের মধ্যে দিয়ে হ্যালোথেন, নাইট্রাস অক্সাইড আর অক্সিজেনের মিক্সচার মালবিকার ফুসফুসে পাঠিয়ে দিয়েছেন যথা সময়ে, এবার ফুঁড়ে দিলেন সাকসি-নাইলকোলিন ক্লোরাইড সলিউশন—করোটির মাসলে প্যারা-লিসিস আনার জন্যে।

শেষ ওষুধটার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে সামান্য কেঁপে উঠল মুখ আর তলপেটের পেশী। তারপরেই রক্তের সঙ্গে ওষুধ গিয়ে পৌঁছোলো সারা দেহে। পুরোপুরি প্যারালিসিস দেখা গেল করোটির পেশীতে। সচল রইল হার্ট। মনিটর বীপ বীপ করে চলেছে নির্ভুল ছন্দে।

মালবিকার জিভও প্যারালাইজড হয়ে গেছে। ভেতর দিকে গড়িয়ে গেছে। বাতাস যাতায়াতের পথ বন্ধ। তাতে কিছু এসে যায় না। থোরাক্স আর অ্যাবডোমেনের পেশীও তো প্যারা-লাইজড হয়ে রয়েছে। নিঃশ্বাস নেওয়ার প্রচেষ্টাও তিরোহিত হয়েছে। আমাজন বর্বররা কুরারি বিষ তীরের ডগায় মাখিয়ে রাখত। এ ওষুধ সেই কুরারির মতই বলা যায়—শুধু যা রসায়নগত তফাৎ আছে। কাজ কিন্তু একই। মালবিকার মৃত্যু হতে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই। কিন্তু এই মুহূর্তে ভয়ের কোনো কারণ নেই। রুগীর মুখের ওপর ব্রিদিং মাস্ক লাগিয়ে দিলেন ডকটর সান্যাল। জিভটা টেনে বার করে আনলেন। ভোক্যাস

কর্ড'স দেখা যাচ্ছে, কিন্তু প্যারালাইজড হয়ে রয়েছে করোটির পেশীর মতই।

কাজ চালিয়ে গেলেন চেকলিস্ট অনুযায়ী। একটার পর একটা। আরও কিছু ইনজেকশন। আরও অনেক বন্দোবস্ত। বুকে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে হার্টবেট দেখে বেশ খুশিই হলেন। পৃথিবী পালকে চোখের ইঙ্গিত করতেই চাদর টেনে সরিয়ে দিল পুরোপুরি। হার্টবেট আবার দেখলেন ডকটর সান্যাল। অ্যানেস্থেসিয়ার আগে হৃৎপিণ্ড ছিল উদ্বিগ্ন—এখন স্বাভাবিক। সাকশিনাইল কোলিনের এফেক্ট আট থেকে দশ মিনিটের মধ্যে চলে যাবে, পেসেন্ট নিজেই নিঃশ্বেস নিতে পারবে।

এবার একই সাথে কাজ চলল দুই ডাক্তারের। একজন ঘুমের দিকে, হার্ট রেটের দিকে, ব্লাডপ্রেসারের দিকে নজর রাখছেন। আর একজন দেখছেন মালবিকার জরায়ুর অবস্থা। সাকশন মেশিন দিয়ে টেনে বার করছেন রক্তের ডেলা। চেঁছে দিচ্ছেন ভেতরটা। একবার করলেন। তারপর আর একবার। বড় কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা এই জরায়ু নিয়ে।

ঠিক এই সময়ে ছন্দ কেটে গেল হৃৎপিণ্ড মনিটরের। স্ক্রীনে ইলেকট্রনিক বীপ বীপ রেখা চলছে এলোমেলো ভাবে। নাড়ির গতিও কমে এসে দাঁড়িয়েছে ষাটে।

সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলেন বটে ডকটর সান্যাল, মনটা কিন্তু খচ খচ করতে লাগল। এরকম হওয়ার তো কথা নয়। ব্লাডপ্রেসার উঠেই আবার নেমে যাচ্ছে কেন? নাড়িও ষাটে এসে দাঁড়াচ্ছে কেন বার বার?

অদ্ভুত ব্যাপার তো। ডকটর ব্যানার্জীকে উদ্বেগের কারণ খুলে বললেন ডক্টর সান্যাল।

চিন্তিত হলেন ডকটর ব্যানার্জী– কিন্তু রক্তের রঙ দেখেছেন? ফ্যানটাসটিক! টকটকে লাল।

অর্থাৎ রক্তে অক্সিজেন যাচ্ছে ঠিকই। সবই ঠিকঠাক আছে। অথচ....মালবিকার ব্রিদিং ব্যাগ নেতিয়ে পড়েছে। নিঃশ্বাস আর নিচ্ছে না। সাকসিনাইলকোলিনের এফেক্ট তো এতক্ষণে চলে যাওয়ার কথা। গেছেও নিশ্চয় তবে কেন মালবিকার শ্বাসযন্ত্র আর কাজ করছে না?

আর পাঁচ মিনিট, দ্রুত হাত চালাতে চালাতে বললেন ডকটর ব্যানার্জী। শুনে আশ্বস্ত হলেন ডকটর সান্যাল। কমিয়ে দিলেন নাইট্রাস অক্সাইড আর হ্যালোথেনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন অক্সিজেন।

ব্লাডপ্রেসার আর একটু উঠেছে। লক্ষণ ভালই। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল এয়ারকণ্ডিশনড ঘরেই, হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছে নিলেন ডকটর সান্যাল, তারপর হাত নামিয়ে টেনে তুললেন মালবিকার চোখের পাতা, বাধা পেলেন না। দেখলেন, বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে চোখের তারা।

বিষম আতঙ্কে চেয়ে রইলেন ডকটর সান্যাল। ভুল হয়েছে.... কোথাও না কোথাও মারাত্মক একটা গণ্ডগোল ঘটেছে।

তাহলে কি বেঁচে আছে মালবিকা?

না, নেই। ডাক্তারদের মতে তার ব্রেনের মৃত্যু ঘটেছে। মালবিকা এখন একটা জ্যান্ত মড়া ছাড়া কিছুই নয়। দু'বার ই-ই-জি করা হয়েছে ব্রেনের। ফ্ল্যাট ফিগার দেখেছে। ব্রেন মরে গেছে। সেরিব্রাল হাইপোক্সিয়া জাতীয় কিছু একটা নাকি হয়েছে। ব্রেনসেল যে কারণেই হোক না কেন উপযুক্ত পরিমানে অক্সিজেন নিতে পারে নি। তাই একে একে মারা গেছে কোষগুলো। ডাক্তারী ভাষায় যার নাম কোমাটোজ।

কিন্তু হার্ট চালু রয়েছে কি ভাবে?

ডাক্তার বলেছেন, হার্ট তো ব্রেনের ওপর নির্ভর করে না। তাই হার্টকে চালু রাখা সম্ভব হয়েছে।

হয়েছে ঠিকই। কিন্তু মালবিকার চোখের পাতা তুলে দেখা যাচ্ছে, তারা নিশ্চল। হাত বরফের মতো ঠাণ্ডা আর ভারি। মালবিকা এখন একটা মড়া ছাড়া কিছুই নয়—সচল হৃৎপিণ্ড নিয়েও মড়া!

অ্যাকসিডেন্ট—বলেছিল ডাক্তার। লাখে এরকম কেস ঘটে। বেঁচে থেকেও মরে থাকে পেসেন্ট। তখন পেসেন্টের সুস্থ দেহযন্ত্র নিয়ে দেওয়া হয় আর এমন একজনকে—যার দরকার বিশেষ সেই দেহযন্ত্রটি।

যেমন, কিডনি!

শিউরে উঠেছিল পৃথিবী।
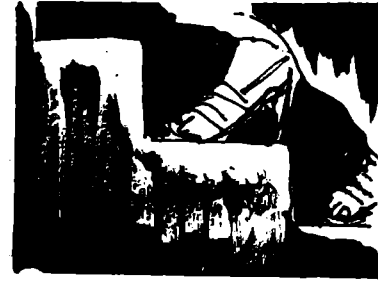
পৃথিবীর দ্বিতীয় গোয়েন্দাগিরি।

ঘরে ঢুকেই অবাক হয়েছিল পৃথিবী।

ভেবেছিল বুড়ো-হাবড়া পেসেন্ট দেখবে। কিন্তু এ যে বয়েসে বেশ যুবক, তিরিশের ওদিকে নয়। সুন্দর স্বাস্থ্য। ঘন কালো চুল। টেনে আঁচড়ানো পেছন দিকে। মুখটা তাই সরু দেখাচ্ছে। ইনটেলিজেন্ট মুখশ্রী। একটু রোদে পোড়া। যদিও বেশ ফর্সা। ধারালো নাকের স্ফীত নাসারন্ধ্র। দেখলে মনে হয় জোরে জোরে অষ্টপ্রহর নিঃশ্বেস নেওয়ার ফলেই বুঝি নাকের পাটা ফুলে রয়েছে। খেলোয়াড়ি চেহারা। মজবুত গড়ন। পেশীময় বাহু। ঘাড়ের পেশীও দেখবার মত। হাতদুটো কিন্তু চঞ্চল। যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছে। মনের উদ্বেগ ঢাকবার চেষ্টা করছে।

পৃথিবীকে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখেই হাসিমুখে বললে যুবক—আরে হাঁ করে দেখছেন কী? বাঘ না সিংহ? আমার নাম চঞ্চল মজুমদার।

জানি, সংক্ষেপে বললে পৃথিবী।

তা তো জানবেনই; না জেনে কি আর এসেছেন? আপনার নামটা জানতে পারি?

বেশ স্মার্ট তো। পুলকিত হয় পৃথিবী। ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও ভেসে আসে। বলে- পৃথিবী পাল।

বাঃ দারুণ নাম তো! এই প্রথম শুনলাম।

ট্রে-টা নামিয়ে রাখল পৃথিবী খাটের মাথার কাছে। ইনট্রা-ভেনাস সলিউশন দেওয়ার কাজটা আগে সেরে নেওয়া যাক। বাচাল রুগীদের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বললে মাথায় উঠে যাবে।

বাঁ হাতের কব্জিতে রবারের টিউব বাঁধল কষে। শিরা ফুলে উঠল দড়ির মত। ইঞ্জেকশনের ছুঁচ ফুটিয়ে দিল শিরার মধ্যে। একটু টানাতেই বেরিয়ে এল রক্ত। আই ভি টিউবের সঙ্গে সিরিঞ্জ লাগিয়ে দিল পৃথিবী।

ডাক্তারী পড়লেই পারতেন, মুচকি হেসে বললে চঞ্চল মজুমদার।

কেন বলুন তো? জিনিসপত্র গুছোতে গুছোতে বললে পৃথিবী।

ডাক্তারের মতই হাত চালাচ্ছেন তো—মিস করলেন না একবারও। মিস করলেই বিপদ—এই দেখুন না আমার পায়ের অবস্থা। ডান পা'টা দেখায় চঞ্চল।

কি হয়েছে পায়ে?

ভেতরে নাকি কার্টিলেজ ছিঁড়েছে টুকরো টাকরা পড়েও থাকতে পারে।

ছিঁড়ল কি করে?

বল খেলতে গিয়ে। গোল মিস করলাম—নিজেও গোলপোষ্টে আছড়ে পড়লাম—হাঁটুটা গেল জখম হয়ে।

আপনি কি খেলোয়াড়?

আগে খেলতাম। এখন ব্যবসা করি। মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং তৈরি করি। পেশায় বলতে পারেন আর্কিটেক্ট। নেশাটা এই বলখেলা। গেল তো পা'টা জখম হয়ে।

ও কিছু নয়। মিনিসকিউল-একটোমি জাতীয় কিছু একটা হবে।

ডাক্তারী টার্মগুলোও রপ্ত করেছেন দেখছি।

শুনে শিখেছি।

তার মানে আপনার শেখবার ইচ্ছে আছে, জানবার কৌতূহল আছে—সবার তা থাকে না, মিস পাল। আপনার চেহারার মধ্যেও একটা ব্যক্তিত্ব আছে যা অনেক মেয়েরই নেই। প্রসাধন করলে কি ব্যক্তিত্ব বেরোয়? অন্তরের তেজকেই বলে পার্সোনালিটি।

রতন মুখোপাধ্যায়

উক্তবাদিনীর মধ্যেও পাওয়া যায়, বললে পৃথিবী।

কি রকম?

আমার বাবা ছিল কড়া ব্যক্তিত্বের মানুষ—মা নরম ব্যক্তিত্বের। বাবা কিন্তু কোনোদিন আমার কোনো ইচ্ছাতে বাধা দেননি—মা দিয়েছেন, পারেনওনি।

ফলে মা হেরেছেন—মায়ের ব্যক্তিত্ব আমার ভাল লাগেনি। চেষ্টা করেছি বাবার মত হতে। যা দেখছেন, তা বাবার কাছ থেকেই পাওয়া।

ব্যাপারটা নিয়ে খুব ভেবেছেন মনে হচ্ছে?

খুবই। কেন আমি অন্য পাঁচটা মেয়ের মত ন্যাড়াজোবরা হলাম না, কেন রুখে দাঁড়াতে ভয় পাই না? তার কারণটা অনেক ভেবেচিন্তে দেখেছি আমার বাবা খুব কায়দা করে গুণগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছেন আমার মধ্যে। নিজে হেরেও হারেননি—জিতে গেছেন ঠিক নিজের মত করে আমাকে গড়ে তুলে।

পৃথিবী পাল, আপনি একটা ওয়াণ্ডার। আশাকরি, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যোগাযোগ থাকবে।

কেন বলুন তো! ভুরু বাঁকিয়ে প্রশ্ন করেছিল পৃথিবী।

অমায়িক হেসে বলেছিল চঞ্চল—ধানি লঙ্কাদের আমি ভালবাসি বলে।

পরের দিন আট নম্বর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল চঞ্চল মজুমদারকে। এবারেও পৃথিবীর ডিউটি পড়ল আট নম্বরে। অ্যানাস্থেসিয়ার পর এক টুকরো ছেঁড়া কার্টিলেজ হাঁটু সন্ধি থেকে বার করলেন ডাক্তার ব্যানার্জী।

বললেন—এত ভুগছিল এইজন্যেই। ডক্টর সান্যাল হল কি আপনার?

উন্মাদের মত পেসেন্টের ব্লাডপ্রেসার, হার্টবেট চেক করে যাচ্ছেন ডক্টর সান্যাল। কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তাড়াতাড়ি নাইট্রাস অক্সাইড আর হ্যালোথেন কাট অফ করে দিয়ে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন।

তারপর চঞ্চলের চোখের পাতা টেনে ধরলেন। নার্কোটিকস্ দিলে সাধারণতঃ চোখের তারা খুবই ছোট হয়ে যায়। কিন্তু বিশাল কালো তারা যেন পুরো কর্নিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা কাঁপছে না নিথর।

ব্রেন ডেথ! আবার? আট দিনের মধ্যে দু-দুবার? রহস্যময় কারণে?

নির্নিমেষে চেয়েছিল পৃথিবী। সে জানে, দুবার নয়। এ বছরে হাজার পঁচিশেক অপারেশন হয়েছে এই হাসপাতালে—বারোটি কেসে মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘটেছে ঠিক এইভাবে—যে রহস্যের কিনারা হয়নি এখনো!

**ইন্দ্রনাথের ভূমিকা:**

ক্রাইসিস্ ম্যানেজার মালু বোস আরও আধ গেলাস লাল জল গলায় ঢেলে বললেন দারুণ মুডের মাথায়—পৃথিবী, এই চঞ্চল ছোঁড়াকে তুই ভালবাসিস?

একটু একটু।

একটু একটু মানে? সিংহগর্জন ছাড়লেন মালু বোস।

একটু একটু মানে ভদ্রলোককে পছন্দ হয়েছিল খুবই—আজ রাত্রে যখন শুনলাম কোমাটোজে তিনিও ইহলোক আর পরলোকের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছেন—তখন আর সামলাতে পারলাম না। আটদিন আগে একই হাল হয়েছে আমার বান্ধবী মালবিকার। সবই ঐ আট নম্বর ঘরে।

আট নম্বর ঘরেই শুধু হচ্ছে? ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

হ্যাঁ। নইলে আপনাকে এত রাতে বিরক্ত করব কেন। আরও অপারেটিং রুম তো রয়েছে—কোনো ও-টিতে এরকম ঘটছে না।

অভিশপ্ত ঘর। গত এক বছরে মোট বারোটা কেসের কোমাটোজ কি একই ঘরে হয়েছে?

হ্যাঁ, ইন্দ্রনাথদা।

তারা এখন কোথায়?

কঙ্কালের গাদায়, বললেন মালু বোস।

না, বলে চেয়ে রইল পৃথিবী।

না, মানে? সূচ্যগ্র হল ইন্দ্রনাথের চাহনি।

এদের প্রত্যেককে রাখা হয়েছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে—গবেষণার জন্যে।

হাসপাতালের মধ্যেই?

হাসপাতালের বাইরে। গোয়েঙ্কা ইনটেনসিভ কেয়ার ইন্সটিটিউটের নাম শুনেছেন?

সে তো খানদানী লোকেদের জায়গা। গভর্ণমেন্টের টাকায় চলে শুনেছি।

গভর্ণমেন্ট মোটা গ্রাণ্ট দেয়। ইন্সটিটিউটের ফাণ্ডে বেশির ভাগ টাকাই আসে বিলেত, আমেরিকার চ্যারিটেবল ফাণ্ড থেকে।

সে তো ভালই।

ভাল তো বটেই। কিন্তু আমি চাই না মালবিকা আর চঞ্চল ওখানে যাক।

কেন চাও না, সিস্টার?

গেলে আর কোনোদিন দেখতে পাব না কি যে হবে ওদের দেহ নিয়ে, জানতেও পারব না। যদি কিডনী কেটে নেয় মালবিকার—

চঞ্চলেরও, টিপ্পনী কাটেন মালু বোস।

ইয়ার্কির সময় এটা নয় নিমুদা, বেশ কড়া গলায় ধাতানি দেয় পৃথিবী—গোয়েঙ্কা ইনটেনসিভ কেয়ার ইন্সটিটিউট দেখলে বুঝতেন—জায়গাটা যেন কেমনতর।

কেমনতর মানে? ইন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

ঠিক একটা কেল্লার মত। মডার্ণ ফোর্ট। ঢোকবার অনুমতি নেই কারোর। তা সে যেই হোক না কেন। বাড়িটাও সৃষ্টিছাড়া। একতলায় জানলা নেই একটাও—দোতলায় মাত্র কয়েকটা জানলা—তাও সব সময়ে বন্ধ। তিনতলা চারতলাতেও সেই একই ব্যাপার।

এতে সন্দেহ করার কি আছে?

শুধু একজনই আমাদের এই হাসপাতাল থেকে নিয়মিত যান গোয়েঙ্কাদের ওখানে।

কে?

ডক্টর দেবাশিস লাহিড়ী—ডিরেক্টর।

কেন?

সেইটা জানবার জন্যেইতো আপনার কাছে আসা। ডক্টর লাহিড়ী খুবই স্নেহ করেন আমাকে। জিজ্ঞেস করতে গেছিলাম—মালবিকা আর চঞ্চল মজুমদারকেও তো ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর কি করবেন?

কি বললেন ডক্টর লাহিড়ী?

উনি কিছুক্ষণ অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন—গবেষণায় গোপনতা রক্ষে করে চলতে হয়, পৃথিবী। এর বেশি আর কিছু জানতে চেও না।

চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপর পাইপটা তুলে নিয়ে মালু বোসের বিলিতি টোব্যাকো এক খামচা তুলে নিয়ে ভেতরে ঠাসতে ঠাসতে বলে—কেউ জানে না গোয়েঙ্কা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের ব্যাপার?

কেউ না।

মালবিকার বাবা মা যখন জানতে চাইবেন?

রিসার্চ পেসেন্ট বলে ভাগিয়ে দেওয়া হবে—কিছু দিন পরে ডেড বডি ফেরৎ দেওয়া হবে।

বটে?

এইজন্যেই তো স্থির থাকতে পারছি না, ইন্দ্রনাথদা। মালবিকা এখনও কি মরে গেছে বলতে চান? ব্রেন মারা গেছে—কিন্তু হার্ট তো চলছে। সেই হার্টও বন্ধ করে দেওয়া হবে দুদিন পরে। চঞ্চল মজুমদারের অবস্থাও হবে একই।

মালু বোস, ক্রাইসিস ম্যানেজারের দিকে তাকায় ইন্দ্রনাথ—কাজ করতে হবে।

কি কাজ? ক্রাইসিস ম্যানেজার নিমেষে চনমনে—পেটে অত সুরা থাকা সত্ত্বেও।

কর্পোরেশনের বিল্ডিং ডিপার্টমেন্ট থেকে গোয়েঙ্কা ইনটেনসিভ কেয়ার ইনষ্টিটিউটের একটা নকশা বার করতে হবে যোগাযোগ আছে?

এই বান্দা একটা হাঁক ছাড়লেই অসম্ভবকেও সম্ভব করে দিতে পারে। 'কিন্তু নকশা নিয়ে কি নকশাবাজি করবে ইন্দ্রনাথ?'

যে জায়গাটা কেল্লার মত দুর্ভেদ্য, তার ভেতরে কোথায় কি আছে বাইরে থেকে জানতে হলে নকশা দরকার। হানা দেওয়া যাবে ঠিক সেইখানে।

যো হুকুম। হো যায়গা।

পৃথিবী।

বলুন দাদা।

তোমার দুটো স্টেটমেন্টে গোলমাল দেখা যাচ্ছে। মর্গ থেকে বডি পাচার হয় কাঠের বাক্সো করে বলেছিলে?

হ্যাঁ, বলেছিলাম।

যে পেসেন্টদের ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখতে হয়, তাদেরকে তো এভাবে পাচাড় করা যায় না।

তাহলে কাঠের বাক্সে করে কাদের চালান করা হয়?

খুব সম্ভব বেওয়ারিশ মরাদের—হয়ত কঙ্কাল বানানোর জন্যেই। তুমি যদি পালিয়ে না আসতে, কে জানে তোমার বডিও এতক্ষণে চালান হয়ে যেত কঙ্কাল কারবারীদের কারখানায়।

কিন্তু—

অত ঝট করে কোন সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়, পৃথিবী। দুটো আলাদা কেস মনে হচ্ছে। মর্গের ব্যাপারটা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ওপর ছেড়ে দেবো। অনেক দিন চাঞ্চল্যকর কেস হাতে না আসায় এস-বি বড় মিইয়ে পড়েছে। ওরা সাদা পোশাকে নজর রাখুক। তোমার কাজ হবে হাসপাতালের মধ্যে।

কি কাজ?

তোমার কথা শুনে কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল। রুগীদের রক্তের রঙ টকটকে লাল—অর্থাৎ অক্সিজেনে ভরপুর—অথচ ব্রেনে যায়নি অক্সিজেন। এটাই রহস্য নম্বর ওয়ান।

কিন্তু কুরারির মত বিষ ওষুধটা দেওয়া হতো করোটির পেশী ঢিলে করে দেওয়ার জন্যে—

পৃথিবীকে থামিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ—অ্যানালিটিক্যালি ভাবতে শেখো, পৃথিবী। তবেই আমার সাগরেদি করতে পারবে। পেনটোথ্যাল বা সাক্সিনাইলকোলিন ক্লোরাইড সলিউশন বাহ্যালোপেন সবার সামনেই দেওয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী কখন কত ডোজ দেওয়া হয়েছে, নিশ্চয় তা নোট করা হয়েছে?

হ্যাঁ। ডক্টর সান্যাল খুবই পার্টিকুলার এ ব্যাপারে।

সুতরাং রেকর্ডেড এভিডেন্সের মধ্যে কোনো গলতি তুমি পাবে না। অতএব বাদ দাও তদন্তের এই লাইন। আমি যা করি, স্পীডে করি। বাজে কাজে মাথা ঘামাই না। ঠিক লাইন ধরব, ঝটিতে শেষ করব। তোমার এই কেসের আমার মনে হচ্ছে, ঠিক লাইনটা ধরতে পেরেছি।

কি লাইন একটু বলবেন? ঝুঁকে পড়ে পৃথিবী, দুই চোখে কৌতূহলের রোশনাই।

থেমে থেমে বললে ইন্দ্রনাথ—অক্সিজেন পাইপের ভাল্ব খুলে দিয়ে সামনে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালবে—কেউ না দেখতে পায়। ফলাফলটা জানতে চাই কালকেই—সন্ধ্যের আগে।

মালু বোসের তৎপরতা
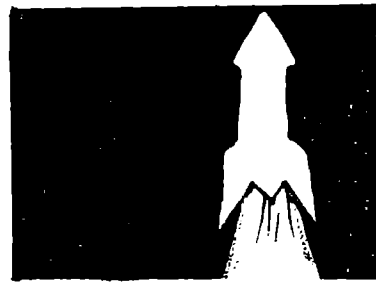
ইক্ষুরস থেকে প্রস্তুত মদ্য অতিরিক্ত মাত্রায় করে পান মালু বোসের ছ'ফুট হাইটের বপুতে একটা জালার আবির্ভাব ঘটেছে ঠিক মধ্যপ্রদেশে। রিভলভিং চেয়ারে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাত বাড়িয়ে ঠিক পেছনকার পাঁচখানা সুইচের একটা টিপে ধরেন। পাঁচখানা সুইচের তার চলে গেছে পাঁচটা ডিপার্টমেন্টে। সবই তাঁর অধীনে। ক্রাইসিস ম্যানেজার। সুইচ টিপেই কোম্পানী চালান বলা যায়।

আরও দুটো প্লাগ আর সুইচ আছে সারি সারি পাঁচটা সাদা সুইচের পাশে। একটা প্লাগে বাজে ক্যাসেটের রবীন্দ্র সঙ্গীত। আর একটায় জলে ঘষা কাঁচের নিচে একটা আলো। এ আলো কোম্পানী দিয়েছে তাঁকে নেগেটিভ দেখবার জন্যে। কিন্তু রাত বিরেতে আলোটার ফাংশন অন্যরকম। ঘরের জোরালো আলো-গুলো নিভিয়ে ঘষা কাঁচের নিচের আলো জেলে দিয়ে মুনলাইট এফেকট তৈরি করেন মালু বোস। নকল চাঁদের আলোয় ঘর যেন ভেসে যায়। উনি গেলাসখালি করেন লুঙ্গি পরে খালি গায়ে এবং ভিস্যুয়ালাইজ করতে থাকেন, কোন ম্যাগাজিনের কোন ছবিটা কি ধরনের হলে অথবা লে-আউট কি ভাবে খেলালে মার মার কাট কাট ভিস্যুয়াল অ্যাপিল দেখা যাবে। সেই সঙ্গে বাজে ক্যাসেটে রবীন্দ্রসঙ্গীত। বিখ্যাত প্রকাশনীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিমলবন্ধু চট্টোপাধ্যায় সব জানেন। নিজে সুরাস্পর্শনা করলেও কোম্পানীতে শুধু একজনের ক্ষেত্রে মদ্য পান তিনি দোষনীয় মনে করেন না—তিনি আমাদের ক্রাইসিস ম্যানেজার মালু বোস।

পৃথিবী আর ইন্দ্রনাথ রুদ্র যখন বিদায় হল, তখন রাত সাড়ে তিনটে। ষ্টুডিওর কাজ শেষ। শুতে চলে গেছে সহযোগীরা। মালু বোস জোরালো আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে ঘষা কাঁচের নিচের আলো জেলে দিলেন। তারপর পাইপ ধরিয়ে রিভলভিং চেয়ারে আড় হয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন কি ভাবে নকশা বার করা যায় চোরপোরেশনের রেকর্ড রুম থেকে।

মালুবোসের মধ্যপ্রদেশ বিশালকায় হলেও ছুটোছুটি করার সময়ে তার হাতে পায়ের বিদ্যুৎগতি দেখে তাজ্জব বনে যায় সকলেই। বিশালদেহী এই লোকটা ভোজপুরী গোঁফ খাড়া করে প্রকাণ্ড ভুঁড়ি নিয়ে কি ভাবে এত স্পীডে দৌড়োন, সেটাও একটা রহস্য।

মালু বোস ভাবছেন। সকাল হলেই এক ঘুম ঘুমিয়ে নেবেন। মালু বোস সকালে ঘুমোন, রাত্রে জাগেন। এটাই তার বডিক্লক। অন্য মানুষদের বডি ক্লক অন্য রকম। তারা রাত্রে ঘুমোন, দিনে জাগেন।

ঘুমিয়ে উঠে কি যাবেন কর্পোরেশনে? ইন্দ্রনাথ যখন দায়িত্বটা তার ওপরেই ছেড়ে দিয়ে গেছে, তখন চোরপোরেশনে হানা না দিলেই নয়।

হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকের মত একটা নাম ভেসে উঠল মালু বোসের মগজে। দর্শন। দর্শন তো তারও বন্ধু, ইন্দ্রনাথেরও বন্ধু।

চোরপোরেশনের ডিরেক্টর ইনফরমেশন অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশন্স। ওকে বললেই তো হয়। তাহলে বিরাট ভুঁড়িটাকে রেষ্ট দেওয়া যাবে।

রিসিভার তুললেন মালু বোস। ওপাশ থেকে নিদ্রাজড়িত হ্যালো সাড়া ভেসে আসতেই বললেন ক্যাও? দর্শন নাকি?

মালু মনে হচ্ছে?

'ইয়েজ, আই অ্যাম, আই অ্যাম।

বোতল শেষ?

কোনকালে।

রিসিভারে একটা পাইট ঢেলে দেব—জাহাজী মাল আছে।

আছে নাকি? লাফিয়ে ওঠেন মালু বোস, আজকেই চাই। সন্ধ্যের আগেই।

ও-কে। কিন্তু ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙানো হচ্ছে কেন এত রাতে?

নকশাবাজি করার জন্যে।

এইটাই কি তার সময়? মাল খেয়ে খেয়ে ব্রেনসেলগুলো যে গেল—।

ব্রেনসেলেরই কেস এটা।

কি? কি রকম?

খুলে বললেন মালু বোস। সব শেষে বললেন—ইন্দ্রনাথের হুকুম, আজ সন্ধ্যের মধ্যেই চাই নকশা।

খরচ আছে।

চোরপোরেশনের চোর অফিসার—একটা পয়সাও দোব না—মাল চাই আজই সন্ধ্যায়।

পাঠিয়ে দোব বোতলটা।

শাট আপ। বোতল প্লাস নকশা—দুটোই চাই।

তাই যাবে।

অক্সিজেনের আর এক ধর্ম

তুখোড় কন্যা পৃথিবী গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে ভোরের আলোয় নিজের বরতনুখানা দেখে নিলে লম্বা দর্পণে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে—গানখানা হঠাৎ মনে এসে গেছে এই কারণেই। কত মুনি ঋষি গেল তল—মশা বলে কত জল। আট নম্বর ঘরের ইনচার্জকে যদি এই জলতরঙ্গ দিয়ে ভাসিয়ে দিতেই না পারল পৃথিবী, তাহলে বৃথা তার যৌবন দম্ভ।

প্ল্যানখানা মনে মনে বেশ ছকে নিয়েছে পৃথিবী। ডক্টর টেনশন খুড়ি তিনকড়ি তলাপাত্রকে আজকে তলিয়ে দিতে হবেই।

ফিক ফিক করে একচোট হেসে নিল পৃথিবী টেনশন তলা-পাত্রর নামখানা মাথায় আসতেই। হাসপাতালের প্রত্যেকে টেনশন তলাপাত্রর নাম শুনলেই খুক খুক করে হেসে ওঠে। ডক্টর দেবাশিস লাহিড়ীকে, মানে, ডিরেক্টরকে যমের মত ভয় পান ভদ্রলোক। কেন যে অত ভয় পান, তা কেউ জানে না। কেন না, দেবাশিস লাহিড়ী রাশভারী হতে পারেন, দাপুটে হতে পারেন—মানুষ হিসেবে কিন্তু অনবদ্য। খাসা লোক। স্টাফের প্রত্যেকের অভাব অভিযোগের খবর রাখেন। কার বাড়িতে কটা ছেলে আর কটা মেয়ে, ড্রাইভার বিলকুল মিঞা তিনটে বউকে ম্যানেজ করে চার ছেলে আর সাত মেয়ে নিয়ে একখানা বাড়িতে গুঁতোগুঁতি করে থাকে কি করে—ডক্টর দেবাশিস লাহিড়ী নখদর্পণে রাখেন সব খবর।

এ হেন মাটির মানুষকে দেখলেই যেন আঁৎকে ওঠেন টেনশন তলাপাত্র। সদাই টেনশনে রয়েছেন—এই বুঝি দেবাশিস লাহিড়ী এসে ডাক পাড়েন—ডক্টর তলাপাত্র ঘুমোচ্ছিলেন নাকি? এই গল্পটা নজরে আসেনি?

হাসপাতালে আরও অপারেটিং রুম তো রয়েছে। প্রত্যেকটা রুমের সুপারভাইসিং ইনচার্জ একজন ডাক্তার। এ ব্যবস্থাটা দেবাশিস লাহিড়ীর। আট নম্বর ঘরের দায়িত্ব দিয়েছেন টেনশন তলাপাত্রের ওপর। ফলে, ভদ্রলোকের টেনশন বাড়তে বাড়তে ব্রেকিং পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। শত্রুরা বলে তিনি নাকি দুঘন্টা অন্তর ট্রাংকুইলাইজার বটিকা খান—তবুও তার হাত কাঁপে থর থর করে, ডক্টর লাহিড়ীর সামনাসামনি হলেই তোৎলাতেও থাকেন।

পৃথিবীর প্রতি একটা দুর্বলতা আছে এই টেনশন ডাক্তারের।

পৃথিবী সেটা জানে। সচরাচর দেখা যায়, যারা একটু তেজী টাইপের মেয়ে, মিনমিনে পুরুষদের তারা একটু বেশি ভাবে আকর্ষণ করে। মিনমিনে বলেই বোধহয় খেলাতে সুবিধে হয়। পৃথিবীও টেনশন ডাক্তারকে যৌবনের রঙ্গ দেখিয়ে খেলিয়ে যায় প্রায় রোজ দিনই। পৃথিবীর অপাঙ্গ চাহনি আর ঈষৎ নিতম্ব দুলুনি দেখলেই টেনশন ডাক্তারের মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হয়। একদিন বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র নিয়ে ভাল মানুষের মতো আলোচনা করতে গেছিল পৃথিবী—চোয়াল লকড হয়ে গেল টেনশন ডাক্তারের। সে এক বিদিগিচ্ছিরি অবস্থা। পৃথিবী শুধু একটা কথাই জানতে চেয়েছিল—ডাক্তারবাবু, চুম্বন কয় প্রকার বাৎস্যায়ন লিখে গেছেন? আপনি জানেন?

ব্যস, সেই যে চোয়াল ঝুলে পড়ল টেনশন তলাপাত্রর—ঝুলেই রইল। হাসতে হাসতে সরে পড়েছিল পৃথিবী।

আজকে পৃথিবী প্ল্যান এঁটেছে এ বাৎস্যায়ন দিয়েই কাজ হাসিল করতে হবে। বইও একখানা যোগাড় করেছে। কুমারী বলেই বইখানা আদ্যোপান্ত বার কয়েক পড়েছে। প্রতিটা পৃষ্ঠাই বলতে গেলে মুখস্থ। টেনশন তলাপাত্রকে ঘায়েল করতে হবে এই বই দিয়েই।

আটটায় ডিউটি পৃথিবীর। হাসপাতালে গিয়েই খোঁজ নিল আট নম্বর ঘরে কটা অপারেশন কোন কোন সময়ে আছে। বেলা একটা থেকে দুটোর মধ্যে কোনো অপারেশন নেই। তখন লাঞ্চ টাইম ডাক্তারদের। পৃথিবী ঠিক করল, ঐ সময়েই বাৎস্যায়ন ডোজ দেবে টেনশন তলাপাত্রকে।

একটা বাজতেই হাজির হল আট নম্বরে। বাইরের অ্যান্টি চেম্বারে টিফিন কেরিয়ার খুলে সবে খেতে বসেছিলেন টেনশন তলাপাত্র। এটাও ডিরেক্টর সাহেবের হুকুম। অপারেটিং রুম ছেড়ে এক মুহূর্তও বাইরে যাওয়া চলবে না। হাসপাতালের কোনো স্টাফ ডিউটি ছাড়া ঘরে ঢুকতেও পারবে না। নিয়মটা আরো বেশি প্রযোজ্য আট নম্বর ঘরের বেলায়। এতদিন পৃথিবী ভেবেছিল, টেনশন তলাপাত্রর টেনশন বৃদ্ধির জন্যেই বোধহয় দেবাশিস লাহিড়ী এত কড়া হয়েছেন আট নম্বর ঘরের ক্ষেত্রে। গতকাল থেকে চিন্তাটা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। আট নম্বর একটা রহস্যময় কক্ষ। সবকটা কোমাটোজ পেসেন্ট অপারেশন করতে এসেই কোমাটোজ অর্জন করেছে এই ঘরেই। কাকতালীয় হলেও হতে পারে—কিন্তু দিবারাত্র দ্বাররক্ষীর মত একজন কোয়ালিফায়েড ডাক্তারকে সামনে বসিয়ে রাখার কি মানে হতে পারে, আজ তা জানা যাবে নিশ্চয়। অক্সিজেন পাইপের ভালভ খুলে দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দেখবে....

কি দেখবে, তা নিজেও জানে না পৃথিবী। ইন্দ্রনাথ রুদ্র আর কোনো কথাই বলেনি। খালি বলেছে, কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট। ভয় নেই। তুমি ফেটে উড়ে যাবে না।

পৃথিবী অ্যান্টি চেম্বারে ঢুকতেই ভাতের গরস হাতে নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন টেনশন তলাপাত্র। ভদ্রলোক মাঝারি হাইটের মানুষ। বিয়ে-থা হয়নি। বউ নাকি খাণ্ডারনী হতে পারে—এই ভয়ে। মাথায় টাক আছে বলে। কত রকমের টাকের ওষুধ টেনশন টাকে লাগিয়েছেন। টাক তাতে আরও প্রশস্ত হয়েছে—রোঁয়া চুলও গজায় নি।

মোহিনী হাসি ছুঁড়ে দিল পৃথিবী। মেকী হাসি। কুন্দ দন্ত আর রসাল অধর যেন মিলে মিশে গেল সেই হাস্য তরঙ্গে। ঝপাৎ করে আছড়ে পড়ল টেনশন তলাপাত্রর ওপর। হাত থেকে খসে পড়ল ভাতের গরস।

কী কী ব্যাপার, মিস পাল?

অপারেটিং রুম এখন ফাঁকা। বিশেষ করে অ্যান্টিচেম্বারে আর কেউ নেই। পৃথিবী ঝুপ করে বসে পড়ল টেনশন তলাপাত্রের পাশের চেয়ারে। গায়ে গা দিয়ে বললে আদুরে গলায়, —ডক্টর তলাপাত্র, একটা বই পড়ছিলাম—এক জায়গার মানেটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

কী কী বই?

বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র।

অ্যাঁ!

আজ্ঞে হ্যাঁ। পাছে মেয়েরা কাড়াকাড়ি করে, তাই সঙ্গে আনতে পারিনি। আপনি নিয়ে আসবেন?

আ—আ—আমি!

ডিউটি রুমে আমার ড্রয়ারেই পাবেন। কাগজ দিয়ে মোড়া আছে—কেউ কিছু বলবে না। যান না, ডাক্তারবাবু।

বলেই, দুহাতে টেনশন তলাপাত্রকে প্রায় টেনেই তুলে দিল পৃথিবী। এঁটো হাতটা সেদিনকার খবরের কাগজে মুছে নিয়ে স্খলিত চরণে টেনশন ডাক্তার দৌড়োলেন নার্সদের ডিউটি রুমের দিকে।

সেই ফাঁকে আট নম্বর ঘরের পাশের খুপরি ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল পৃথিবী। অক্সিজেন গ্যাস সিলিণ্ডার থাকে এই ঘরেই।

শুধু অক্সিজেন গ্যাস নয়, অন্যান্য সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট আর গ্যাস ইত্যাদি সবই থাকে এখানে। ঘরে তালা ঝুলছে। চাবি কোথায়? টেনশন ডাক্তারকে তাড়া দিয়ে ভাগানোর আগে এ ব্যাপারটা মাথায় আসেনি পৃথিবীর। গেল বুঝি প্ল্যানটা গুবলেট হয়।

অসহায় ভাবে এদিক ওদিক তাকায় পৃথিবী। পরক্ষণেই নৃত্য করে ওঠে দুই কৃষ্ণ চক্ষু তারকা।

আলনায় সাদা গাউন ঝুলিয়ে রেখে গেছেন টেনশন ডাক্তার। চাবির তোড়া থাকে গাউনের পকেটেই।

ঝটিতে হাত গলিয়ে চাবি বার করে আনে পৃথিবী। ছুটে যায় খুপরি ঘরের সামনে। প্রথম চাবি লাগল না, দ্বিতীয় চাবি ফেল করল, তৃতীয় চাবিতে তালা খসে পড়ল, অন্ধকার খুপরি ঘর। সুইচটা টিপতেই জ্বলে উঠল আলো, রাশি রাশি সরঞ্জামের ভেতরে, অক্সিজেন সিলিণ্ডারটাকে চিনতে অসুবিধে হল না। কিন্তু তার পাশে রয়েছে আরও একটা সিলিণ্ডার বোঝা যাচ্ছে না। দ্বিতীয় গ্যাসের ভালভের ও মুখ দিয়ে নল বেরিয়ে গিয়ে লেগে রয়েছে অক্সিজেন সিলিণ্ডারের নলে। দুটো নল এক হয়ে দেওয়ালের ফুটো দিয়ে গেছে অপারেটিং রুমে।

ভালভখানা আগে দেখল পৃথিবী। বন্ধ রয়েছে। তার মানে, এখন শুধু অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকেই অক্সিজেন যাচ্ছে অপারেটিং রুমে। দেশলাই কাঠি কি শুধু অক্সিজেনের সামনেই ধরবে পৃথিবী?

হঠাৎ একটা সম্ভাবনা খেলে যায় পৃথিবীর মাথার মধ্যে। ইন্দ্রনাথ রুদ্র ইঙ্গিতে যা বলেছেন। এবার তা পরিস্কার হয়ে যায় পৃথিবীর মগজে। অক্সিজেন সিলিণ্ডারের ভালভটা বন্ধ করে দিয়ে খুলে দেয় লেবেলহীন সিলিণ্ডারের ভালব। অর্থাৎ ও ঘরে এখন যাচ্ছে কেবল এই অজানা গ্যাস।

ছুটে খুপরিঘর থেকে বেরিয়ে অপারেটিং রুমে ঢোকে পৃথিবী। দেশলাই হাতের মুঠোতেই ছিল। একটা জ্বলন্ত কাঠির সামনে খুলে দেয় গ্যাসের ভালব। নিমেষে নিভে গেল শিখা।
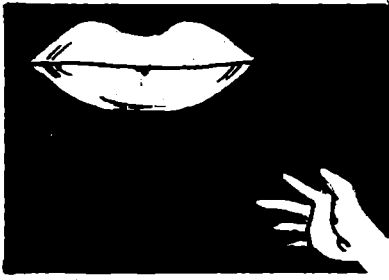
**কিস-মিস**

'মিস পাল'! আতঙ্কিক আর্তনাদ পেছনে—ও কি করছেন?

নেভা কাঠি নিমেষে নিক্ষেপ করে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ায় পৃথিবী।

এক হাতে বাৎস্যায়ন আর এক হাত শূন্যে নাড়তে নাড়তে চেঁচাচ্ছেন ডকটর টেনশন্ থুড়ি, তিনকড়ি তলাপাত্র!

নেচে উঠল পৃথিবী—ডকটর তলাপাত্র। আপনাকেই তো খুঁজছিলাম।

আমাকে!

এই মাত্র দেখে নিলাম অক্সিজেন আগুনকে আরো জ্বালিয়ে দেয় না, নিভিয়ে দেয়।

আগুন! অক্সিজেন।

ডকটর তলাপাত্র, মোহিনীহাসি হেসে লীলায়িত ভঙ্গিমায় এগিয়ে যায় পৃথিবী—আমি যদি আগুন হই, আপনি তাহলে অক্সিজেন।

আমি অক্সিজেন! আপনি আগুন।

আসুন, আমাকে আরও জ্বালিয়ে দিন, দু'হাত বাড়িয়ে তলাপাত্র কণ্ঠবেষ্টন করতে যায় পৃথিবী।

তড়িতাহতের মত পেছিয়ে যায় তলাপাত্র—না, না!

না কী? বিমোহিনী দৃষ্টি পৃথিবীর চোখে—এই তো জীবন। লাইফ ইজ আন অ্যাডভেঞ্চার—ডেয়ার ইট।

নো-নো অ্যাডভেঞ্চার।

পৃথিবীর প্রথম কিস-মিস হয়ে যায় অল্পের জন্যে—বেগে মুখ সরিয়ে নিয়েছেন তলাপাত্র।

লাইফ ইজ-ই গেম—প্লে-ইট!

নো, নো, গেম ফর মি।

পৃথিবীর দ্বিতীয় কিস্‌টাও মিস হয়ে যায় তলাপাত্র এক লাফে পেছিয়ে যাওয়ায়।

লাইফ ইজ এ প্লেজার—এনজয় ইট।

নো, নো, প্লেজার উইথ মি।

তৃতীয় কিসটা মিস হতেই বাৎসায়নশুদ্ধ তলাপাত্রকে জাপটে ধরতে গেছিল পৃথিবী—কিন্তু বায়ুবেগে টেনশন মহাশয় অন্তর্হিত হলেন আট নম্বর ঘর থেকে।

ফিক করে হেসে ফেলল পৃথিবী। বোকা তলাপাত্রটা এত ভিতু কে জানত? এমন সুযোগ কেউ হারায়?

হাসি মিলিয়ে গেল পরক্ষণেই। তলাপাত্র গেল কোথায়?

জানা গেল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। বেয়ারা এসে ডাক দিল পৃথিবীকে—সাহেব ডাকছেন।

সাহেব মানে ডক্টর দেবাশিস লাহিড়ী। ডিরেক্টর!

মিটি মিটি হাসছিলেন ডক্টর লাহিড়ী নিজের চেম্বারে বসে।

টেবিলের এদিকের চেয়ারে বসে বেতসপত্রের মত কাঁপছেন ডাক্তার তিনকড়ি তলাপাত্র।

এসো, এসো, পৃথিবী। বোসো।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসল পৃথিবী।

তিনকড়ির পেছনে লেগেছিলে কেন?

ইয়ে, মানে একটু—পৃথিবী মনে মনে দ্রুত আঁচ করতে থাকে, বোকা ডাক্তারটা বলেছে কতখানি? দেশলাইয়ের ব্যাপার কি ফাঁস করে দিয়েছে?

বুঝেছি। দুষ্টুমি করছিলে? হাসপাতালের নিয়ম কিন্তু ভেঙেছো।

হ্যাঁ, ভেঙেছি, অকপটে স্বীকার করে পৃথিবী। সে তো জানে দোষ স্বীকার করে নিলেই সাজা মকুব করে দেন ডক্টর লাহিড়ী।

মিটি মিটি হেসেই চলেন ডিরেক্টর। খুশি খুশি চোখে চেয়ে আছেন পৃথিবীর দিকে। প্রাণে এত খুশির জোয়ার এল কোত্থেকে, ভেবে পায় না পৃথিবী।

তিনকড়ি তলাপাত্রর দিকে তাকালেন ডক্টর তলাপাত্র—তোমার নাকি এখনও খাওয়া হয় নি?

না, স্যার। সবে খেতে বসেছি, উনি বললেন বইটা আনতে।

তুমিও অমনি উঠে গেলে বই আনতে?

আ—আ—আ—

থাক, থাক। জানো ঐ বই আনতে বলে মেয়েরা কখন কি উদ্দেশ্যে?

না—মানে—আ—আ—আ—

ননসেন্স! তুমি ব্যাচেলর, পৃথিবীও কুমারী। বিয়ে করবে পৃথিবীকে? স্রেফ লাল হয়ে গেলেন তিনকড়ি—বি-বি-বি—

হোপলেস। বিয়ে করার মুরোদ নেই তো বাৎসায়ন আনতে ছুটেছিলে কেন? বইটা কোথায়?

এ এই যে! হাত বাড়িয়ে বাৎসায়নের কামশাস্ত্র এগিয়ে দিলেন তিনকড়ি ডাক্তার।

দাও আমাকে—বিদেয় হও এখন। আর যেন বেচাল না দেখি। ডিউটির সময়ে ঘর খালি রেখে—

বাকি কথাগুলো তিনকড়ি তলাপাত্র আর শুনতে পাননি। তিনি তখন পবন বেগে ধাবিত হয়েছেন আট নম্বর ঘরের দিকে।

পৃথিবী বসে আছে ভিজে বেড়ালের মত।

তিনকড়িকে দাবড়ানি দেওয়ার সময়ে একটু গম্ভীর হয়েছিলেন ডক্টর লাহিড়ী। এখন আবার হাসছেন। দুই চোখ চিকমিক করছে চাপা কৌতুকে।

পৃথিবী।

বলুন স্যার।

ঘাড় বেঁকিয়ে পৃথিবীর চোখে চোখ রাখলেন দেবাশিস লাহিড়ী অক্সিজেনের সামনে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালছিলে কেন?

জোর করে হাসল পৃথিবী—ডক্টর তলাপাত্র বলেন নি?

বলেছে। তুমি আগুন, আর ও অক্সিজেন। সুন্দর উপমা। প্রেমের খেলায় এমন সুন্দর ডায়ালগ কখনো শুনিনি। কিন্তু মাথা মোটাটা তা বুঝতে পারেনি। —আগুন জ্বলেছিল?

অম্লানবদনে মিথ্যে বলে গেল পৃথিবী—হ্যাঁ-হ্যাঁ। ভুউউস করে উঠল। কিন্তু ডক্টর তলাপাত্র এমন চেঁচিয়ে উঠলেন—

তুমি আঁৎকে উঠে নিভিয়ে ফেললে। পৃথিবীর চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে, হেসে হেসে বলে গেলেন দেবাশিস লাহিড়ী।

চমকে উঠেছিলাম।

রিসিভারে, তুলে নিলেন ডক্টর লাহিড়ী—হ্যালো?…যা ছিল, ঠিক আছে। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ডিরেক্টর। মুখ এখন থমথম করছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছেন পৃথিবীর পানে। সে চাহনিতে কৌতুক নেই, স্নেহ নেই। গা শিরশির করে ওঠে পৃথিবীর।

পৃথিবী, অনেকক্ষণ পরে বললেন দেবাশিস লাহিড়ী। আট-নম্বর ঘরটা গবেষণার ঘর। অনেক জটিল কেসের সমাধান সূত্র খুঁজে বার করার চেষ্টা করা হয় ঐ ঘরে। ওখানকার ডেলিকেট

তাতো উঠবেই। চুপি চুপি কাজ করতে গেলে অমনভাবে সবাই চমকে ওঠে—আগুনও নিভে যায়, বলেই একটু থেমে ঝুঁকে পড়ে বললেন—প্রাণের আগুনও। শেষ শব্দ দুটো বললেন না হেসে, চোখের পাতা না কাঁপিয়ে, গলা ঈষৎ কঠিন করে।

মানে?

মানেটা এখুনি একটা টেলিফোন কল পেলেই বুঝবো।

দেবাশিস লাহিড়ীর কথা শেষ হতে না হতেই রিং হল

ইনস্টুমেন্টগুলোয় কেউ হাত দিক আমি তা চাইনা সেই কারণেই, কিন্তু তুমি আমার সেই নিষেধাজ্ঞা ভেঙেছো। ভালভ বন্ধ করে দিয়েছো। জানো এর ফলে নেক্সট অপারেশেন সময়ে রুগীর প্রাণ যেতে পারে?

পৃথিবীর ভেতরে তেজিয়ান সত্তাটা এবার নাগিণীর মত ফণা মেলে ধরল। অজান্তেই শাণিত হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর—যাওয়ার মতই তো অবস্থা অনেকেরই।

কি রকম?

অক্সিজেনের বদলে ঐ যে গ্যাসটা—যে গ্যাসের সামনে আগুন ধরলে নিভে যায়—সেই গ্যাস যদি রুগীর নাকে যায় তার প্রাণের আগুনও নিভে যাবে নাকি?

গেছে কি কারো?

ব্রেণগুলো তো মারা গেছে।

ঈষৎ চমকে উঠলেন যেন দেবাশিস লাহিড়ী। অন্ততঃ পৃথিবীর তাই মনে হল। সামান্য কেঁপে উঠল চোখের পাতা—তার বেশি কিছু নয়।

বললেন গম্ভীর মুখে—ওগুলো অ্যাকসিডেন্ট। হাজার হাজার অপারেশনের মধ্যে এক আধটা কেস কোন ব্যাপারই নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে এসব দুর্ঘটনা ঘটে এগুলো ধর্তব্যের মধ্যে আনলে চলে না। তাছাড়া, প্রতিটি কেসকে আমি নিজে দেখাশুনো করি গোয়েঙ্কা ইনটেনসিভ কেয়ার ইন্সটিটিউটে প্রত্যেকেই বেঁচে আছে এখনো।

মরে বেঁচে আছে বলুন। যেমন চঞ্চল মজুমদার, মালবিকা—সবই তো আটনম্বরের কেস।

ধক করে এতক্ষণে জ্বলে উঠল দেবাশিস লাহিড়ীর দু-চোখ।

তাই তুমি দেখছিলে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে?

হ্যাঁ।

নিজের বুদ্ধিতেই?

জবাবটা দিতে যাচ্ছে পৃথিবী, এমন সময় দেবাশিস লাহিড়ীর ডানদিকের ড্রয়ারে ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল একটা টেলিফোন। ড্রয়ারের মধ্যে যে টেলিফোন আছে, তা তো জানত না পৃথিবী। অত লুকিয়ে রাখার দরকারই বা কী? টেলিফোন তো থাকবে টেবিলের ওপর। তবে কি সিক্রেট টেলিফোন? হট লাইন? বিশেষ কোনো জায়গা বা ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি ব্যবস্থা? বিলিতি স্পাই ফিল্মের দৃশ্য ভেসে ওঠে পৃথিবীর মনের চোখে।

ড্রয়ার টেনে রিসিভার তুলে নিয়েছেন ডক্টর লাহিড়ী। লাল টকটকে রিসিভার। সিক্রেট ফোন বলেই তো মনে হচ্ছে।

সটে কথা সারলেন ডক্টর লাহিড়ী। পৃথিবী শুনতে পেল এক তরফা কথা। দেখতেও পেল না অপর তরফে কে কথা বলছে, কি বলছে। দুই তরফের দৃশ্য কিন্তু পাঠক-পাঠিকার সামনে ভেসে উঠুক ছবির মত।

যমালয়ের নাম ইনটেনসিভ কেয়ার ইন্সটিটিউট।

ইনটেনসিভ কেয়ার ইন্সটিটিউটের একটা ছিমছাম ঘরের মধ্যে ড্রয়ার থেকে লাল রিসিভার বার করে কানে লাগিয়ে বসে আছেন এই সংস্থার চেয়ারম্যান ডক্টর বীরুপাক্ষ বটব্যাল। কালো ডোবার-হাউণ্ড বললেই চলে। বাড়ির চারধারে মোতায়েন ডোবার-হাউণ্ডগুলো বোধহয় এই কারণেই তাঁর এত ন্যাওটা।

বীরুপাক্ষ বটব্যাল বলছেন—সেনসেসন্যাল ব্যাপার, ডক্টর লাহিড়ী। আমাদের তিন বছরের অপারেশনে আজ পর্যন্ত এরকম ঘটনা কখনো আগে ঘটেনি।

দেবাশিস লাহিড়ী বললেন—কি হয়েছে?

বাংলাদেশ থেকে একজন আধবুড়ো মুসলিম এসেছিল পরিচয়পত্র আর এমব্যাসির অনুরোধপত্র নিয়ে। লোকটার নাম ইমদাদ আলি। ইনটেনসিভ কেয়ার ইন্সটিটিউট ঘুরে ফিরে দেখে যেতে চায়। বাংলাদেশে যদি করা সম্ভব হয় ঠিক এই ধরণের সংস্থা—আমাদের সাহায্য করতে হবে।

বেশ?

লোকটা এতই নিরীহ যে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারিনি। আট ফুট উঁচু পাঁচিল পেরিয়ে ডোবারহাউণ্ডদের ভড়কি দিয়েও ভেতরে ঢুকে পারত—যদি সোজা পথে কাগজপত্র দেখিয়ে ঢোকবার অনুমতি না পেত।

কি হয়েছে বলুন না।

লোকটা ষ্টীল দরজার সামনে দাঁড়াতেই ইলেকট্রনিক মাইক্রোফোনে পরিচয় জানতে চাওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে ভিজিটর এসেছে শুনে ষ্টীল প্লেট সরিয়ে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়। ভিজিটর্স রুমে বসানো হয়। কাগজপত্র দেখে আমি পারমিশান দিলাম। নার্স মাধবী তাকে ভিজিটর্স রুমের স্ক্রীনে প্রোজেকশন ফেলে দেখিয়ে দিয়েছিল ইন্সটিটিউটের নিয়মকানুন আর উদ্দেশ্য। লোকটা সব দেখার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করে অপারেটিং রুমের ছবিটা দেখালেন না?

তাই নাকি?

নার্স হকচকিয়ে যায়। সন্দেহও হয়। অপারেটিং রুমের ব্যাপার তো একেবারেই সিক্রেট। আমাদের অফিসিয়াল রেকর্ডেও এ ঘরের অস্তিত্ব রাখা হয়নি। তবে লোকটা জানল কি করে? স্পাই নাকি?

মাধবী তাকে বসতে বলে চলে আসে আমার কাছে। আমি গার্ড রুমে সঙ্গে সঙ্গেই খবর দিই ক্লোজড সার্কিট টি, ভিতে লোকটা কি করছে দেখার জন্যে।

তারপর? তারপর?

দেখা গেল ভিজিটর্স রুমে সে নেই।

কিন্তু ষ্টীল ডোরের প্লেট তো আর কেউ সরাতে পারবে না?

বাইরে সে যায়নি—ভেতরেই ঢুকেছে। গার্ড রুম থেকে প্রত্যেকটা ঘর, করিডরের ক্লোজড সার্কিট টি, ভি ক্যামেরা চালু করে দেওয়া হলো। দেখা গেল লিফটের সামনে করিডোরে দাঁড়িয়ে ইমদাদ আলি একটা নকশা খুলে দেখছে।

নকশা।

নিশ্চয় এই ইন্সটিটিউটের নকশা। তাতেই তো দেওয়া আছে অপারেটিং রুম কোনদিকে রয়েছে। লোকটার চেহারাও আর নিরীহ বলে মনে হল না। শিরদাঁড়া সোজা। চোখ চনমনে। লিফটে উঠে নিজেই চালিয়ে নিয়ে গেল ওপরতলায়।

তারপর?

কোন তলায় নামবে বুঝতে না পেরে আমি রিভলবার সমেত গার্ড পাঠালাম সবকটা তলায়। লিফট কিন্তু ওরা পৌঁছোনোর

আগেই পৌঁছে গেছে চারতলায়। লিফট থেকে নেমে সটকানও দিয়েছে।

"গেল কোথায়?'

"প্রথমে গেছিল সাসপেনসন্ রুমে। যেখানে শখানেক পেসেন্টকে তারের ফ্রেমে করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে শূন্যে—যাতে বেডসোর না হয়। কত মাস থাকবে, তার তো ঠিক নেই। যখন যে অরগ্যানের অর্ডার আসে, সেই ভাবে এক একজনকে নিয়ে যাই অপারেটিং রুমে।

"জানি, জানি, ইমদাদ আলি কোথায় গেল?"

"এই ঘরের মধ্যে দিয়েই গেছে। চঞ্চল মজুমদার আর মালবিকার ঝুলন্ত বডির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। টি, ভি ক্যামেরায় তা দেখা গেছে। ওপরের সিলিংয়ের কপিকলগুলো কমপিউটারে কিভাবে চালু রয়েছে, তাও দেখেছে। পকেট ক্যামেরায় ছবিও তুলেছে।

চঞ্চল মজুমদার আর মালবিকার ছবিও তুলেছে। শুধু এই দুজনের ছবি তুলল কেন, তা বুঝলাম না। অবশ্য লেটেস্ট অ্যারাইভাল কিনা, তা শেষ দুটো নাম্বার দেখেই বোঝা যায়। তারের বেডের গায়ে লাগানো নাম্বার দুটো দেখেই ফটো তুলেছে ইমদাদ আলি।

"সর্বনাস। এবার সব বুঝেছি।"

কি বুঝেছেন?

পরে বলব। তারপর কি হল?

পাশেই তো অপারেটিং রুম। দরজা ফাঁক করা ছিল। কথাবার্তা হচ্ছিল দুজন সার্জেনের মধ্যে। এগজ্যাক্ট কথাবার্তা শুনলেই বুঝবেন ইমদাদ আলি সব জেনে ফেলেছেন।

কি কথাবার্তা বলুন তো?

আগের বারের হার্টটা কোথায় গেল জানেন? সানফ্রান্সিসকোয় গেছে—জরুরী অর্ডার, পঁচাত্তর হাজার ডলার পাওয়া যাবে, কিন্তু এবারের এই ফোর-টিশু ম্যাচ কিডনীটা বিক্রি হচ্ছে দু' লক্ষ ডলারে। থ্রি-টিশু ম্যাচের একটা অর্ডার পড়ে আছে না? পেসেন্ট আসবে মোহনসিং হাসপাতাল থেকে সামনের সপ্তাহে।

হুবহু এই সব কথাই হয়েছে? উদ্বিগ্ন হলেন দেবাশিস লাহিড়ী

হ্যাঁ। সার্জন দুজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি। সিলিংয়ের ঘুরন্ত টি ভি ক্যামেরায় দেখা গেছে ইমদাদ আলি পকেট টেপরেকর্ডারে সব রেকর্ড করে নিয়েছে।

কোথায় সে?

আর কোথায়! আমাদের কাণ্ডকারখানা সব জেনে নিয়ে, আমাদেরই একজন গার্ডের পা জখম করেছে গুলি ছুঁড়ে। তারপর, লিফটের পাশে যে ফায়ার এসকেপ থাকে, তার মধ্যে দিয়ে পাইপ বেয়ে নিচে নেমেছে, গ্যারেজের ফলস সিলিংয়ের ওপর উঠে বসেছিল। স্পেশ্যালি প্যাক করা হার্ট নিয়ে ভ্যান যেই বেরিয়েছে, ফলস সিলিংয়ের পাশ দিয়ে লাফিয়ে পড়েছে ভ্যানের ছাদে।

কেউ ধরতে পারল না?

টি-ভি ক্যামেরা ধরেছিল। কিন্তু মানুষ যন্ত্রের চাইতেও বেগে কাজ করে। বিশেষ করে এই মানুষটা। টি-ভি ক্যামেরায় খবর পেয়ে যখন ডোবার হাউণ্ডদের ছাড়া হল, চার জন গার্ডের একজন তো জখম হয়েছিল—বাকি তিনজন দৌড়ে গেল—ততক্ষণে ভ্যান ফটক পেরিয়ে চলে গেছে বাইরে। ডক্টর লাহিড়ী, গভীর জলে পড়েছি। জ্যান্ত মানুষের দেহযন্ত্র নিয়ে গবেষণার নামে যে কালো বাজারে বিক্রি করছি—আর তা গোপন থাকবে না সর্বনাশ হয়ে গেল। কি করি বলুন তো?

বলছি—একটু পরে, বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন দেবাশিস লাহিড়ী। মুখ থমথমে। লাল টেলিফোনের ড্রয়ার বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন—পৃথিবী, একটু বোসো। আমি আসছি।

তিনকড়ির প্রেম

টেলিফোনে যেটুকু শুনল পৃথিবী, তা থেকেই বুঝে নিল কি ঘটেছে। ইমদাদ আলি নিশ্চয় নকশা নিয়ে গোয়েন্দা ইনটেনসিভ কেয়ার ইন্সটিটিউটে গেছে। চম্পটও দিয়েছে।

এবং, ইমদাদ আলি ছদ্মবেশী ইন্দ্রনাথ রুদ্র ছাড়া আর কেউ নয়। দেবাশিস লাহিড়ী বাইরে যেতেই টেবিলের প্যাড থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিল পৃথিবী। ডট পেন টেবিলেই ছিল। দ্রুত লিখল এই ক'টি কথা:

বিখ্যাত প্রকাশনীর ক্রাইসিস ম্যানেজারকে এখুনি খবর দিন যদি আমাকে প্রাণে বাঁচাতে চান। পৃথিবী পাল।

লেখা শেষ করে, ডট পেন আর প্যাড যথাস্থানে রেখে, কাগজটা দলা পাকিয়ে ট্যাঁকে গুঁজতে না গুঁজতেই দেবাশিস লাহিড়ী ঢুকলেন ঘরে। টেবিলে বসলেন হাসি হাসি মুখে।

বললেন বসার সঙ্গে সঙ্গে—কাজের কথা বলা যাক, পৃথিবী। একথা তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না। এই যে কফি এসে গেছে—খেতে খেতে কথা বলা যাবে।

বেয়ারা দুকাপ কফি নামিয়ে দিয়ে গেল টেবিলে।

চুমুক দিলেন দেবাশিস লাহিড়ী। পৃথিবী নিজেও টেনশনে ছিল। কফি পেয়ে বর্তে গেল। চুমুক দিল সঙ্গে সঙ্গে। চেয়ে রইল ডিরেক্টরের সুদৃশ্য চীনে পেয়ালার দিকে। নিজের কাপটা অত ভাল নয়। তা হোক। কফিটা খাসা।

দেবাশিস লাহিড়ী বললেন—পৃথিবী, তোমার ব্রেন আছে, এনার্জি আছে, শরীরে চটক আছে, চোখে বিদ্যুৎ আছে। তোমাকে আমাদের মধ্যে চাই। বিনিময়ে পাবে লক্ষ লক্ষ টাকা। কালো টাকা। রাণীর মত থাকবে। রাজি?

কি করতে হবে? চুমুক দিতে দিতে বলে পৃথিবী।

"গোয়েন্দা ইনটেনসিভ কেয়ার ইন্সটিটিউটে ইমদাদ আলি নামে একটা লোক গেছিল একটু আগে। ফটো তুলেছে, টেপ করেছে, তারপর পালিয়েছে। তাকেও চাই আমাদের দলে রাজি?

কিন্তু কি করতে হবে বলুন।

ইমদাদ আলিকে তুমি পাঠিয়েছিলে?

মাথা ঝিমঝিম করছিল পৃথিবীর। ঘুম পাচ্ছে হঠাৎ। বললে জড়িত স্বরে—হ্যাঁ।

"কে সে?"

ফুঁসে ওঠার চেষ্টা করে পৃথিবী। কিন্তু মাথাটা কেবল লটকে পড়তে চাইছে বুকের ওপর। বললে স্খলিত স্বরে— ইন্দ্রনাথরুদ্র।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ?

হ্যাঁ।

তাহলে ঠিক আছে। টাকা দিলেই মুখ বন্ধ করা যাবে।

ইন্দ্রনাথদা পয়সার কাঙাল নয়।

অনেক কাঙালকেই তো দেখলাম। তুমি?

আমিও না।

তাহলে আসবে না আমাদের দলে?

"না—না—না।"

উঠে এলেন দেবাশিস লাহিড়ী। দাঁড়ালেন পৃথিবীর পাশে, ওর নেতিয়ে পড়া মাথার কাছে মুখ নামিয়ে বললেন— তবে শুনে যাও বিজ্ঞানের জন্যে, মানুষের মঙ্গলের জন্যে আমরা গত তিন বছর ধরে কি করে চলেছি। ব্রেন ট্রান্সপ্লান্ট করানো এখনো সম্ভব হয়নি বটে – কিন্তু হার্ট, কিডনি—সবই নতুন করে বসিয়ে দিচ্ছি পৃথিবীর নানান জায়গায় বড় বড় লোকদের দেহে যাদের বেঁচে থাকার দরকার আছে। অদূর ভবিষ্যতে ক্যানসার রোগেও আর কেউ মারা যাবে না—টাটকা সজীব দেহযন্ত্র চালান যাবে এখান থেকে। আয়ুকে আমরা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করব মানুষকে অমর হওয়ার পথে নিয়ে যাবো—দু-চারটে জীবন তাতে যাবে বইকি....বিজ্ঞানের বেদীমূলে এরকম কত জীবন তো গেছে। লা ভিঞ্চি কবর খুঁড়ে লাশ তুলে কাটা ছেঁড়া না করলে আমরা কোথায় থাকতাম? কোপারনিকাস চার্চের ভয়ে সত্যি কথা না বললে বিজ্ঞান কোথায় ঠেকে থাকত? পৃথিবী, পৃথিবী আমরা চাই মহান পৃথিবী, মানুষ যেখানে অমর হয়ে থাকবে—"

পৃথিবী তখন একেবারেই নেতিয়ে পড়েছে।

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন দেবাশিস লাহিড়ী। ঠোঁট শক্ত। চোখ জ্বলছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—তবে তাই হোক, পৃথিবীর হার্ট আর কিডনী। চোখ আর লাংস চলে যাক পৃথিবীর নানা জায়গায়। পৃথিবী, তুমি ছড়িয়ে পড়ো সারা পৃথিবীতে।
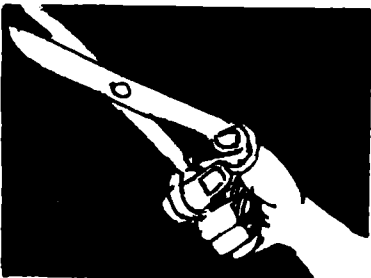
**কাঁচিহাতে ক্রাইসিস্ ম্যানেজার**

রাতে নাইট ডিউটি দিলে পরের দিনও লুঙ্গি পরে ডে-ডিউটি দেন ক্রাইসিস্ ম্যানেজার মালুবোস। যদিও ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চেম্বারের ঠিক সামনের চেম্বারটাই তাঁর। ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফিসে এসে নিত্যদিনের অভ্যেস মত তাঁর ঘরে একবার উঁকি মেরে দুটো রসালাপ করেও যান, কিন্তু সাহেবীকায়দায় সাজানো অফিসে লুঙ্গি পরে বসে থাকার জন্যে কিছু বলেন না। মাঝে মাঝে লুঙ্গির ওপরে ভুঁড়িটাকে ঢাকা দেওয়ার জন্যে গেঞ্জি চাপান মালুবোস, কখনো ছিটের চিকন পাঞ্জাবী। আজকে তিনি পাঞ্জাবী আর লুঙ্গি পরেই ডে-ডিউটি সারছেন।

দর্শন সকালের দিকেই মিরাক্যল ঘটিয়ে গেছে, মানে, গোয়েঙ্কা ইনটেনসিভ কেয়ার ইনস্টিটিউটের বিল্ডিং প্ল্যান দিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে জাহাজী মালের বোতল। লোলুপ নয়নে মাঝে মাঝে বোতলটার দিকে (মেঝেতে বসানো রয়েছে) তাকাচ্ছেন মালু বোস এবং ঘন ঘন পাইপ টানছেন। প্ল্যান করেছেন, সন্ধ্যে হলেই সোজা বাড়ি সটকাবেন। বোতল খুলে আগে বুঁদ হবেন, তারপর ভূতেদের ছবি আঁকতে বসবেন। অনেকগুলো ভূতের অর্ডার এসেছে। ভূতের মানে ভূতের ছবির। গল্পে আর প্রচ্ছদের। একবার সারারাত ভূতের ছবি আঁকবার পর নাকি অশরীরী ভূতের শরীরী হয়ে তার আঁকা ছবি থেকে উঠে এসে গোল হয়ে তাকে ঘিরে ভূত নৃত্য করেছিল। এই কাহিনী ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই ভূত-ছবি আঁকার বাজার তিনি একাই ধরেছেন। ভূতেরা যাঁর এত গোলাম, তার হাতে ছাড়া আর কারো হাতে ভূতের ছবি আঁকার ভার দেওয়া সমীচিন বোধ করেন না সম্পাদক আর প্রকাশকরা।

আচমকা পর পর দুটো ভিজিটর্স স্লিপ এসে পৌছোলো তার টেবিলে। বিখ্যাত প্রকাশনীর রিসেপসনিষ্ট বড়া কড়া মহিলা। এমনিতে হাসাহাসি মুখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বললে কি হবে, স্লিপ ছাড়া কাউকে ভেতরে এক পাও এগোতে দেন না।

স্লিপ দুটো পড়েই শির দাঁড়া খাড়া করে ফেললেন মালু বোস। ভদ্রলোকের এই শির দাঁড়াটিও একটি রহস্যময় বস্তু। এত বিরাট ভুঁড়ির ওজন নিয়ে কিভাবে যে খাড়া থেকে বুকখানাকে চিতিয়ে রাখেন, তা অনেকেরই গবেষণার বিষয়। কৈশোরে নাকি বুক চিতিয়ে বাগবাজারের গুণ্ডা ঠেঙিয়েছেন – চিতোনার অভ্যেস এখনো ছাড়তে পারেন নি। চার চারটে সম্পাদক তাঁর সামনে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে যায়—চিতোনা বুক দেখেই সম্পাদকরা মিইয়ে যান—গুণ্ডার সামনে পড়লে ভাল মানুষদের অবস্থা যে রকম হয় আর কি! তারপর ঐ ভোজপুরী গোঁফ—খাড়া হয়ে যায় ক্ষেপে গেলেই।

ভোজপুরী গোঁফ এখনও খাড়া হয়ে গেল স্লিপ দুটো দেখে, প্রথমটায় লেখা আছে ইন্দ্রনাথ রুদ্রের নাম। দ্বিতীয়টায় লেখা ডাক্তার তিনকড়ি তলাপাত্র। ভীষণ জরুরী। পৃথিবী পালের বিষয়ে।

পৃথিবী পালের বিষয়ে! তিনকড়ি আবার কোন মক্কেল! সঙ্গে সঙ্গে দুজনকেই ডেকে পাঠালেন মালু বোস।

ঘরে ঢুকল দুজন অচেনা লোক। কুঁজো আধবুড়ো মুসলমান। আর একজন টেকো মাঝারি হাইটের নিরীহ জীব—চোখমুখ কিন্তু ভীষণ উদ্বিগ্ন।

কটমট করে দুজনের পানে তাকিয়ে রইলেন। ইন্দ্রনাথ রুদ্র কই?

চোখের প্রশ্ন বুঝে নিয়ে আধবুড়ো মুসলমান বললে—আমিই ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

নিমেষে দুই চোখে তারিফ নাচিয়ে ইন্দ্রনাথকে বসতে ইঙ্গিত করলেন মালু বোস। তারপর চাইলেন তিনকড়ি নামক জীবটির

দিকে—'কী ব্যাপার?'

জীবটি বললে—আমি মোহন সিং হাসপাতাল থেকে আসছি। পৃথিবী ট্যাক থেকে খুলে এই চিঠিটা আমায় গুঁজে দিল। কথা বলতে পারছিল না—অ্যানেস্থেসিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে তো। এখুনি অপারেশনান হবে।

অপারেশন! পৃথিবীর! কেন?

ও যে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলেছিল গ্যাসের সামনে।

সবেগে প্রশ্ন করলে ইন্দ্রনাথ—কাঠি জ্বলছিল, না নিভে গেছিল?

নিভে গেছিল।

এত জোরে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ যে চেয়ার ছিটকে পড়ল পেছনে।

কুইক, মালু, কুইক! ট্যাক্সি পাব না—তোর গাড়ি নিয়ে যেতে হবে—নইলে পৃথিবীর ব্রেনও গেল!

কোনো কৌতূহল দেখালেন না মালু বোস। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। টেবিলের ওপর আট ইঞ্চি লম্বা বিশাল কাঁচি-হাতিয়ারের মত বাগিয়ে ধরে তেড়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তিনকড়িকে হাত ধরে টেনে আনতে ভুললেন না।

আট নম্বর ঘরে তখন মাস্ক পরানো হয়ে গেছে পৃথিবীর মুখের ওপর। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন পৃথিবী! ডক্টর দেবাশিস লাহিড়ী একাই সব কাজ করে যাচ্ছেন—আর কোনো ডাক্তারকে ডাকেন নি। তিনকড়ি যে কখন সটকেছে, সে খেয়ালও নেই। নার্স একজন আছে বটে, তার দিকেও তাকাচ্ছেন না। সে শুধু জানে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের অপারেশন হবে পৃথিবীর ওপর। এমার্জেন্সি কেস।

আচমকা বাইরে সোরগোল শোনা গেল। স্ক্যালপেল হাতে নিলেন ডক্টর লাহিড়ী। চামড়ায় বসাতে যাবেন, আচমকা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল তিনটে মূর্তি। চিনতে পারলেন তিনকড়ি ভলাপাত্রকে—বাকি দুজনের একজন গুঁফো গুণ্ডার মত বিশাল ভুঁড়ি আর লুঙ্গি দুলিয়ে সাঁ করে ছুটে গিয়ে কচাং করে কেটে দিলে অক্সিজেন গ্যাস পাইপ। আর একজন পকেট থেকে রিভলভার বার করে ঠেকালো লাহিড়ী ডাক্তারের বুকে।

বললে—খেল খতম, ডাক্তার সাহেব।

লোকটা আধবুড়ো মুসলমান। ইমদাদ আলি নাকি?

ইমদাদ আলি মনে হচ্ছে? শুধোন ডিরেক্টর।

খবর চলে এসেছে এত তাড়াতাড়ি? বেশ, বেশ, লোকে আমাকে ইন্দ্রনাথরুদ্র বলেই জানে অবশ্য। ওকী, এত লোক কেন? আরে মশাই, ভিড় কাটান, পুলিশ এসে গেল বলে।

একটু উপসংহার

তিনকড়ি আর পৃথিবী পাশাপাশি বসে আছে সোফায়। কবিতা দুটো গোড়ের মালা পরিয়ে দিয়েছে দুজনের গলায়। শাঁখ বাজিয়েছে ইন্দ্রনাথ নিজে। উলুধ্বনি দিয়েছে মালু বোস।

আমাকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মুখ ঝামটা দিলে কবিতা—হাঁ করে দেখছো কী? মিষ্টি আনাও। আজ বড় শুভদিন।

মিষ্টি তো আসছে। খাণ্ডারনী বউয়ের সামনে চিরকালই অমনিভাবে কুঁচকে যাই আমি।

তাহলে বসে পড়ো। এবার ঠাকুরপো, তুমিও বলো,

কি ছিল দ্বিতীয় সিলিণ্ডারে?

কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস, বললে ইন্দ্রনাথ।

কেন?

দুটো কারণে। রক্তে অক্সিজেনের বদলে কার্বন মনোক্সাইড গেলে রক্তের রঙ টকটকে লাল থেকে যাবে—অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলে ব্রেনের কোষগুলো মারা যাবে। কিন্তু যেহেতু ব্রেনের ওপর হার্ট নির্ভর করে না, হার্টকে চালু রেখে দেওয়া যাবে। জ্যান্ত মড়া তৈরি হয়ে যাবে।

ব্রেন বটে তোমার একখানা। কিন্তু এই কচি মেয়েটাকে সাগরেদ বানিয়েছিলে কেন? যদি ওর ব্রেনটা মারা যেত?

একটু ঝুঁকি নিয়েছিল বলেই তো মনের মানুষকে পেয়ে গেল। কি তিনকড়ি ডাক্তার, পৃথিবী আপনাকে ভালবাসে, তাই না? নইলে বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র নিয়ে আপনার কাছে দৌড়োবে কেন?

মুখ লাল হয়ে গেল তিনকড়ি ডাক্তারের।

হুঙ্কার ছাড়ল কবিতা—মরণ দশা আর কী! ছোটদের সামনে মুখের আগল রাখতেও শেখেনি এখনও। ব্যাচেলর হলেই কি এমনি হয়?

বোধহয়, বলেই সদ্য আনা একটা সন্দেশ মুখে পুরে দিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

রহস্য গল্প অদ্রীশ বর্ধন

# অশনি অস্ত্র

ইন্দ্রনাথ রুদ্র টুলের ওপর পা তুলে বসে, দু'কানে হেডফোন লাগিয়ে বেতার-সংগীত শুনছিল। বেশ মেজাজে আছে, স্তিমিত নয়নযুগল দেখেই বুঝলাম। প্রয়োজনে যে মূর্তিমান বজ্র হতে পারে, তার এহেন সংগীত সুধা শ্রবণে মেজাজি রূপ অনেকদিন দেখিনি।

তাই চৌকাঠ থেকেই হেঁকে বলেছিলাম—'হে বন্ধু, আমরা এসেছি।'

সত্যিই তন্ময় হয়েছিল ইন্দ্র। চমকে উঠে খাটো চারপায়া থেকে পদযুগল নামিয়ে নিয়ে, কান থেকে একটানে ইয়ারপিস খুলতে খুলতে বললে—'স্বাগতম, স্বাগতম। সাতসকালে দেখিনু লেখক বদন, দিবস যাইবে ভালো।'

আমি চৌকাঠ পেরোলাম লম্বা পায়ে। আড্ডাঘরে ঢুকছি যখন, তখন লম্ফ দেওয়াই তো উচিত। আমার পশ্চাতের মানুষটা কিন্তু কুণ্ঠিতভাবে প্রবিষ্ট হল ঘরে।

দু'হাত তুলে ইন্দ্রকে নমস্কার ঠুকতে ঠুকতে বললে—'আমিই বৈষ্ণব বসু। আমার কথাই মৃগাঙ্কবাবু আপনাকে বলেছিলেন। আপনি দেখা করতে সম্মতি দিয়েছিলেন, তাই এসেছি।'

স্মিতবদনে বললে ইন্দ্র—'শুনতে সম্মতি দিয়েছিলাম, আপনার প্রবলেম। সমস্যাটা কী?'

সোফায় তনুবর স্থাপন করতে করতে বললে সুন্দরদেহী বৈষ্ণব বসু—'প্রবলেম আমার সিস্টার-কে নিয়ে।'

'কী রকম প্রবলেম?'

'প্রেম।'

'সে তো উত্তম বস্তু, মশায়। এই দেখুন না, আমার এই সাহিত্যিক সুহৃদটিকে। সামান্য একটা রুপোর টাকা নিয়ে এমন প্রেম ঘটিয়ে বসল যে নাম কাটিয়ে বেরিয়ে গেল আইবুড়ো মন্দির থেকে।'

'কী মন্দির?'

'আইবুড়ো মন্দির। ব্যাচেলরদের ক্লাব। সবেধন নীলমণি মেম্বার হয়ে রয়ে গেলাম আমি একা। সব কেটে পড়েছে।'

ঈষৎ হাস্য করে বললে বৈষ্ণব বসু—'বেড়ে নাম তো! আইবুড়ো মন্দির? বেরিয়েছিল কার ব্রেন থেকে?'

'এই অধমের ব্রেন থেকে। যাক সে কথা। পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটতে চাই না। মৃগাঙ্ক যে রকম কটমট করে তাকাচ্ছে...আপনার প্রবলেমটা কি বৈ...বৈ...'

'বৈষ্ণব বসু। অদ্ভুত নাম, তাই না?'

'বিলক্ষণ।'

'প্রবলেম আমার বোন-কে নিয়ে। তার নামটাও গাল ভরা।'

'যেমন?'

'মহালয়া।'

'অপূর্ব! অপূর্ব! নামকরণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বটে আপনাদের জনক-জননী। মহালয়া...মহালয়া...দেবীপক্ষের পূর্ব অমাবস্যা মহালয়া। ঠিক বলছি, মৃগ? আমি অবশ্য বাংলায় কাঁচা...'

তিক্তস্বরে বললাম—'ইন্দ্র, হাস্য পরিহাসের জন্যে আসিনি। বেতাল বুকনি ছেড়ে কাজের কথায় আয়।'

'উত্তম কথা। শোনা যাক তাহলে বেদের বচন। মশায় বৈষ্ণব বসু, মহালয়া কী জাতীয় ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছে?'

'বিয়ে করতে উঠে পড়ে লেগেছে।'

'সাধু! সাধু! তাতে আপনার গায়ে ফোসকা পড়ছে কেন?'

'ব্রহ্মবিন্দু'র মতলব সুবিধের নয় বলে।'

'ব্রহ্মবিন্দু? সেটা আবার কী বস্তু?'

'বেদ পাঠকালে মুখ-নিঃসৃত নিষ্ঠীবন-বিন্দু।'

'থুথু?'

'আজ্ঞে।'

'মানুষের নাম থুথু? কালে কালে কত কী শুনতে হবে! কী করতে চায় ভাবী ভগ্নীপতি থুথু মশায়?'

'সম্পত্তি হাতাতে চায়।'

'কী প্রকারে?'

'আমার সহোদরকে যমালয়ে পাঠিয়ে!'

'উত্তম পরিকল্পনা! আপনার সহোদরা...কী যেন নামটা?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহালয়া...নিশ্চয় বিপুল বিত্তের অধিকারিণী?'

'অবশ্যই।'

'কী প্রকারে?'

'পিতৃদেবের উইল অনুসারে।'

'বিশদে বলুন।'

'বাবা তাঁর এক ছেলে আর এক মেয়েকে সম্পত্তি দাঁড়িপাল্লায় মেপে দু'ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে বোন-কে আমি বুড়ো আঙুল দেখাতে না পারি। কলকাতায় বড় রাস্তার ওপর একটা বাড়ি আমার, আর একটা বাড়ি আমার বোনের। ব্যাংকে আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্টে পঞ্চাশ লাখ আমার, পঞ্চাশ লাখ আমার বোনের। প্লাস গয়নাগাটি...মায়ের...ফাউ...পাচ্ছে আমার বোন...আমি পেয়েছি লবডঙ্কা।'

'তাতেই আপনার গাত্রদাহ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে এত বিচলিত কেন?'

'পৈতৃক সম্পত্তি বেহাত হতে পারে বলে।'

'কী পন্থায়?'

'আমার এই স্টুপিড বোন যাকে রেজিস্ট্রি বিয়ে করে বসে আছে, তার সঙ্গেই জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট খুলে পঞ্চাশ লাখ ভোগ করার অধিকার দিয়েছে।'

সূচ্যগ্র হল ইন্দ্র-চক্ষু—'আইদার-অর অ্যাকাউন্ট?'

'আজ্ঞে', বিলক্ষণ তিক্ত বৈষ্ণব বসু'র কণ্ঠস্বর—'বুঝতেই পারছেন?

বোন পটকে গেলেই ভগ্নীপতি ঝেড়ে দেবে পঞ্চাশ লাখ।'

'পটকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেই মনে করছেন?'

'সেই সম্ভাবনা রোধ করার জন্যে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি।'

সশব্দে নস্যগ্রহণ করল ইন্দ্রনাথ রুদ্র। নিমীলিত লোচনে কড়িকাঠ নিরীক্ষণ করে গেল মিনিট কয়েক। তুরীয় অবস্থা। আমি লক্ষণ জানি। তাই নিশ্চুপ রইলাম।

তারপর বললে বন্ধুবর—'মালটার নাম কী?'

'কোন মালটা?'

'আপনার বুরবক বোন যাকে মন দিয়েছে?'

'গজাল।'

'কী বললেন?' সত্যিই আঁতকে উঠল ইন্দ্র—'গজাল গুপ্ত?'

'চেনেন নাকি?' বৈষ্ণব বসু বিলক্ষণ চমকিত চক্ষু।

'হাড়ে হাড়ে। বডি ফেলতে ওস্তাদ। বঙ্গের কুলাঙ্গার।'

বিচলিত বৈষ্ণব বসুর বচন গেল কেঁপে—'তাহলে এখন করণীয় কী?'

'আগে সহোদরাকে প্রাণে বাঁচান, তারপরে গজাল গুপ্ত-কে ফাঁসান।'

'কীভাবে? কীভাবে?'

এরপর ইন্দ্রনাথ যেসব অ্যাকশন নিয়েছিল, আমি তার বিশদে যেতে চাইছি না কাহিনিটাকে নাতিদীর্ঘ রাখতে চাই বলে।

তবে একটা প্রসঙ্গের উত্থাপন না করলেই নয়। ইন্দ্রনাথ.না পড়ে গোয়েন্দা শিরোমণি হয়নি। শুধু গোয়েন্দা সাহিত্যই নয়, হাই-টেক ক্রাইম আর ক্রাইম ফাইটিং, ফরেনসিক সায়েন্স, এমনকী ক্রাইম সাইকোলজি গুলে খেয়েছে। এর সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে সোশ্যাল সাইকোলজি। ওর আড্ডা-বক্তৃতা আর যখন-তখন বচনমালা থেকে একটা জিনিস সুস্পষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে। ঠগি-পিণ্ডারি বর্গিদের আমল ফিরে এসেছে এই ভঙ্গ বঙ্গে নব কলেবরে। এরা পাড়া মস্তান আর পার্টি মস্তান হয়ে কুক্ষিগত করে রেখেছে এই কপালপোড়া দেশটাকে। ক্রাইম এখন আর বিশেষ একটা শ্রেণির মধ্যে সীমিত নয়, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে গোটা দেশটাকে। হাই-সোসাইটি ক্রাইম, হাই-টেকনিক ক্রাইম এখন নাকের ওপর দিয়ে ঘটে চলেছে...পালের গোদারা এমনই স্বর্ণ সিংহাসনে বসে ক্রাইম-কালচার চালিয়ে যাচ্ছে যে আরক্ষাবাহিনী নিরুপায় হতে বাধ্য হচ্ছে। সরষের মধ্যে ভূত যদি থাকে, তাহলে ভূত তাড়ানোর ওঝা কেরামতি দেখাতে পারে কি?

এই যে বাক্যমালা বিস্তার করে গেলাম, তা অকারণে নয় নিশ্চয়, সুধী পাঠক তা অবশ্যই বুঝেছেন। রণে আর প্রেমে কোনও নীতি রাখতে নেই, এই উপদেশ জানেন সব সুধীজন। স্বয়ং হিটলার পঞ্চম বাহিনী প্রথা চালু করে তদীয় শত্রুদের চুল খাড়া করে ছেড়েছিল। যুদ্ধে দরকার হত সেকালে চতুরঙ্গ বাহিনী—হাতি, ঘোড়া, রথ, পদাতিক। সেটা তো সম্মুখ যুদ্ধের জন্যে। পঞ্চম বাহিনীর মতলবটা খাসা-ছদ্মবেশী গুপ্তচর থাকুক শত্রুপুরীতে, এনে দিক টাটকা তাজা গুপ্ত খবর...তছনছ করে দেওয়া যাক শত্রু ঘাঁটি ভেতর থেকে।

গোয়েন্দা কাহিনির পোকা যাঁরা, তাঁরা অবশ্যই শার্লক হোমস কাহিনি-নিচয় কণ্ঠস্থ করে ফেলেছেন। তাঁদের অজানা নয় গোয়েন্দাগুরু হোমস-এর বিশেষ একটা টেকনিক। সংবাদ সংগ্রহের জন্যে শার্লক হোমস কাজে লাগাত তার 'বেকার স্ট্রিট ইরেগুলার'দের। যারা নাকি ছন্নছাড়া, অলিগলিতে যাদের নিবাস, পাড়ার গেজেট! হোমস এদের দিয়ে খবর সংগ্রহ করত। তারপর অ্যাকশন নিত।

থানায় থানায় এ-রকম ইনফর্মারদের হাতে রাখা হয়। সব থানাদারই এইভাবে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করেন, নইলে যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখাই কঠিন হবে। গুপ্তচরদের রকমফের আছে। পঞ্চম বাহিনী এদের মধ্যে প্রকৃষ্টতম।

ইন্দ্রনাথ এই পন্থায় গড়ে তুলেছিল নিজস্ব পঞ্চম বাহিনী। তারা পয়সা নিত না, কাজ করে যেত ভালোবেসে, শান্তি বজায় রাখার মানসিকতা নিয়ে। দেশ যেন উচ্ছন্নে না যায়, মানুষ যাতে নিশ্চিন্তে সংসার করে যেতে পারে।

কলকাতার প্রায় আটচল্লিশটা থানা এলাকায় ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা এহেন পঞ্চম বাহিনীর সঙ্গে ইন্দ্রনাথ যোগাযোগ রেখে দিয়েছিল অধুনা পকেট-ফোন মোবাইলের কৃপায়।

বৈষ্ণব বসুকে চৌকাঠ পার করে দিয়েই লাইটনিং স্পিডে ইন্দ্রনাথ মোবাইল সংযোগ ঘটিয়ে গিয়েছিল ওর পঞ্চম বাহিনীর সঙ্গে।

আসলি খবরটা দিয়েছিল যে, তার নাম চ্যালারাম চ্যাংচুই। চিনেপাড়ার মস্তান। বউবাজারের চিনেপট্টির।

বচন বিনিময়টা হয়েছিল এইরকম :

'চ্যাংচুই, তোর ওখানে কোনও গয়ারাম গঙ্গারাম বিয়ের ফিকিরবাজি করছে কি? বিয়ে করেই মালদার বউ মেরে অথবা বিয়ের আগেই ভাবী বউকে সাবাড় করে দিয়ে মেয়েটার সম্পত্তি হাতানোর ফিকিরে আছে কি?'

'আছে, বস।'

'পয়মালটার নাম কী?'
'ভৃগু।'
'ভৃগু? মানে কী জানিস?'
'আজ্ঞে, না।'
'পাহাড়ের উঁচু জায়গা।'
'তাই তো উঁচু জায়গার দিকেই টোপ ফেলেছে।'
'কী রকম?'
'মালদার মেয়ে পাকড়েছে। রকল্যাঙ্গুয়েজে প্ল্যানটা ফাঁস করেও দিয়েছে।'
'কোথাকার মাল?'
'পাহাড়তলির।'
'সেটা আবার কী?'
'বউবাজারের সোনাপটি-র মান্ধাতার আমলের একটা বাড়ি।'
'মেয়েটা থাকে সেই বাড়িতে?'
'ইয়েস, স্যার!'
'একা?'
'দোতলায় একা, তিনতলায় দাদা।'
'ফিনিশ করবার প্ল্যান কিছু ফাঁস করেছে?'
'একটু আভাস দিয়েছে।'
'কী আভাস?'
'আকাশের বাজ নেমে এসে খতম করবে ডার্লিং-কে।'
'বটে, বটে, বটে।'
এরপরেই ইন্দ্রনাথকে দেখা গেল আবহাওয়া অফিসে। কর্তাব্যক্তির সঙ্গে বাক্যালাপ হল এইরকম :
ইন্দ্রনাথ—'এটা তো শ্রাবণ মাস?'
আবহাওয়া বিশারদ—'বটেই তো।'
ইন্দ্রনাথ—'টাইফুন-হারিকেন-টর্নেডো জাতীয় উপকূল উচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা আছে কি?'
আবহাওয়া বিশারদ—'তা আছে।'
ইন্দ্রনাথ—'বজ্রপাত ঘটতে পারে?'
আবহাওয়া বিশারদ—'ষোলো আনা সম্ভাবনা আছে।'
ইন্দ্রনাথ—'কবে? কখন?'
আবহাওয়া বিশারদ—'আজ, রাতে।'
পরবর্তী দৃশ্য ইন্দ্রনাথের আড্ডাঘরে। সেখানে আছি আমি, ইন্দ্রনাথ আর বৈষ্ণব বসু।
ইন্দ্রনাথ কাটছাঁট গলায় বললে—'আপনার বোনের নাগর সি-তামেচো-বায়রা-কন্টি-ভাণ্ডা বিদ্যায় চৌকস।'
'মা...মানে?' বৈষ্ণব বসু হতচকিত।
'ছোরা চালানোর বিদ্যে। ডেঞ্জারাস মাল...আপনার এই ভাবী ভগ্নীপতি।'
চোয়াল ঝুলে পড়ল বৈষ্ণব বসুর—'আ...আমি তো ও বিদ্যেটা জানি না। মাদল বাজাতে পারি...ব্রতচারী করতে গিয়ে শিখেছিলাম।'
বিরক্ত স্বরে ইন্দ্রনাথ বললে, 'তাই বাজাবেন আপনার সহোদরা বজ্রপাতে অক্কা পাওয়ার পর।'
'অ্যাঁ...অ্যাঁ...?'
'খাবি খেলে কি চলে? আকাশের অশনি নেমে এসে জানে মেরে যাবে আপনার বোনকে...আজ রাতে।'
'আজ রাতে? বজ্র এত নৃশংস হবে কেন শুধু আমার ওপর?'
'তার মাথায় গোবর আছে বলে। স্টুপিড মেয়েছেলে। প্রেমের প বোঝে না, চুনোপুঁটি হয়ে খেলতে গেছে তিমি-হাঙরের সঙ্গে।'
'বাঁচান ইন্দ্রনাথবাবু, বোনকে বাঁচান!'
'সেই উদ্দেশ্যেই আপনাকে তলব করেছি।'
'বলুন কী করতে হবে?'
'আপনার ভাবী ভগ্নীপতি নিশ্চয় মোবাইলে প্রেমালাপ চালায়?'
'যুগধর্ম।'
'দূর মশায়! ধর্ম নিয়ে কপচাবেন না। বোনকে বলে দেবেন আজ রাতে যেন মোবাইল কল পেয়ে বিরহিণী রাধার মতন জানলার সামনে গিয়ে গ্রিল ধরে না দাঁড়ায়।'
'কে...কেন, ইন্দ্রনাথবাবু স্যার?'
'শুধু বাবু বলুন। দুটো বিশেষণ মানে একটা গালাগাল।'
'ইয়ে...ইয়ে...ইয়ে।'
'যান। যা বললাম, তাই করুন। আজ রাত...কাল রাত...আপনার বোনের কাছে।'
সেই রাতে সত্যিই প্রভঞ্জনের রুদ্র নৃত্য দেখা গিয়েছিল গোটা কলকাতা জুড়ে। গাছ-টাছও উপড়ে পড়েছিল।
বউবাজারের 'পাহাড়তলি' বাড়ির দোতলায় এক প্রেম-পাগলি মোবাইলে প্রেমাস্পদের আকুল বার্তা পেয়েছিল—'ডার্লিং... ডার্লিং...এখুনি এসো জানলায়...বিষম বিপদে পড়েছি।'
কিন্তু তার দাদা তাকে যেতে দেয়নি জানলার কাছে। দাদা হয়েও সে সহোদরার পা দুটো খামচে ধরে সটান শুয়ে পড়েছিল মেঝেতে।
বজ্রপাত ঘটেছিল মুহুর্মুহু। আবহাওয়া বিশারদরা যা বলেন, ঠিক তার উলটোটা হয়, এই ধারণা নস্যাৎ করে দিয়েছিল সেই রজনীর বজ্র-বিদ্যুৎ-প্রভঞ্জনের লম্ফঝম্প। কাতারে কাতারে পাদপ হয়েছিল ছিন্নমূল।
নিশুতি রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর একটা নাটক! জবরদস্ত কাণ্ড। আক্কেল গুড়ুম করা ব্যাপার।
পাহাড়তলি বাড়িটার সামনের ট্রাম লাইনের তার থেকে একটা বিদ্যুৎবাহী তার দেখা গিয়েছিল পাহাড়তলি বাড়িটার দোতলার জানলার গ্রিল পর্যন্ত। তারের এক প্রান্ত আঁকশি দিয়ে আটকানো ছিল ট্রাম-তারে, আর এক প্রান্ত অনুরূপ পন্থায় আঁকশি দিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল জানলার লোহার গ্রিলে।
বেলেঘাটার বৈঠকখানার ইন্দ্র বললে বৈষ্ণব বসুকে—'সিম্পল কেস। কিন্তু গ্রেট ব্রেন বটে হারামজাদার...কী যেন নাম?..সে হাতাতে চেয়েছিল আপনার সহোদরার সম্পত্তি সহোদরাকে পরলোকে প্যাকেট করে দিয়ে?'
কথা বলতে পারল না বৈষ্ণব বসু। তার চোয়াল ঝুলে পড়েছে। চোখ দুটো প্রকৃতই ছানাবড়া সাইজে এসে দাঁড়িয়েছে।
এহেন মুখচ্ছবি অবলোকন করে সকৌতুকে বললে রসিক ইন্দ্র—'প্লেন অ্যান্ড সিম্পল মার্ডার প্ল্যান। লগি-র মাথায় আঁকশি দিয়ে ট্রামলাইনের হাই ভোল্টেজ কারেন্ট টেনে এনে ফেলা হয়েছিল জানলার লোহার গ্রিলে। বজ্রপাতের সময়ে এসেছিল মোবাইল কল। বিরহিণী রাধা-র মতন ছুটে গিয়ে জানলার গ্রিল ধরলেই পরলোকে প্রস্থান করত আপনার প্রেম-পাগলি ভগ্নী। আঁকশি সরিয়ে নেওয়া হত লগা দিয়ে। ভগ্নীর মৃত্যু ঘটেছে বজ্রপাতে, এই সিদ্ধান্তে আসত পুলিশ, ময়না তদন্তের পর।'
বৈষ্ণব বসু-র বিস্ফারিত চক্ষু যুগলের দিকে দৃষ্টিশর নিক্ষিপ্ত রেখেই অশনি-কণ্ঠে বলেছিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র—'এক ঢিলে দু'পাখি মেরে দিলাম। সহোদরার প্রেম-জ্বর ছেড়ে গেল, সম্পত্তি-ও বেহাত হল না। এখন আসুন। আমি গান শুনব।'
বলে, দু'কানে হেডফোন লাগাল বন্ধুবর।

*শিল্পী : সঞ্জয় সামন্ত*

# নকল নবাব

## অদ্রীশ বর্ধন

### সোনার দেশে

প্রায় এক মাইল খাড়াই পাথুরে দেওয়ালের মাথায় একটা চাতাল। কারনিসের মত ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে যেদিকে সেই দিকেই রয়েছে মৃত্যু-উপত্যকা। ক্যালিফোর্নিয়ার ভয়ংকর ডেথ-ভ্যালী – সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যে মরুভূমি রয়েছে ২৮২ ফুট নিচুতে।

লম্বায় পনেরো ফুট আর চওড়ায় প্রায় দশ ফুট চাতালটা যেন ঝুলছে শূন্যে। সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালায় এরকম খাড়াই উঁচু পাথুরে পাঁচিল আরও আছে – কিন্তু এত উঁচু আর এমন অদ্ভুত গড়নের প্রস্তর-প্রাচীর বোধহয় আর দুটি নেই।

প্রাচীরই বটে। সামনে ডেথ-ভ্যালী। পেছনে সিয়েরা নেভাদা। একচল্লিশটা পর্বতশিখরের সবগুলো অবশ্য দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, কিন্তু এই যে এক মাইল উঁচু প্রকৃতির হাতে গড়া পাঁচিল, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট হুইটনীকে। ১৪,৫৯৫ ফুট উঁচু নগাধিরাজের মাথায় জমে রয়েছে তুষার। বরফের মুকুটই বটে। সূর্যরশ্মি ঠিকরে যাচ্ছে সাত সাততে উনপঞ্চাশ রঙের ঢেউ তুলে।

পেছনে পাহাড়ের পর পাহাড়, সামনে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। বহু পর্যটকের মৃত্যুফাঁদ রচিত হয়েছে যে কালান্তক কান্তারে – সেই ডেথ-ভ্যালী।

নির্নিমেষে এই মৃত্যু উপত্যকার দিকে চেয়ে পাথুরে চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটি পুরুষমূর্তি। লম্বায় ছফুটের কাছাকাছি। ফরসা মুখ রোদে জ্বলে গেছে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লম্বা চুল লুটোচ্ছে ঘাড়ের ওপর। পরনে ব্লু জিনস আর ব্লু হাফশার্ট। দুটোই মলিন এবং শতচ্ছিন্ন।

মাথার ওপর গনগনে সূর্য। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই দীর্ঘদেহী পুরুষের। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে তন্নতন্ন করে দেখছে মরুকান্তার। কিন্তু মরণের হাহাকার যেখানকার আকাশে বাতাসে এবং প্রতিটি বালুকণায় – সেখানে জীবন্ত প্রাণী কোথায়? কাঁটামনসা আর দানবিক ক্যাকটাস ছাড়া কিছুই তো চোখে পড়ছে না।

বুকের ওপর ঝুলছিল দূরবীন। তুলে নিয়ে চোখে লাগাল দীর্ঘদেহী পুরুষ। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল মৃত্যু-উপত্যকার দূর হতে দূরের দৃশ্য, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের দৃশ্য।

না। কেউ নেই। ফেউয়ের মত পেছনে লেগে থাকা ডিটেকটিভটা নিশ্চয়ই চোরাবালিতেই তলিয়ে গেছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দীর্ঘদেহী পুরুষ। দূরবীন নামিয়ে পা বাড়াল গুহাটার দিকে। সংকীর্ণ এই গুহাপথের গোলকধাঁধা পেরিয়েই এত উঁচুতে উঠেছিল রোদেপোড়া ছন্নছাড়া এই পুরুষ। নেমে যাবে গুহার মধ্য দিয়েই। কিন্তু তা হল না।

গুহার মুখে অকস্মাৎ আবির্ভূত হল আর একজন। হাতে রিভলবার। চোখে হিমশীতল চাহনি। দাড়িগোঁফ কামানো পরিষ্কার গালের নিচে ইস্পাতকঠিন চোয়ালে প্রকটিত অন্তরের রুদ্ররূপ।

লম্বায় প্রায় ছ ফুট।

এবং দেখতে অবিকল প্রথম পুরুষটির মতই। যেন যমজ ভাই।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে প্রথম জন। আতংকবিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে রিভলবারধারীর দিকে। সেকেন্ড কয়েক অসহ্য নীরবতা। হাওয়ার গোঙানি শোনা যাচ্ছে ডেথ-ভ্যালীর দিকে, পেছনকার সিয়েরা নেভাদার পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে যেন বুক চাপড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে মাতাল হাওয়া।

লম্বা চুল উড়ে এসে পড়েছে প্রথম জনের চোখের ওপর। কিন্তু হাত তুলে চোখের ওপর থেকে চুল সরানোর সাহস নেই। রিভলবারের ট্রিগারে তর্জনী চেপে বসে রয়েছে দ্বিতীয় জনের – নলটা উদ্যত নির্ভুল লক্ষ্যে তারই হৃৎপিণ্ডের দিকে।

ঘেমে ওঠে প্রথমজন।

তারপর বলে স্খলিত স্বরে – "আ-আপনি?"

ভুরু কুঁচকে যায় দ্বিতীয়জনের। সংকুচিত হয় চক্ষুতারকা। চোখের মণি তো নয়, যেন তীক্ষ্ণাগ্র ছুঁচের ডগা।

বলে চিবিয়ে চিবিয়ে – "ইন্ডিয়ান ? বেংগলী ?"

"ও ইয়েস। কিন্তু আপনি –"

এবার চোস্ত উর্দুতে বলে দ্বিতীয়জন – "আমার নাম নবাব আমিনুল্লা।"

হকচকিয়ে যায় প্রথমজন। বিস্ময় নিবিড়তর হয় দুই চোখে। বলে আমতা আমতা করে "আ-আমিনুল্লা! নবাব আমিনুল্লা! তার মানে ?"

বলে কিন্তু পরিষ্কার উর্দুতেই। এতটুকু ভুল নেই উচ্চারণে।

এবার অবাক হয় দ্বিতীয়জন "উর্দুটা ভালই জানেন দেখছি!" প্রশ্নটা কিন্তু পরিষ্কার বাংলায়।

"লাহোরেই যে ছেলেবেলা কেটেছে আমার।"

"কিন্তু আপনি বাঙালি ?"

"নিশ্চয়।"

"এখানে কেন ?"

"ন্যাকামি ছাড়ুন," শ্লিষ্ট হাসল প্রথমজন – "অভিনয় করে ভবশংকরের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।"

"কে ভবশংকর ?"

"নামটা প্রথম শুনলেন মনে হচ্ছে

"শুধু শুনলাম নয়, অবিকল আমার মতই আর একজন মানুষ এই পৃথিবীতে যে আছে, তা এই প্রথম জানলাম। বাংলাটা ভালই জানি, কেননা ছেলেবেলা কেটেছে কলকাতায়।"

নবাব আমিনুল্লা! বিড়বিড় করে আপন মনে বলে ভবশংকর – এও কি সম্ভব একই চেহারা, একই হাইট, গলার স্বর পর্যন্ত একই রকম –

রিভলবার নামায় নবাব আমিনুল্লা। সন্দিগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ভবশংকরের দিকে। যেন আয়নার প্রতিবিম্ব। ভবশংকর ক্লেদাক্ত। আমিনুল্লা ফিটফাট। চুল পর্যন্ত পরিষ্কার আঁচড়ানো। হাফহাতা শার্টের তলায় ফুলে ফুলে উঠছে পুষ্ট পেশী।

ভবশংকরের বাইসেপসও একইরকম পুষ্ট। যেন একই ছাঁচে গড়া দুটি মূর্তি।

"পুরো নাম কি আপনার ?" বললে অমিনুল্লা।

"ভবশংকর মল্লিক।"

"বাড়ি কোথায়

"হটুমন্দিরে।"

"শাট আপ।"

"চোখ রাঙাবেন না, নবাব সাহেব। আমার ধমনীতেও রাজরক্ত আছে।"

"বটে! কোন মুলুকের ?"

"মেঘালয় মুলুকের।"

"খাসি জয়ন্তিয়া পাহাড় এলাকায় ?"

"না,গারো পাহাড় এলাকায়।"

"রাজত্ব এখন নেই মনে হচ্ছে ?"

"তা অবশ্য নেই। আসাম পুনর্বিন্যাস অ্যাক্ট আমার সর্বনাশ করেছে।"

"তাই বুঝি ভাগ্য ফেরাতে এসেছেন সোনার দেশে ?"

ভবশংকর মল্লিক তক্ষুনি কোনো জবাব দিল না। ডুপ্লিকেট মূর্তির দিকে চেয়ে রইল চোখের পাতা না ফেলে।

তারপর বললে আস্তে আস্তে – "সোনার দেশ! এ প্রশ্ন কেন ?"

"কারণ, কিংবদন্তীর এলডোরাডো তো এই ক্যালিফোর্নিয়া। আমেরিকার গোল্ডেন স্টেট। সোনার সন্ধানে যুগ যুগ ধরে কত জন এসেছে এই সিয়েরা নেভাদায় সোনার খনির সন্ধানে, কতজনের হাড় পড়ে রয়েছে ঐ ডেথ-ভ্যালীর বালির মধ্যে। আপনিই বা আসবেন না কেন ?" বিদ্রুপ ঝরে পড়ে নবাব আমিনুল্লার কণ্ঠে।

"রাজা ভবশংকর মল্লিক এখন নিঃস্ব হতে পারে, কিন্তু সোনার লোভে সে ইন্ডিয়া ছেড়ে আমেরিকায় আসেনি।"

"রাজা খেতাব আছে এখনো ?"

"সরকার না মানলেও দেশের লোক এখনো রাজাই বলে।"

"যেমন আমাকে বলে নবাব আমিনুল্লা – নবাবী যদিও আর নেই।"

কৌতূহলী হল রাজা ভবশংকর মল্লিক – "দুজনের ভাগ্যেই অদৃষ্ট একই অট্টহাসি হেসেছে মনে হচ্ছে।"

"কিছুটা তাই। কিন্তু এখনো আপনি বলেননি কেন এসেছেন এই দুর্গম পাহাড়পুরীতে।"

"নবাব আমিনুল্লা, প্রশ্নটা আমিও তো করতে পারি।"

নীরবে চেয়ে রইল নবাব আমিনুল্লা। এই প্রথম বেদনা কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল তীব্র দুই চোখের তারায়। চোখ ঘুরিয়ে নিল সিয়েরা নেভাদার ভয়ংকর পর্বতমালার দিকে।

চেয়ে আছে ভবশংকরও। দুই চোখে অপরিসীম বিস্ময়। কৌতূহল। উৎকণ্ঠা।

বললে মৃদুস্বরে – "আপনার দেশ ?"

"হিমালয়ের ধারে কাছে।"

উদাস স্বর নবাব আমিনুল্লার।

"হিমালয়টা অনেক বড়, নবাব আমিনুল্লা। ঠিক কোনখানে ?"

"যেখানে যুগ যুগ ধরে শক, হুন, কুষাণ, গ্রীক, মোগল, ইংরেজরা রক্তের বন্যা বইয়েছে, তৈমুর লঙ যে-দেশকে বিধ্বস্ত করে ভারত অভিযানে অগ্রসর হয়েছে – এখন যে দেশে সোভিয়েত বাহিনী রাজনীতির খেলা দেখাচ্ছে – সেই দেশে," যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে ভাবের ঘোরে বলে যায় নবাব আমিনুল্লা। বুঝেছি।

"তৈমুর আমার পূর্বপুরুষ।"

অবাক দৃষ্টি ভবশংকরের দুই চোখে। তৈমুরের বংশধর দাঁড়িয়ে তার সামনে! ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা নেভাদা পার্বত্য অঞ্চলে!

সবচেয়ে বিস্ময়কর, তৈমুরের এই উত্তরপুরুষকে দেখতে অবিকল তারই মত। যেন একই ভ্রূণ দুভাগ হয়ে জন্ম দিয়েছে একই রকম দুটি পুরুষের। একজনের জন্ম হিমালয়ের পশ্চিম প্রান্তে, আর একজনের পূর্ব প্রান্তে। কিন্তু নিয়তি দুজনকে সামনাসামনি এনে ফেলেছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে আর এক পাহাড়ি অঞ্চলে। কেন ? কেন ? কি আছে ভাগ্য লিখনে ?

বিমূঢ় ভবশংকরের দিকে ফিরে তাকায় নবাব আমিনুল্লা। খানদানি অবয়বে আবার জাগ্রত হয়েছে প্রখর ব্যক্তিত্ব – যা ছিল তৈমুরের। যা আছে ভবশংকরের নিজেরও। বিজ্ঞান যাকে বলে কোষমধ্যস্থ জিনের কারসাজি – হয়ত সেই কারণেই দুজনের চেহারায় দেখা যাচ্ছে বিচিত্র এই সাদৃশ্য – সুদূর অতীতে দুজনেরই পূর্বপুরুষ ছিল হয়ত একই পুরুষ। বহু পুরুষ পরে, বহু প্রজন্ম পেরিয়ে এসে একই জিন এফেক্ট ফুটে উঠেছে হিমালয়ের দুই প্রান্তের দুটি মানুষের অবয়বে।

ঈষৎ কোমল হল আমিনুল্লার চাহনি। হাওয়া আবার গুঙিয়ে উঠছে। বুক চাপড়ানোর মত শব্দে ছুটে যাচ্ছে পাহাড়ের দিক থেকে এসে মরুভূমির দিকে।

বললে নরম গলায় – "রাজা ভবশংকর, ভাগ্য যখন এনে ফেলেছে দুজনকে এই দুর্গম এলাকায়, তখন তার উদ্দেশ্যও নিশ্চয় একটা আছে।"

"মনে তো হয়।" যেন আপন মনেই বলে ভবশংকর।

"রহস্য একটা আছে আপনার অতীত জীবনে, তাই না ?"

"আছে।"

"আছে আমার জীবনেও", একটু বিরতি দিল আমিনুল্লা –"চলুন, শোনা যাক দুজনের অতীত কাহিনী।"

"কোথায় ?"

"এই পাহাড়ের নিচে – আমার ক্যাম্পে।"

"ক্যাম্পে ?"

"অবাক হলেন দেখছি ?"

"কতদিন আছেন এখানে ?"

"বছর দুয়েক।"

"একা ?"

"না। ডাক্তার আছে একজন, আর আছে বাবুর্চি। আপনার সংগে কে আছে ?"

ম্লান হাসল ভবশংকর – "কেউ না।"

"একা ?"

"এক্কেবারে।"

চলুন। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিন। আমার অতিথি আপনি আজ থেকে। রাত্রে শুনব আপনার কাহিনী। শোনাবো আমার কাহিনী।

"চলুন।"

সিয়েরা নেভাদার এ অঞ্চলে পাহাড় ন্যাড়া নয়, নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা। পাহাড়ের গা বেয়ে ছোটখাট অনেক ঝরনাধারা। বড় বড় বোল্ডারের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে চঞ্চলা মেয়ের মতই ছুটে গিয়েছে ঝোপঝাড় গাছপালার মধ্য দিয়ে।

এক মাইল উঁচু পর্বত প্রাচীরের তলার গুহাপথ দিয়ে বেরিয়ে এল দুই মূর্তি। মাথার ওপর ডাল আর পাতার ঘন চাঁদোয়া – সূর্যের আলো টুকরো টুকরো হয়ে এসে পড়ছে মাটিতে। ঘন বনে পথ চেনা মুশকিল। কিন্তু আমিনুল্লা চলেছে অনায়াসে। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি ঝোপ, প্রতিটি পাথরখণ্ড যেন তার চেনা।

একটু পরেই দেখা গেল ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনী। উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে নৃত্যপর ঝরনা। পাশেই সুদৃশ্য একটা তাঁবু। তারপাশেই একটা গুহা। আমিনুল্লা বললে – "ঐ আমার ক্যাম্প। ঝড়জলে ঠাঁই নিই গুহার মধ্যে।"

"কিন্তু দীর্ঘ দুবছর ধরে এই নির্জন অঞ্চলে –'

রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে আমিনুল্লার অধরপ্রান্তে –"সেই কথা বলব বলেই তো নিয়ে এলাম আপনাকে।"

কথাবার্তার আওয়াজ শুনে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল দুটি পুরুষ। একজন যেন তালপাতার সেপাই – পরনে পায়জামা, পাঞ্জাবী। হাতে একটা বালতি।

আর একজন খর্বকায়। বলিষ্ঠ। নাকমুখ ভোঁতা। চাহনি বেশ তীক্ষ্ম। ললাট বুদ্ধিদীপ্ত। নাকমুখ দেখে নির্বোধ মনে হলেও চোখ আর কপাল দেখে সে ভুল ভেঙে যায়।

দুজনেই অবাক চোখে তাকায় আগুয়ান) দুই মূর্তির দিকে। একই রকম দুটি মূর্তি তালে তালে পা ফেলে পাশাপাশি এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

"বিসমিল্লা!" জড়িতস্বরে বললে হাতে বালতি যার, সে।

"ইয়া আল্লা!" প্রতিধ্বনি জাগে খর্বকায় ব্যক্তির কণ্ঠে।

হেসে ফেলল আমিনুল্লা – "তারিক আলি।"

গোল গোল চোখে এগিয়ে এল লম্বা লোকটা। সিঙিমাছের মত লিকলিকে চেহারা – সরু সরু গোঁফজোড়াও সিঙি মাছের গোঁফের মতই। মুখটা লম্বাটে। ছুঁচোলো দাড়ি। বয়স তিরিশের বেশি নয়।

ভবশংকরকে বললে আমিনুল্লা - 'আমার জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ যে করে – তারিক আলি। আর উনি আমার ডাক্তার কাম বডিগার্ড – ডক্টর ইরানী।"

এগিয়ে এল ডক্টর ইরানী। পর্যায়ক্রমে চাইছে ভবশংকর আর আমিনুল্লার মুখের দিকে। "ডক্টর," হাসিমুখে বললে আমিনুল্লা – "আমার মেহমান ইনি – রাজা ভবশংকর মল্লিক।"

"হ্যাঁ। আমার মতই দেশ ছেড়ে বেরিয়েছেন – একা।"

"কিন্তু –"

"একই রকম দেখতে কেন? এইতো? আল্লা গড়েছেন দুজনকে একই রকম করে – এনেও ফেলেছেন একই জায়গায়। আজ থেকে তাই আমরা দোস্ত।"

সন্দিগ্ধ চোখে ভবশংকরের দিকে চেয়ে ডক্টর ইরানী শুধু বললে – "আসুন।"

রাত নেমেছে জঙ্গলে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নিশাচর পাখির ডাক। এ ছাড়া নিস্তব্ধ চারিদিক।

ক্যাম্পের মধ্যে জ্বলছে একটা লণ্ঠন। দুপাশে ক্যাম্পখাটে বসে দুজন। আমিনুল্লা আর ভবশংকর। মাঝে নিচু চৌকির ওপর হুইস্কির বোতল আর গেলাস।

এইমাত্র শেষ হয়েছে দুজনের অন্তর বিনিময়। প্রাণ খুলে দুজনে বলেছে দুজনের অতীত কাহিনী। দুজনেরই অতীতে রয়েছে দুটি ক্ষত। বেদনার্ত দুটি মন তাই মিলেমিশে এক হয়ে গেছে হুইস্কির নেশায়।

নিশ্চুপ দুজনে। চাহনি নিবদ্ধ হাতের গেলাসের দিকে।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল আমিনুল্লা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে – "এবার ঘুমোনো যাক।"

হাতের গেলাস খালি করে দিয়ে ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়ল ভবশংকর। কোনো কথা বলল না। শুয়ে পড়ল আমিনুল্লাও।

ঘণ্টাখানেক পরে উঠে বসল আমিনুল্লা। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় দেখা যাচ্ছে ভবশংকরকে। ঘুমোচ্ছে অকাতরে।

নিঃশব্দে ক্যাম্পখাট থেকে নামল আমিনুল্লা। পা টিপে টিপে এল বাইরে। বাইরে দাঁড়িয়ে ডক্টর ইরানী। হাতে টর্চ।

বললে চাপা গলায় – "সব শুনলেন?"

"হ্যাঁ। টর্চটা দিন।"

"কোথায় যাবেন?"

"ট্রান্সমিটার সেণ্টারে।"

"টর্চের আলো মিলিয়ে গেল বনের অন্ধকারে। ফিরে এল ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। ডক্টর ইরানী তখনও দাঁড়িয়ে অন্ধকারে খর্বকায় প্রেতের মত।

কাছে এল আমিনুল্লা। চাপাগলায় বলে গেল কি করতে হবে। নীরবে শুনল ডক্টর ইরানী। কথা শেষ হলে শুধু বললে – "তাহলে ভোর চারটের সময়ে?"

"হ্যাঁ। ওকে নিয়ে যাবো আমি একা – আপনি এখানে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখবেন। ফিরেই বেরিয়ে পড়ব।" রহস্যময় হাসি হেসে তাঁবুর ভেতরে উধাও হল জীবন্ত প্রহেলিকা –নবাব আমিনুল্লা।

## কলকাতার মুচিপাড়ায়

গোলাপ শাস্ত্রী লেনের গা থেকে যে সরু গলিটা বেরিয়েছে, তার ঠিক মাঝখানে দোতলা বাড়ির একতলায় ঘটছে এই কাহিনীর পরবর্তী দৃশ্য।

বাড়িটা সেকেলে ধরনের। মধ্য কলকাতার অধিকাংশ বাড়িই প্রায় একই ধাঁচে তৈরি। ধনুকের মত রঙিন কাচের স্কাইলাইট – আধুনিক স্কাইলাইটের মত ফিকস্‌ড নয়। দিনের আলো অনেক রঙ নিয়ে ঢোকে ঘরের মধ্যে। জানলাগুলোর পাখী তুলে দিয়ে আলোবাতাস খেলানো যায়।

একতলার একটি ঘরে মক্কেল পরিবৃত হয়ে বসে ধুরন্ধর অ্যাডভোকেট নকুল সাহা। বয়স সত্তরের কাছে। হার্টের অবস্থা শোচনীয়। গণ্ডা গণ্ডা ওষুধ খেয়ে প্রাণটাকে টিকিয়ে রেখেছেন ধড়ের মধ্যে। পয়সার কোনো অভাব নেই। সিটি সিভিল কোর্টে বারক্রমে নিজের টেবিলটি এখনো রেখে দিয়েছেন – কিন্তু প্র্যাকটিস করেন না। এখন তাঁর লাখ লাখ টাকা রোজগার বাড়ি কেনাবেচায় – ডীডস আর কনভেয়ান্স তৈরি করায়। বলাবাহুল্য, সবটাই নগদে কারবার – ইনকাম ট্যাক্সকে হিসেব দিতে হয় না। মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও সকাল সন্ধে একবার একতলার ঘরে নামেন। ছোট্ট ঘরটায় খালি গায়ে বসে লাখ লাখ টাকা কামান। মাঝে মাঝে গড়গড়ায় তামাক খান। টাইপিস্ট পাশে বসে টাইপ করে। দুজন জুনিয়র উকিল হুকুম মত ছুটোছুটি করে। মুহুরিরা দরজার কাছে ভিড় করে থাকে।

সকাল দশটা নাগাদ একটা ঝকঝকে ইমপোর্টেড গাড়ি এসে দাঁড়াল গলির মুখে। ইঁটে বাঁধাই তস্য সরু গলির মধ্যে গাড়ি ঢোকে না বলে গাড়ির আরোহী হেঁটে এল বাকি পথটুকু। প্রায় ছফুটের মত লম্বা চেহারা। ফর্সা। পরনে বিলিতি কাট-এর স্যুট। দাঁতের ফাঁকে ডানহিল নাম্বার ফোর পাইপ। চেহারা, পোশাক এবং চালচলন দেখেই বোঝা যায়, যেন এইমাত্র এসে নেমেছে ভারতের মাটিতে – পাশ্চাত্যের গন্ধ এখনো মিলোয়নি গা থেকে।

ছোট্ট ঘরটার ছোট্ট দরজা দিয়ে মাথা হেঁট করে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল আগন্তুক। অদৃশ্য রশ্মিরেখায় বিচ্ছুরিত প্রখর ব্যক্তিত্ব মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ করে দিল ঘরের মৌচাক গুঞ্জন। সোফা এবং চেয়ারে গায়ে গা

লাগিয়ে বসে থাকা মক্কেলরা হাঁ করে চেয়ে রইল সুদর্শন দীর্ঘদেহী পুরুষটির দিকে।

ঘাড় হেঁট করে পুরুলেন্সের চশমাটা টেবিলে খুলে রেখে ডিড পড়ছিলেন নকুল সাহা। মক্কেল-টক্কেলকে পোকামাকড় জ্ঞান করেন তিনি। ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকলেও তোয়াক্কা করেন না – ফিরেও তাকান না।

হঠাৎ ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় মিনিটখানেক পরে তাঁর হুঁশ ফিরল। পোকামাকড়গুলো গুনগুন করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল কেন জানবার জন্যে মুখ তুললেন।

চোখে চশমা না থাকায় ঝাপসাভাবে দেখতে পেলেন চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একটা দীর্ঘ আকৃতিকে। এ ঘরে নেহাতই বেমানান মূর্তি। তাই ভাল করে দেখবার জন্য চশমাটা তুলে চোখে লাগালেন। লাগিয়ে, সাদা ভুরুদুটো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মত গুটিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। দাঁতের ফাঁকে পাইপ কামড়ে ধরে পর-পর কয়েকটা ধোঁয়ার রিং ছেড়ে মর্মভেদী চোখে চেয়ে রইল আগন্তুক। মুখে কোনো কথা নেই। স্তাবকতা করে না, হেঁ হেঁ করে না। এ আবার কোথাকার মক্কেল!

একটু রুক্ষ কণ্ঠেই তাই শুধোলেন নকুল সাহা – "আপনি?"

পাইপটা দাঁতের ফাঁক থেকে ডান হাতে নিল আগন্তুক। বলল ধীর গম্ভীর স্বরে – "চিনতে পারছেন না?"

এবার একটু খটকায় পড়েন নকুল সাহা। চশমাটা এঁটে বসিয়ে কাষ্ঠ হেসে (যা তাঁর স্বভাব নয়) বলেন "চেনাচেনা মনে হচ্ছে...... কিন্তু –"

"আমি ভবশংকর মল্লিক।"

"ভবশংকর মল্লিক!" সত্তর, ছুঁই ছুঁই বয়েস স্মৃতিশক্তি একটু কমে আসা স্বাভাবিক। তাই কিছুক্ষণ মনের খাতা হাতড়ালেন নকুল সাহা। তারপরেই উজ্জ্বল হল চোখ। শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে (যা তাঁর কোষ্ঠিতে লেখা নেই) – "রাজা ভবশংকর মল্লিক! আপনি!"

"হ্যাঁ, আমি।"

"কি কিন্তু আ-আপনি তো–"

"ছিলাম আমেরিকায়। ফিরেছি কালকে।"

"টা-টাকা পয়সা সব পাচ্ছিলেন তো?"

"সেই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি। এঁদের সংগে আপনার কাজ শেষ হয়েছে?" ডান হাতের পাইপ ঘুরিয়ে বিস্ফারিত চক্ষু মক্কেলদের দেখায় রাজা ভবশংকর মল্লিক।

"কাজ? তা.....ইয়ে.....হবেখন। আপনারা..... আপনারা আজ আসুন। শুক্তো, তুমিও যাও।" শুক্তো নামধারী ছোকরা নকুল সাহার টাইপিস্ট। "নগেন দীপালি, তোমরাও এসো", নগেন আর দীপালি তাঁর দুই জুনিয়র উকিল।

ঘর ফাঁকা হয়ে গেল এক মিনিটের মধ্যে।

"বসুন।"

নকুল সাহা এতক্ষণ দাঁড়িয়েই ছিলেন। টেবিলের সামনের চেয়ারটায় রাজা ভবশংকর মল্লিক বসতে তিনিও বসলেন নিজের চেয়ারে। বসেই বললেন – "কি ব্যাপার বলুন তো? দুম করে চলে এলেন কেন?"

"চিরকাল বাইরে থাকলেই কি আপনি খুশি হতেন?" চিবিয়ে চিবিয়ে ডানহিলকে কামড়ে কামড়ে বললেন ভবশঙ্কর।

"কি যে বলেন। হেঁ হেঁ। ঘর ছেড়ে আপনিই তো চলে গেলেন। এদিকে টাকা পাঠাতে পাঠাতে চোখে সর্ষেফুল দেখছি আমি।"

"কেন? সর্ষেফুল দেখার মত ঘটনা ঘটেছে নাকি?" ভবশঙ্করের তীক্ষ্ণ চাহনি তীক্ষ্ণতর হল প্রশ্নটার সংগে সংগে।

"সে কি কথা! আপনি জানেন না?" যেন আকাশ থেকে পড়লেন নকুল সাহা।

"না তো। জানিয়েছিলেন কি?"

"নগেন.....ঐ রাস্কেল নগেনটাকে সব জানাতে বলেছি কোনকালে – চিঠি দেয়নি?"

"না।"

"ইডিয়ট। ননসেন্স। আমি মলে ভিক্ষে করে খেতে হবে। ইরেসপনসিবল।"

"কার কথা বলছেন?"

"নগেন! নগেন! এতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীন ছোকরা –"

"কি লিখতে বলেছিলেন, আমাকেই বলুন না।"

"ইয়ে.....আপনার পার্ক স্ট্রীটের ম্যানসন, মেঘালয়ের প্যালেস, সিংহগড়ের ফরেস্ট, বাড়ি কাঁকড়াঝোরের বাংলো – সবই তো বাঁধা রাখতে হয়েছে।"

"কেন?"

"ব্যাঙ্কে তো আর টাকা নেই। ওদিকে আপনার খরচ পাঠাতে হচ্ছে। এদিকে প্যালেস বাড়ি আর বাংলো মেনটেন করতে হচ্ছে। চোখে সর্ষেফুল দেখছি কি আর সাধে।"

"মর্টগেজই যদি রেখেছেন তো সর্ষেফুল দেখার কি আছে। টাকা তো রয়েছে।"

"টাকা আছে! বলছেন কি? কত খরচ জানেন মাসে? লক্ষ্মীর ভাঁড়ারও ফুরিয়ে যায় – মর্টগেজের টাকা –"

"কত টাকায় মর্টগেজ রেখেছেন?"

"তিরিশ লাখ।"

"হাতে এখন কত টাকা আছে?"

"সঠিক তো বলতে পারব না। আন্দাজে –"

"আন্দাজেই বলুন।"

"তা প্রায় লাখ দুয়েকের মত তো বটেই।"

"মোটে?"

"আজ্ঞে। দুশ্চিন্তা তো ঐ কারণেই। এ টাকা ফুরোলেই –"

"বাড়িঘরদোর সব বেচতে আরম্ভ করবেন – এই তো?"

"তা ইয়ে......"

"তার আর দরকার হবে না। এস্টেট দেখাশুনো করার পাওয়ার যখন আপনাকেই দিয়ে গেছিলাম – চেকখানাও আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি।"

"কি-কিসের চেক?"

"তিরিশ লক্ষ টাকার", পাইপ কামড়ে ধরেই পকেট থেকে চেকবই আর কলম বার করতে করতে বললে রাজা ভবশংকর মল্লিক।

ধড়াস করে ওঠে নকুল সাহার দুর্বল হৃৎপিন্ড। টেবিলের ওপরে রাখা কৌটো থেকে একটা আইসোড্রিল ট্যাবলেট নিয়ে টপ করে জিভের তলায় রেখে স্ট্রোকটা সামলে নিলেন কোনমতে। ছানাবড়ার মত চোখ করে দেখলেন সটাসট তিরিশ লক্ষ টাকার চেক লিখে সই দিচ্ছে রাজা ভবশংকর মল্লিক। পড়াৎ করে ছিঁড়ে নিয়ে সামনে বাড়িয়ে ধরে বললে রাশভারী গলায় – "নিন। আজ থেকেই মর্টগেজ ছাড়ানোর কাজ আরম্ভ করুন। বাকী টাকা আপনার অ্যাকাউন্টেই রাখুন। পরে হিসেব দেবেন।"

হাঁ করে চেয়ে রইলেন নকুল সাহা। আস্তে আস্তে ডান হাতটা তুলে নগ্ন বুকের নিচে হৃৎপিন্ডটা চেপে ধরার চেষ্টা করলেন।

বললেন প্রায় খাবি খেতে খেতে – "অ্যা......অ্যাতো টাকা......" মৃদু কঠোর হাসি হাসল রাজা ভবশংকর মল্লিক – "আমার টাকা।"

"কি-কিন্তু আ-আপনি তো প-প-প –"

"পথের ফকির ছিলাম আমেরিকায়। কেমন?"

চেয়ে রইলেন নকুল সাহা।

পাইপ নামিয়ে বলল রাজা ভবশংকর – "ছিলাম। এখন নেই। কেন জানেন?"

"কে-কেন?"

"ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসায়ে।"

"ই-ই...."

"আপনাদের জানতে দিইনি এই চমকটা দেব বলেই। আমেরিকার সবচাইতে বড় ইলেকট্রনিক্স কারখানার প্রেসিডেন্ট এখন আমিই। কোন ব্যাঙ্কের চেক দেখেছেন?"

"আমেরিকান এক্সপ্রেস।"

"এখানকার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করেছি সামান্যই টাকা – একশ কোটি।"

"এ-এ-একশ –"

আইসোড্রিলের কৌটোটা বাড়িয়ে ধরল রাজা ভবশংকর মল্লিক। টপ করে আর একটা ট্যাবলেট নিয়েই জিভের তলায় রাখল নকুল সাহা। বুকটা বেজায় ধড়ফড় করছে। বন্ধ হয়ে না যায়।

"ইন্ডিয়ায় এলাম এখানেই ব্রাঞ্চ ফ্যাক্টরি খুলব বলে – সল্ট লেকে।"

"স-সল্ট লেকে!"

"হ্যাঁ। চারশ কোটি টাকার প্রজেক্ট। আমেরিকার প্রবাসী

ইন্ডিয়ানরা দেবে টাকা। ইলেকট্রনিক সিটি গড়ে তুলব।"

"আ আপনি ?"

"কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না ?"

চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে ফের পরলেন নকুল সাহা।

"কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনাকে লাস্ট যা দেখেছিলাম –"

"এখন আর সেরকম দেখছেন না। কেমন ?"

"এক্কেবারে অপোজিট –"

"এগজ্যাক্টলি। ছিলাম মাতাল, কাওয়ার্ড, রাগী –"

"হেঁ হেঁ হেঁ।"

"এখন দেখছেন বোল্ড, কোল্ড, গ্র্যানাইট। রাইট ?"

"তা যা বলেছেন। খুন করার পর যদি পালিয়ে না যেতেন –"

"খুন !" দপ করে চোখ জ্বলে উঠল ভবশঙ্করের –"ঐ ব্যাপারটারই হিল্লে করতে আমি এসেছি। আগে সেইটা। তারপর ইলেকট্রনিক সিটি।"

"হিল্লে। কি হিল্লে করবেন ?"

"সিংহগড়ের বাড়িতে গিয়ে থাকব।"

বিষম আঁৎকে উঠেন নকুল সাহা – "বলছেন কি ? প্লীজ, ও কাজটি করতে যাবেন না।"

কঠোর চোখে তাকিয়ে রইল ভবশঙ্কর মল্লিক –"নকুলবাবু, এই কোল্ড, বোল্ড, গ্র্যানাইট ভবশংকর মল্লিক সিংহগড়ের বাড়িতে ছুরির ভয় আর করে না। আমি রাত কাটাবই।"

"কি-কিন্তু –"

"এই নিন আমার কার্ড। হোটেল হিন্দুস্থান। সুট নাম্বার লেখাই আছে। কালকেই জানাবেন মর্টগেজ ছাড়ানোর কতদূর কি করলেন। তারপর......" বলে থামল রাজা ভবশঙ্কর।

"তারপর ?"

যেন সুদূরের স্বপ্ন ঘনিয়ে উঠল ভবশঙ্করের তীক্ষ্ম চোখের তারায় তারায়।

বললেন মৃদু স্বরে – "যে মেয়েটি প্রতি রাতে ছুরি নিয়ে ঘোরে আমার গলা কাটবে বলে – দেখব সে কিভাবে কাটে আমার গলা !"

## প্রেস ক্লাবে

সন্ধে ঠিক সাতটা নাগাদ ময়দানের প্রেস ক্লাবে দেখা গেল কলকাতার নামী অনামী কাগজের লোকেরাই ভিড় করে বসে আছে। খবরের কাগজের লোকেরা এমনিতেই শিকারী কুকুরের সত্তা নিয়ে জন্মায়। খবরের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক জায়গাটিতে এসে হাজির হয়। আশ্চর্য এই অলৌকিক ক্ষমতা পৃথিবীর সব রিপোর্টারদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। ইদানীং অনুসন্ধানী রিপোর্টাররা তো আরও চৌকস হয়ে উঠেছে। তারা হাঁড়ির খবর যেন খড়ি পেতে জেনে ফেলে। সরকারী গোপন ফাইলের ফটোস্ট্যাট কপি পর্যন্ত ছাপিয়ে কত রথী মহারথীর মুখে যে চুনকালি ফেলছে, তার ইয়ত্তা নেই।

আজকের প্রেস ক্লাবের আমন্ত্রণ পেয়েই তাই সব জরুরী কাজ ফেলে রেখে স্বয়ং চীফ রিপোর্টাররাই দৌড়ে এসেছে। এসেছে সাপ্তাহিক আর মাসিকের খোদ সম্পাদকরা। শহরের গণ্যমান্য কেষ্টবিষ্টু অনেকের কাছেও পৌঁছে গেছে সোনালী কার্ড।

দীর্ঘ প্রবাসবাসের পর রাজা ভবশঙ্কর মল্লিক এসে পৌঁছেছে স্বদেশে। গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রোজেক্টে হাত দিতে চলেছে। বিস্তারিত বলা হবে প্রেস কনফারেন্সে।

রাজা ভবশঙ্কর মল্লিক ! দশ বছর আগে যে লোকটা চোরের মত পালিয়েছিল ইন্ডিয়া ছেড়ে আমেরিকায়, খুনী বলেই যাকে জানে, জানে-যে-জন-সেই-জনেরা, আচম্বিতে তার আবির্ভাব এবং প্রেস কনফারেন্সে আমন্ত্রণ তাই ভাবিয়ে তুলেছে গন্ধ-শুঁকিয়ে রিপোর্টারদের। দারুণ স্টোরি যাবে কালকের কাগজে – স্পেশ রাখতে বলে এসেছে অ্যাসিস্ট্যান্টদের।

কেউ পাইপ খাচ্ছে, কেউ চুরুট টানছে, কেউ এরই মধ্যে বেয়ারা পরিবেশিত হুইস্কি-রাম-ব্র্যান্ডির শ্রাদ্ধ করে চলেছে। ফটোগ্রাফারার কাঁধে ঝোলা আর হাতে গেলাস নিয়ে ঘুরঘুর করছে ঘরময়। সঠিক অ্যাংগেল নির্বাচন করে রাখছে এখন থেকেই।

ঠিক সাতটার সময়ে সরু গলিপথটায় এসে দাঁড়াল বিলিতি গাড়িখানা। সুটেডবুটেড খানদানী চেহারা নিয়ে গটগট করে ফটক পেরিয়ে এসে ডাইনে মোড় নিয়ে প্রেস ক্লাবে ঢুকল রাজা ভবশঙ্কর মল্লিক।

গণতন্ত্রের যুগে রাজা-ফাজা আজকাল আর দেখা যায় না। নেপাল-জাপান-ইংল্যান্ড-থাইল্যান্ড-জরডন-ডেনমার্কে গেলে এখনো অবশ্য দেখা যায় গণতন্ত্রের বিপুল জোয়ারে বিলীন হয়নি রাজতন্ত্র। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সাতমহলা রাজপুরী, সোনার সিংহাসন, সোনার মুকুট না থাকলেও রাজা আর রানীরা এখনও আছে এইসব দেশে।

কিন্তু এইমাত্র যে রাজাটি গটগট করে প্রেসরুমে ঢুকে কোনদিকে না তাকিয়ে সটান গিয়ে বসল টানা লম্বা টেবিলের অপর প্রান্তে ফাঁকা চেয়ারটিতে, তাকে দেখে রাজা-রাজা বলে তো মনে হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, পার্সোনালিটি আছে বটে। যেন একটা স্টীলম্যান – ভেলভেটে মোড়া। মুখে ভেলভেট হাসি। দাঁতের ফাঁকে ডানহিল পাইপ আর তীব্র চাহনি দেখেই শুধু বোঝা যায়, মানুষটা এলেবেলে নয়। প্রশ্ন-টশ্নগুলো একটু বুঝেশুনে করা দরকার।

প্রশ্নের জন্যে অবশ্য অপেক্ষা করল না রাজা ভবশঙ্কর মল্লিক। কবজি ঘুরিয়ে রিস্টওয়াচ দেখে নিয়ে শুরু করে দিলেন নিজেই।

"লেডীজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন, আমার নাম ভবশঙ্কর মল্লিক। লোকে আমাকে এখনো রাজা বলে ডাকে – কিন্তু কাউকে কান মুলে রাজা বলতে আমি শেখাইনি।"

অট্টহাসি। শুরুটা হয়েছে ভাল। সেই ফাঁকে বার কয়েক পাইপ টেনে নিল রাজা ভবশঙ্কর মল্লিক। পটাপট করে শাটার পড়ল সারি সারি ক্যামেরার ফ্লাশের পর ফ্ল্যাশ –

হাসির রোল কমে আসতেই বলল রাজা – "আপনাদের আজ ইনভাইট করেছি একটা ইমপরট্যান্ট খবর দেওয়ার জন্যে। খবরটা দেওয়ার আগে আপনাদের মনের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো গুঁতোগুঁতি করছে, সেগুলোর জবাব আগে থেকেই দিয়ে দিচ্ছি। দশ বছর আগে আমি ইন্ডিয়া ছেড়ে চলে গেছিলাম আমেরিকায়। কি পরিস্থিতিতে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, এখানে তা অবান্তর। গিয়ে কি করেছিলাম, সেই প্রশ্নটাই গজগজ করছে আপনাদের প্রত্যেকের ভেতরে। শুনুন। আমি ব্যবসা করেছিলাম। ইলেকট্রনিক্সের। জায়ান্ট স্কেলে। আমিই এখন সেই ফার্মের প্রেসিডেন্ট।"

"প্রেসিডেন্ট !" অস্ফুট কণ্ঠে বললেন দৈনিক সত্যপ্রিয় পত্রিকার অতিশয় মিথ্যাপ্রিয় চীফ রিপোর্টার। তিনি দেখেছেন রিপোর্টিংগিরি করে নাম করতে গেলে মিথ্যের কদর সবচাইতে বেশি সত্যের চাইতে। তাই অবিশ্বাস্য চোখে চেয়ে রইলেন ভবশঙ্করের দিকে।

ভবশঙ্কর বসেছিল তার ঠিক দু ফুট তফাতে টেবিলের অন্যপ্রান্তে। খরখর চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল পরম মিথ্যাপ্রিয় চীফ রিপোর্টারের দিকে। ঠোঁটের কোণে ভেলভেট হাসিটুকু লেগেই রয়েছে কেমিক্যাল আঠা দিয়ে লাগানোর মত। যে কোনো মুহূর্তে ঐ হাসির জায়গায় যে ইস্পাতের ছুরি ঝলসে উঠতে পারে ঠোঁটের বাঁকা কোণে, তা দেখে , বুঝল এবং শঙ্কিত হল সবাই। বুঝেশুনেই ঠিক করে নিলে, প্রশ্ন-টশ্ন না করে স্রেফ শুনে যাওয়াই চামড়া বাঁচানোর শ্রেষ্ঠ পন্থা।

পাইপ দাঁতের ফাঁকে রেখেই অদ্ভুত কায়দায় কথা বলতেও পারে বটে রাজা ভবশঙ্কর। বললে বেশ শ্লেষ আর কাঁক মিশিয়ে – "মশায়ের বোধহয় বিশ্বাস হল না কথাটা ?"

"ইয়ে মানে", তাড়াতাড়ি সামনে রাখা হুইস্কির গেলাসের দিকে হাত বাড়ালেন মিথ্যাপ্রিয় চীফ রিপোর্টার।

গেলাসটা ঠেলে এগিয়ে দিল রাজা ভবশঙ্কর নিজেই।

বললে – "খান। আর শুনুন। বেশি কথা বলবেন না। সময় খুব কম। আসছি রাইটার্স থেকে, যাব একটা ককটেল পার্টিতে। যা বলব, তা ইচ্ছে হয় ছাপবেন, নইলে ছাপবেন না। রাইটার্সে গিয়েও যাচাই করে নিতে পারেন। এইমাত্র মীট করে এলাম ইনডাসট্রিজ মিনিস্টারের সংগে। সল্ট লেকে ইলেকট্রনিক সিটি গড়ব। জায়গা দেবেন তিনি। ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতেও গিয়ে যাচাই করে নিতে পারেন। তাঁদের অ্যাসিস্ট্যান্সও পাবো ইলেকট্রনিক সিটি গড়তে খরচ হবে কুড়ি কোটি টাকা – টোট্যাল ইনভেস্টমেন্ট চারশ কোটি টাকা। টাকা দেবে আমেরিকায় প্রবাসী ইন্ডিয়ানরা। কেউ না এগিয়ে এলে আমি একাই

এগোব। বারোটা মেজর আর ষাটটা স্মল ইউনিট গড়ব। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আর কালার টিভি তৈরি করব বছরে চল্লিশ হাজার। একান্ন সেন্টিমিটার কালার টেলিভিশনের দাম পড়বে মাত্র ছ হাজার।"

"ছ হা-জা-র!" ঢোক গিললেন মিথ্যাপ্রিয় চীফ রিপোর্টার।

"আজ্ঞে। প্রব্লেমটা পাওয়ার শরটেজ নিয়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার একটা ফার্মের সংগে টেকনিক্যাল কোলাবরেশনে সে সমস্যারও সমাধান করব আমি। ক্যালকাটা উইল বি এ নিউ সিটি উইদিন টু ইয়ার্স। এনি কোশ্চেন?"

আর কোশ্চেন! ঘরশুদ্ধ রিপোর্টার ফ্ল্যাট বক্তার বাচনভংগী দেখে।

শুধু একজন ছাড়া।

পরমা সুন্দরী একটি মহিলা। বয়স তিরিশের এদিকে বা ওদিকে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। টকটকে লাল ঠোঁট। ঝকঝকে হীরের নাক ছাবি। ঝলমলে পাড়ওলা শাড়ি পরে দাঁড়িয়েছিল প্রেসরুমের বাইরে টবের গাছের পাশে – ঝলন্ত আলোর তলায়। নরুনচেরা চোখে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল রাজা ভবশংকরের দিকে।

ভবশংকর তাকে দেখতে পায়নি।

পাইপ কামড়ে ঈগল চাহনি মেলে স্থানুবৎ রিপোর্টারদের ওপর দিয়ে কৃপাদৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে – "দেন, নো কোশ্চেন?"

ঘর নিস্তব্ধ।

চেয়ার ঠেলে পা বাড়াল রাজা ভবশংকর – "আরেকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, সরি।"

গটগট করে বেরিয়ে এল বাইরে।

মুখোমুখি দাঁড়াল রূপকুমারী – জন্ম যেন রূপনগরে।

কামনামদির চোখে তাকিয়ে গ্রীবা বেঁকিয়ে বললে চোস্ত উর্দুতে – "দাঁড়াও।" দাঁড়াল রাজা ভবশংকর। মুখ ভাবলেশহীন – "কিছু বলবেন?" প্রশ্নটা হল কিন্তু ইংরেজিতে। জবাবটা এল চোস্ত উর্দুতেই – চাপা স্বরে – যাতে প্রেসরুমের কেউ না শুনতে পায়। "নবাব আমিনুল্লা রাজা ভবশংকর হল কবে থেকে?"

## ময়দানের অন্ধকারে

সুপার স্মার্ট রাজা ভবশংকর মল্লিক সত্যি সত্যিই কোল্ড, বোল্ড অ্যান্ড গ্র্যানাইট। গ্র্যানাইট কঠিন চোখে সেকেন্ড কয়েক চেয়ে রইল উর্দুভাষিণী ললনার দিকে। চেয়ে রইল ঝকঝকে চোখের কুচকুচে কালো মণিকার দিকে। কালো মণির কালো সুড়ংগ বেয়ে কালো মনের কালো অন্ধকারে লুকোনো কালো অভিপ্রায়টুকু দেখে নিল যেন পলকের মধ্যে।

বললে – "কি বলছেন যদিও বুঝতে পারছি না, তবুও গাড়িতে আসুন – যেতে যেতে কথা বলব। আমার হাতে আর সময় নেই।"

গটগট করে এগিয়ে গিয়ে নিজেই খুলে ধরলে গাড়ির পেছনের দরজা। রূপনগরের রূপকুমারী উঠল আগে। তারপর ভবশংকর।

স্টার্ট নিল গাড়ি। থামল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে।

প্যারেড গ্রাউন্ডের একটা গাছের তলায় গেল দুজনে। দাঁড়াল মুখোমুখি।

নিরুত্তাপ স্বরে বললে ভবশংকর – "কে আপনি?"

অন্ধকারেও যেন দপ করে জ্বলে উঠল রূপকুমারীর দুই নয়ন – "চিনতে না পারার ভান এখন করবে?"

"চিনতে পারলে ভান করতাম বইকি!" এবার কিন্তু চোস্ত উর্দুতেই বললে ভবশংকর।

"চিনতে পেরেছিলে বলেই প্রেস ক্লাব থেকে সরিয়ে নিয়ে এলে অত তাড়াতাড়ি।"

"নিয়ে এলাম অযথা কেলেংকারি বাড়াতে চাই না বলে।"

"কেলেংকারির আর কি শেষ রেখেছো আমিনুল্লা?"

"কে আমিনুল্লা?"

"নবাব আমিনুল্লা। আফগান নবাব আমিনুল্লা। আমার হাজব্যান্ডের মার্ডারার আমিনুল্লা।"

"গুড গড! এসব কি বলছেন?"

"এত ভালো অ্যাক্টর তো কোনোকালেই ছিলে না। তুমি? প্রেসিডেন্টের পানিশমেন্ট তোমার এই একটা উপকার অন্তত করেছে দেখা যাচ্ছে।"

"প্রেসিডেন্ট! পানিশমেন্ট! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ভবশংকর মল্লিক। নবাব আমিনুল্লা নই। আফগানিস্তান কখনো দেখিনি।"

"তাই নাকি? বেগম নাদিয়াকেও কখনো দেখোনি?"

"বেগম নাদিয়া! সে কে?"

"তোমার সামনেই যে দাঁড়িয়ে – যার স্বামীকে কুকুরের মত গুলি করে মেরেছিলে, তারই স্ত্রীর সংগে পরকীয়া প্রেমে অন্ধ হয়ে।"

"তারপর?" বিদ্রূপ ঝলসে ওঠে ভবশংকরের স্বরে।

"তারপর? হায় আল্লা! তারপরের ঘটনাও মনে করিয়ে দিতে হবে?"

"গল্পটা শুনতে ভালই লাগছে। তবে ঝটপট সারলে ভাল হয়।"

"আমিনুল্লা!" ভবশংকরের বুকের কাছে এগিয়ে আসে বেগম নাদিয়া – "প্রেসিডেন্ট তোমাকে দেশ থেকে নির্বাসন দিতে পারেন - কিন্তু আমার মন থেকে তুমি এখনও নির্বাসিত হওনি। হতে পারো তুমি খুনী, খুন করেছিলে আমারই স্বামীকে – কিন্তু আমি তো আজও তোমাকে ভালবাসি আমিনুল্লা। যেভাবে বাসতাম বারো বছর আগে ঠিক সেইভাবে আজও আমার দেহমন শুধু তোমারই জন্যে। আমার সেই নপুংসক স্বামীর হাত থেকে আমাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমিনুল্লা – এবার আমাকে নাও।"

ভবশংকরের চওড়া বুকের ওপর মাথা এলিয়ে দেয় বেগম নাদিয়া। উষ্ণ আননের স্পর্শে আর গাঢ় আতরের সৌরভে যেন শিউরে ওঠে ভবশংকর।

চকিতে পেছিয়ে আসে একপা।

বলে কঠোর স্বরে – "বেগম নাদিয়া, পৃথিবীটা বিরাট। হিমালয়ের দুই প্রান্তে একই রকম দেখতে দুজন মানুষ থাকা বিচিত্র নয়। আপনি যাকে আমিনুল্লা মনে করছেন। তাকে দেখতে আমারই মত। কিন্তু আমি আপনাকে চিনিনা। ভুল করছেন।"

থাপ্পড় খাওয়া ফণিনীর মতই হিসহিসিয়ে ওঠে বেগম নাদিয়া "গলার স্বর, উর্দু উচ্চারণ – একটু পালটেছে ঠিকই বারো বছর আমেরিকায় থাকলে একটু তো পালটাবেই যেমন পালটেছে অকপট হওয়ার ক্ষমতা – কপট হতে শিখেছো এই বারো বছরে ভাল করেই। কিন্তু নবাব আমিনুল্লা, বেগম নাদিয়া এখনও পাল্টায়নি। বারো বছর আগে যা ছিল –এখনও তাই আছে। এখনো আমার শরীরের প্রতিটি অংশে তোমার উষ্ণ চুম্বনের রেশ লেগে রয়েছে। – আর কোনো পুরুষের চুম্বন সেখানে পড়েনি – আর কারো আলিংগনে সে ধরা দেয়নি – আর কারো শয্যায় সে শোয়নি। আমি জানতাম একদিন তুমি ফিরে আসবেই –আমাকেই নিকে করবে। কিন্তু কেন তুমি আমাকে চিনেও চিনতে চাইছ না, কেন কলকাতায় চারশ কোটি টাকা ঢালতে যাচ্ছ, কেন ভবশংকর মল্লিক সেজে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছো – এ রহস্য ভেদ আমি করবই। হ্যাঁ, করবই। চললাম।"

বিদ্যুতের মত গাছের তলা থেকে উধাও হয়ে গেল রূপসী নাদিয়া। অদূরে দাঁড়িয়েছিল একটা খালি ট্যাক্সি। উঠে বসল পেছনে। স্টার্ট নিল ইঞ্জিন।

পাথরের মূর্তির মত কুপসি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল রাজা ভবশংকর মল্লিক।

## ককটেল পার্টিতে

রাত ঠিক নটার সময়ে পার্ক স্ট্রীটের ইন্দো-আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটির ককটেল পার্টিতে পৌঁছালো ভবশংকর মল্লিক।

অভ্যাগতরা এসে গেছে অনেক আগেই। ঘর গমগম করছে বহুজনের হাসি আর গুঞ্জনে, গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকির রিনটিনটিন শব্দে। যেন

জুবিন মেহতার আশ্চর্য অর্কেস্ট্রা বাজছে হলঘর জুড়ে।

অভ্যাগতদের মধ্যে আছে আমেরিকান দূতাবাসের কেষ্টবিষ্টুরা, ইন্দো-আফগানিস্তান ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী শেখ রহিম এবং বেশ কয়েকটা বাণিজ্য সংঘের কেষ্টুরাচোমরারা।

ভবশংকর মল্লিক প্রবেশ করল সেই ঘরে একটা জীবন্ত সচল ডায়নামোর মতই। প্রাণোচ্ছলতা ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে প্রতিটি পদক্ষেপে। কে বলবে বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে দৃপ্ত আকৃতি, উজ্জ্বল চক্ষু আর মিশমিশে কালো চুল দেখে মনে হয় যেন তিরিশই পুরোয়নি এখনো।

পাইপ কামড়ে সটান এসে ঘরের মাঝে দাঁড়াতেই অভ্যাগতরা ছেঁকে ধরল তাকে। স্মিতমুখে প্রত্যেকের সংগেই কথা চালিয়ে গেল কখনো হিন্দি কখনো বাংলা, কখনো উর্দু, কখনো ইংরেজিতে। সহজ, অনাড়ম্বর, স্মার্ট। যেন একটা পালিশকরা হীরে। বেয়ারা মদিরা পাত্র ধরিয়ে দিয়ে গেল হাতে। তামাক, সুরা চলছে ক্রমান্বয়ে – কথাও চলছে ফাঁকে ফাঁকে। জনে-জনে বুঝিয়ে দিচ্ছে কি বিরাট প্রোজেক্ট নিয়ে সে ফিরে এসেছে ভারতের মাটিতে। কলকাতার ওপরেই গড়ে উঠবে এশিয়ার বৃহত্তম ইলেকট্রনিক্স কারখানা –টেক্কা দেবে জাপানের সাথে – রপ্তানী ব্যবসায়ে পাল্লা দেবে জাপানী বিজনেস ম্যাগনেটদের সাথে। সারা পৃথিবীটাই হবে মার্কেট। পয়সা তো ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে। মডার্ন কনসেপ্ট অনুযায়ী প্রথমে তা ছড়াতে হবে। গ্রামারে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে হবে – কুড়োনোর পালা তারপরে।

কথা বলতে বলতে এক কোণে চলে এসেছে ভবশংকর। সুরার সংগে ট্রে বোঝাই বিবিধ মাংসের খাবারও সরবরাহ হচ্ছে। তামাকের ধোঁয়ায় ঘর প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। অভ্যাগতদের রক্তেও নেশা নাচছে অবিরাম মদ্যপান করে যাওয়ায়, অনেকেই বসে পড়েছে সোফা কোচ কুশন কার্পেটে। কেউ কেউ দেওয়ালে হেলান দিয়ে কথা চালিয়ে যাচ্ছে জড়িত স্বরে।

পার্টি হচ্ছে একতলার ঘরে। ঘরের পেছনেই পাঁচিল ঘেরা বাগান। শ্বেতপাথরের মূর্তি আর বসবার জায়গা। জনাকয়েক অভ্যাগত গেলাস আর খাবারের প্লেট নিয়ে গেল বাগানে। পেছন পেছন গেল ভবশংকরও। তার পেছনে শেখ রহিম – ইন্দো-আফগানিস্তান ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী। সর্বঘটে কাঁঠালি কলা সে। সব সভাসমিতিতেই হাজির থাকে। শান্তির নীতি কপচায়। পয়লা নম্বর বচনবাগীশ এবং যুক্তিবাদী। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূলে আনতে সিদ্ধহস্ত।

ভবশংকর মত্ত অভ্যাগতদের এড়িয়ে গিয়ে দাঁড়াল বাগানের এক কোণে – অন্ধকারে।

একটু পরেই এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে শেখ রহিম এসে দাঁড়াল পাশে।

ভবশংকর নিচু গলায় বললে – "রহিম, প্রেস কনফারেন্স অরগ্যানাইজ করার ভার তোমাকে দিয়ে ভুল করেছি।" কথাটা বলা হল উর্দুতে।

জবাবটাও এল উর্দুতে – "কেন? কি হয়েছে?"

"বেগম নাদিয়া আমাকে চিনে ফেলেছে। তাকে ডেকেছিলে কেন?"

"প্রেস লিস্টে যাদের নাম আছে, তাদের সবার কাছেই কার্ড গেছে। অত খুঁটিয়ে দেখিনি। সময় দিলে কোথায়?"

"বেগম নাদিয়া কি প্রেস রিপোর্টার?"

"নিশ্চয়। লন্ডন টাইমস-এর ইস্টার্ন ইন্ডিয়ান করেসপনডেন্ট।"

"বিসমিল্লা!"

"কি হয়েছে বলবে তো?"

"সর্বনাশ হয়েছে। বারো বছরেও আমাকে ভুলতে পারেনি। রাজা ভবশংকর মল্লিক বল্লে মানতেই রাজী নয়।"

"প্রেস রিপোর্টাররা চিনতে পারেনি তো?"

"একেবারে না। ভবশংকর বলেই মেনে নিয়েছে আমাকে – বেগম নাদিয়া ছাড়া।"

"চিনেই যখন ফেলেছে, তখন গোপন করে লাভ নেই।"

"বলছ কি রহিম! প্রেসিডেন্টের যে মিশন নিয়ে এসেছি, সে মিশনে কোনো মহিলার স্থান নেই।"

হাসল শেখ রহিম – "আছে বইকি! ভবশংকরের স্ত্রীর।"

"সেই কারণেই বেগম নাদিয়াকে এড়িয়ে আরো চলা দরকার। যে আমার স্ত্রী নয়, যাকে কখনো দেখিনি – তার কাছে স্বামী হয়ে থাকতে হবে – তাকে বিশ্বাস করাতে হবে আমিই তার স্বামী – এ সময়ে আর একজন মহিলা যদি আমার জীবনে ঢুকে পড়ে –"

"তাই কি চাইছে বেগম নাদিয়া?"

"এগজ্যাক্টলি তাই চাইছে। আমাকে নিকে করতে চাইছে। বারো বছর অপেক্ষা করেছে আমার জন্যে। বারো বছর আগে দেহদান করেছিল – এখনও করতে চাইছে।"

অস্ফুট হেসে শেখ রহিম বললে – "তুমি আজও বিয়েই করোনি। না হয় একটা করলে।"

"অসম্ভব। আমার মিশন কমপ্লিট না করা পর্যন্ত আমি বিয়েই করব না।"

"প্রেসিডেন্ট ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছেন, আমিনুল্লা। তোমাকে তো আমি চিনি। ভাঙবে তো মচকাবে না – কিন্তু প্ল্যানটা কি?"

"টপ সিক্রেট। তোমাকেও বলা যাবে না।"

"কিন্তু আমার কাছে যে মেসেজটা আজকেই এসেছে, সেটা তোমাকে বলা দরকার। জানিনা, তোমার টপ সিক্রেটের সংগে তার মিল আছে কিনা।"

"বলো।"

"সিয়েদা নেভাদায় তোমাকে রেডিও মেসেজে বলা হয়েছিল, অন্যান্য এজেন্টদের মত তোমাকে ইন্ডিয়ার অস্ত্রশস্ত্র, মিলিটারি ঘাঁটি, গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানার খবর যোগাড় করতে হবে। ঠিক তো?"

চুপ করে রইল ভবশংকর।

বলে চলল শেখ রহিম – "তোমার কাজ হবে ব্যবসার অছিলায় খানদানী মহলে ঘোরা, গভর্নমেন্টে লাইন করা, টাকা দিয়ে টপম্যানদের কিনে নেওয়া, টাকা ছড়িয়ে কাশ্মীর আর পাঞ্জাব থেকে আসাম পর্যন্ত চরমপন্থীদের খেপিয়ে তোলা – ইন্ডিয়ান আর্মি যেন ছড়িয়ে পড়ে ইন্ডিয়ার সর্বত্র। দাংগা পর্যন্ত লাগাতে হবে যেখানে যে স্টেটে সুযোগ পাবে – সেখানেই ব্যবসার অছিলায় তোমাকে তো ঘুরতে হবে সব জায়গাতেই।"

ভবশংকর তখনও নীরব।

শেখ রহিম বললে – "আমার কাজ হবে তোমাকে প্রোটেকশন দিয়ে যাওয়া, প্ল্যানমাফিক কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আগলে রাখা।"

"তারপর?" এই প্রথম কথা বলল ভবশংকর।

"তারপর তোমাকে জানাব সেই তারিখটা – যে তারিখে গণতন্ত্রকে ধুয়ে দেব আমাদের তন্ত্র দিয়ে।"

গাঢ় স্বরে বললে ভবশংকর – "ঠিক পথেই এগোচ্ছেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু সব বানচাল হয়ে যাবে এখন অন্য মেয়ের সংগে মেলামেশা করলে। রহিম, তুমি বোঝাও বেগম নাদিয়াকে।"

"তোমার সংগে কি কি কথা হয়েছিল আগে বলো।"

ভবশংকর বলে গেল প্রতিটি কথা।

নিঃশব্দে শুনল শেখ রহিম।

তারপর হাসল। বলল "মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। যত ভালো অভিনয়ই করো না কেন। জানিনা, ভবশংকরের বউয়ের চোখেও ধুলো দিতে পারব কিনা।"

"আরে সে তো মাথা খারাপ করে বসে আছে। মুশকিল হবে না।"

"কিন্তু হাতে ছুরি নিয়ে খুঁজে বেড়ায় খুনে স্বামীকে রাতের অন্ধকারে – মুশকিলটা সেইখানেই।"

"তুমি জানলে কোথেকে?"

"তুমি ইন্ডিয়ায় আসার আগেই সব খবরই নিতে হয়েছে আমাকে, আমিনুল্লা।"

"দরকার হলে আর একটা খুন না হয় করা যাবে। কিন্তু বেগম নাদিয়াকে তুমি সামলাও।"

"কি করি বলো তো?"

"ওর সংগে দেখা করো, বুঝিয়ে বলো প্রেসিডেন্টের সিক্রেট মিশন নিয়ে ইন্ডিয়ায় এসেছি – দেশকে যদি ভালোবাসে, – আমার ধারেকাছেও যেন না আসে।"

"ও-কে, বস। এখুনি যাচ্ছি। ফোন করব রাত্রে।"

রাত একটার সময়ে টেলিফোন বাজল ভবশংকরের ঘরে।

পাশেই সোফায় বসে পাইপ টানছিল ভবশংকর। ঘর অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল রিসিভার।

"হ্যালো ?"

"পি-কে ফোর টোয়েন্টি।"

"টোয়েন্টিফোর কে পি।"

"রাইট। শেখ রহিম বলছি।"

"কথা হল বেগম নাদিয়ার সংগে ?"

"হল।"

"রেজাল্ট কি ?"

"নেগেটিভ।"

"মানে ?"

"ও তোমার সংগে একবার ..... শুধু একবার দেখা করতে চায়।"

"কেন ?"

"হাসি ভেসে এল তারের মধ্যে দিয়ে – মেয়েমানুষ যে এভাবে কথা বলতে পারে, নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করতাম না।"

"কি বলছে ?"

"বারো বছরের দেহের জ্বালা জুড়োতে চায়।"

"অসম্ভব। দেশ আগে – মেয়েমানুষ পরে।"

"ও বলছে, প্রেমের ব্যাপারে দেশ-টেশ পায়ের তলায়।"

"ননসেন্স।"

"আমিনুল্লা, কি করবে ?"

"তুমিই বলো কি করব।"

"দেখা করো।"

"রহিম –"

"শোনো, আমিনুল্লা – তুমি ধোয়া তুলসী পাতা নও। ব্যাচেলর হতে পারো – কিন্তু ব্রহ্মচারী নও। বেগম নাদিয়াকে সুখী রাখলে যদি কাম ফতে হয়, ক্ষতি কী ?"

"কোনমতেই তা সম্ভব নয়। বেগম নাদিয়াকে তুমি চেনো না। বাৎস্যায়ন নাকি বলেছেন, মেয়েদের সেক্স-বাসনা ছেলেদের আটগুণ বেশি। বেগম নাদিয়ার, চৌষট্টিগুণ বেশি। ও যে কি চীজ, বারো বছর আগেই টের পেয়েছি।"

"বেশ তো, বারো বছর পরে না হয় একটু টেস্ট করলে।"

"তাতে ওর খিদে বেড়েই যাবে – দেখাশুনো চলতেই থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, ভবশংকরের বউকে ও সহ্য করতে পারবে না। ভয়ানক জেলাস হয় মেয়েরা – বিশেষ করে সেক্সি মেয়েরা। বেগম নাদিয়া তাই। আমাদের সিক্রেট প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যাবে।"

"এমনিতেও ও ভণ্ডুল করে দেবে – যদি দেখা না করো।"

"শাসিয়েছে নাকি ?"

"হ্যাঁ।"

চুপ করে রইল ভবশংকর।

শেখ রহিম বললে – "কি করবে ?"

"দেখা করব – বুঝিয়ে বলব।"

"কখন ?"

"এক্ষুনি। একা থাকে তো ?"

"হ্যাঁ। ঠিকানাটা লিখে নাও।"

"বলো।"

## নাদিয়ার নরকে

রাত তখন দুটো।

দেওদার স্ট্রীটের একটা ফ্ল্যাট বাড়ির তিনতলায় উঠে এল ভবশংকর। টোকা মারল ন নম্বর ফ্ল্যাটের দরজায়। বেল টিপল না ইচ্ছে করেই। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমোচ্ছে।

খুলে গেল দরজা। সামনেই দাঁড়িয়ে বেগম নাদিয়া পরনে ম্যাক্সি। চুল খোলা। অন্ধকার ঘরেও যেন জ্বলছে দুচোখ।

"এসো।"

চৌকাঠ পেরিয়ে এল ভবশংকর। দরজা বন্ধ করে দিল বেগম নাদিয়া। ঘুরে দাঁড়িয়েই আচমকা দু'হাতে ভবশংকরের গলা জড়িয়ে ধরে লিপস্টিক আঁকা ঠোঁট দুটো দিয়ে জোরে চেপে ধরল ভবশংকরের দু'ঠোঁট। চওড়া বুকের ওপর মিলিয়ে দিল নিজের বুক।

তপ্ত অধর আর নিঃশ্বাসের হলকায় যেন মুখ পুড়ে গেল ভবশংকরের। আগুন ছুটছে যেন নাদিয়ার গা থেকে। বুক দিয়েই তা টের পাচ্ছে ভবশংকর।

কেটে যায় সেকেণ্ডের পর সেকেণ্ড। শিথিল হয় না বক্ষলগ্না কণ্ঠলগ্না নাদিয়ার বাহুপাশ।

ভবশংকর যেন পাথর। অধর দিয়ে সংযমশক্তিকে শোষণ করে নিয়ে শিরায় ধমনীতে অগ্নিস্রোত বইয়ে দেওয়ার চেষ্টায় ব্যর্থ হয় নাদিয়া।

আচমকা বাহুবন্ধন খসিয়ে নিয়ে ধাক্কা মেরে ভবশংকরকে সরিয়ে দেয় বেগম নাদিয়া।

গর্জে ওঠে চাপা গলায় পরক্ষণেই – "কে তুমি ?"

"যাকে দেখতে চেয়েছিলে – সে" ধীর সংযত স্বর ভবশংকরের।

"না, না, না। আমিনুল্লা তুমি নও।",

"হঠাৎ ধারণাটা পাল্টে গেল কেন ?"

"চোখ দিয়ে যা ধরা যায় না – ঠোঁট দিয়ে তা ধরা যায়। তুমি আমার আমিনুল্লা নও।"

ব্যংগের হাসি হাসল ভবশংকর – "ইমপারসোনেশন তাহলে পারফেক্ট হয়েছে।"

"বলো, কে তুমি ?"

'কে বলে মনে হয় তোমার ?"

"ভবশংকর...... রাজা ভবশংকর মল্লিক ......আমিনুল্লা কোথায় ?"

"তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে।"

"ডোন্ট লাই। মেয়েদের ঠোঁটকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমিনুল্লার ঠোঁটের ছোঁয়া এ বারো বছর ধরে লেগে রয়েছে আমার ঠোঁটের কোনায় কোনায়। রাজা ভবশংকর...... রাজা ভবশংকর " হাঁফাচ্ছে বেগম নাদিয়া – "কোথায় আছে আমিনুল্লা ?"

"বললাম তো তোমার সামনেই।"

"প্রেসিডেন্টকে ধোঁকা দিতে পারো, দুনিয়ার সবাইকে ধোঁকা দিতে পারো – আমাকে পারবে না।"

"ঠিক উল্টোটা বললে। দেশের নামে শপথ করেছি ভবশংকরের ভূমিকা অভিনয় করে যাবো মিশন কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত কেউ ধরতেও পারবে না আমি কে। বেগম নাদিয়া, তাই তুমি পারলে না। পারবে না ভবশংকরের বিয়েকরা বউও।"

"তা তো পারবেই না। তুমিই যে ভবশংকর।"

"ভবশংকর আর বেঁচে নেই, নাদিয়া।"

"মিথ্যে কথা।"

"ডেথ্ ভ্যালীর বালির কবরে ঝলসাচ্ছে ভবশংকরের দেহ এই মুহূর্তে। নিজের হাতে খুন করেছি তাকে। দেশের স্বার্থে – প্রেসিডেন্টের হুকুমে। মরবার আগে শুনে নিয়েছিলাম তার অতীত কাহিনী। কাগজপত্রও নিয়েছি খুন করার পর। ভবশংকরের চরিত্রে তাই খাপ খেয়ে গেছি এমন সুন্দরভাবে। নাদিয়া, সারা বিশ্বের কাছে আমি এখন ভবশংকর – আমিনুল্লা নই –"

খট করে সুইচ টেপার শব্দ হল। জ্বলে উঠল আলো।

বড় খাট। নিভাঁজ শয্যা। আধুনিক ফার্নিচার।

জোরালো আলোর নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ভবশংকরের মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে বেগম নাদিয়া। দুই চোখে স্ফুলিংগ। বুক উথালি পাথালি সঘন নিঃশ্বাসে। ম্যাক্সির নিচে যে অন্তর্বাস নেই, দৃঢ় আলিংগনের সময়েই তা টের পেয়েছে ভবশংকর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভবশংকরের মুখ দেখল নাদিয়া। ফুলে ফুলে উঠছে নাকের পাটা। ঝলকিত হচ্ছে হীরের নাকছাবি। বাস্তবিকই সুন্দরী।

[এরপর ৫৩ পাতায় দেখুন]

[উপন্যাস নকল নবাব : ৩৪ পাতার পর]

কিন্তু সর্বনাশা এই রূপসীর সামনেই নিশ্চল নির্বিকার নিস্পৃহ মুখে দাঁড়িয়ে আছে ভবশঙ্কর। সুতীক্ষ্ম দুই চাহনি মেলে চেয়ে আছে নাদিয়ার আশ্চর্য রূপের দিকে।

মুখাবয়ব কিন্তু কোল্ড, খোল্ড, গ্র্যানাইট।

গভীর শ্বাস ত্যাগ করল নাদিয়া।

হাসল ভবশঙ্কর – "কি বুঝলে?"

"আশ্চর্য! এমন মিলও থাকে দুই দেশের দুই মানুষের মধ্যে?"

"মুখ দেখেও বিশ্বাস হল না?"

"না।"

"শরীর দেখতে চাও? উরুতে কাটা দাগটা –"

"বানিয়ে নেওয়া যায়।"

"লাভ কী তাতে?"

"লাভ?" বিচিত্র দ্যুতি জ্বলে ওঠে নাদিয়ার চোখে – "সেইটাই তো জানতে চাই। কেন? কেন ভবশঙ্কর এসেছে আমিনুল্লার সাজে?"

"কি করতে চাও?"

"কি করতে চাই?" বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল বেগম নাদিয়া – "তোমাকে তো তা বলা যাবে না। যথাসময়ে জানবে।"

"নাদিয়া –"

"যাও, ভবশঙ্কর যাও, এখুনি যাও। দেখা আবার হবে, আমিনুল্লার খোঁজ নেওয়ার পর।"

"খোঁজ নেবে? কোথায়?"

"সিয়েরা নেভাদায়।"

## খবরের কাগজে ছবি দেখে

টার্কিশ কনসুলেট জেনারেলের পত্নী মমতাজের সক্কালবেলার প্রথম কাজ হল একরাশ খবরের কাগজ পড়া। পড়ে সার সংবাদগুলো পতিদেবতাকে জানিয়ে দেওয়া।

মমতাজ ভারী মিষ্টি মেয়ে। বয়স এমন কিছু বেশি নয় বলে মনে হয় বটে, কিন্তু যারা জানে, তারা বলে – আর কত কসমেটিক্স-এর কোটিং দিবি মমতাজ? বয়স তো হল! একগাল হেসে গালে টোল ফেলে মমতাজ বলে – "ছাই হল। তিরিশ কি একটা বয়স? চোখে অন্ধ নাকি? ভরাট যৌবন দেখতে পাচ্ছো না?"

ভরাট যৌবনই বটে। যৌবন যদি একটা মহাসাগর হয়, আর মমতাজের দেহটা সেই মহাসাগরের তটরেখা হয়, তাহলে স্পষ্ট দেখা যায় যৌবনের ফেনায়িত তরঙ্গ আছড়ে আছড়ে পড়ছে তার শরীরের রেখায় রেখায়, চলাফেরা, হাত পা নাড়া, কথা বলার সময়ে। মমতাজের শরীরে নাকি পাঠান রক্ত, আরবী রক্ত আর পারসিক রক্তের ভেজাল আছে। দোঁআঁশলা না বলে তাকে তে-আঁশলা বলাই সমীচীন। কিন্তু মেয়েদের রূপটাই বড় কথা। রূপের আগুনে অতীতের সব ময়লাই পুড়ে যায়। মমতাজেরও জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

মমতাজ নিজে তো নয়ই। ছেলেপুলে নেই। স্বামী সরকারি কাজ নিয়ে ব্যস্ত দিনরাত পার্টি আর মার্কেটিং, সোস্যাল ওয়ার্ক আর ফালতু কাজ নিয়ে নাওয়া খাওয়ার সময় পায় না। ছটফটে, দুরন্ত, কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ে, যেন এখনো ছোট্ট খুকিটি।

এহেন মমতাজ সাত সকালে প্রথমেই চোখের সামনে মেলে ধরল যে দৈনিকটি, সেটি একটি ইংরেজি কাগজ। প্রথম পৃষ্ঠার ওপর দিকে ছাপা বড় ছবিটির দিকে নজর গেল সবার আগে। সবারই যায়। যাওয়ার জন্যেই অমন জায়গায় ছাপা হয়েছে সেই দিনকার হেডলাইন স্টোরির ছবি।

চনমনে চোখে ছবির দিকে তাকিয়ে ছিল মমতাজ। তাকানোর পরেই চনমনানি উড়ে গেল চোখ থেকে। চোখের পাতা পড়ল না। চেয়েই রইল সেকেন্ড কয়েক। তারপর চেয়ে রইল চোখ কুঁচকে।

তলার খবরটা পড়া হয়ে গেল পরমুহূর্তেই – টেরিফিক স্পীডে।

বিস্ময়োক্তি ধ্বনিত হল কণ্ঠে – "ইয়া আল্লা! এ তো নবাব আমিনুল্লা! রাজা ভবশঙ্কর হল কবে থেকে!"

ঘণ্টাখানেক পরে নিষ্কর্মা মমতাজের গাড়ি এসে থামল হোটেল হিন্দুস্থানের সামনে। কাউণ্টারের সামনে খুটখুট করে গিয়ে দাঁড়াল মমতাজ সুন্দরী। ভোমরাচঞ্চল চোখ নাচিয়ে জেনে নিল রাজা ভবশঙ্কর রয়েছে কোন ঘরে।

একটু পরেই আঙুল পড়ল কলিংবেলের বোতামে। একবার। দুবার। তিনবার। একটু থেমে ভুরু-টুরু কুঁচকে আর একবার বোতাম টিপতে যাচ্ছে মমতাজ, এমন সময়ে খুলে গেল দরজা।

রাত্রিবাস পরে সামনেই দাঁড়িয়ে নবাব আমিনুল্লা। আরও সুন্দর। আরও স্মার্ট। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে আসায় চুল উস্কখুস্ক। কিন্তু নবাব আমিনুল্লাই বটে।

তবে নবাব আমিনুল্লা বলে সম্বোধন করা ঠিক হবে কি? খবরের কাগজের পাতায় আর হোটেলের খাতায় তো এই ভদ্রলোকের নাম রাজা ভবশঙ্কর মল্লিক।

ফাঁপরে পড়ে মমতাজ। এই বারো বছরে আমিনুল্লার চোখের ধার যেন আরো বেড়েছে। কষকষে চোখে চেয়ে আছে মমতাজের মুখের দিকে। দুই চোখের খরদ্যুতির দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না।

নার্ভাস হয়ে যায় মমতাজ।

আমতা আমতা করে বলে – "এক্সকিউজ মী, আর ইউ রাজা ভবশংকর মল্লিক ?"

"ও ইয়েস। মে আই নো হু আই অ্যাম টকিং টু ?" ভরাট গম্ভীর গলা। বারো বছরে গলার স্বরও ভারী হয়েছে।

ফস করে বেরিয়ে গেল জবাবটা চোস্ত উর্দুতে – "আমি মমতাজ –নবাব সাহেব কি চিনতে পারছেন না ?"

"নবাব সাহেব ?" কপাল কুঁচকে যায় ভবশংকরের। "মমতাজ ?"

বাব্বা ! এ যে বাঘের ডাক ডেকে কথা বলে। একেবারেই এবার ঘাবড়ে যায় মমতাজ। ফলে মাতৃভাষাটাই বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে – "কিন্তু আপনিই তো নবাব আমিনুল্লা ! ছেলেবেলায় কত পিকনিক করেছি আপনার সংগে। রাজা ভবশংকর হয়ে গেলেন কেন ?"

হাসল ভবশংকর।

"আমি ভবশংকরই। হয়তো নবাব আমিনুল্লার মতই দেখতে। তিনি আপনার কেউ হন বুঝি ?"

"হন মানে ? আপনার ছোটবোনের সংগেই তো আমার দাদার সাদী হয়েছে। কি যে ন্যাকামি করেন ?"

"ন্যাকামি নয়, ম্যাডাম", উর্দুতেই জবাব দেয় ভবশংকর – "লাহোরে অনেকদিন ছিলাম বলেই উর্দুটা বলতে পারি, কিন্তু আমার চোদ্দপুরুষে কেউ নবাব ছিল না। আপনি ভুল করছেন", মিষ্টি করে হাসল ভবশংকর।

মিষ্টি হেসেই বললে ভবশংকর – "কোত্থেকে আসছেন ?"

আত্মপরিচয় দিল মমতাজ। সেইসংগে বললে, সকালে খবরের কাগজ পড়েই দৌড়ে এসেছে হন্তদন্ত হয়ে। নবাব আমিনুল্লাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাসন দন্ড দিয়েছিল বারো বছর আগে খুনের অপরাধে। অন্য কেউ হলে মৃত্যুদন্ডই হত – নেহাত নবাব বলে রক্ষে। তাই স্বামীদেবতাকে ঘুম থেকে না তুলেই দৌড়ে এসেছে দেখতে।

"সে কী ! কাউকে না জানিয়ে চলে এলেন ?"

"আমি ঐ রকমই। চোখ নাচিয়ে বলল মমতাজ।" এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়েছে।

"কিসে এলেন ?"

"গাড়িতে।"

"ড্রাইভারকে ঘুম থেকে টেনে তুলে ?"

"মোটেই না। ড্রাইভিং তো জানি।"

"বেশ তো, আলাপ যখন হল, সন্ধে নাগাদ গিয়ে চা খাওয়া যাবেখন। ইনভাইট করছেন তো ?"

হেসে ফেলে মমতাজ। দুষ্টুমিভরা চোখে বলে – "একশবার। সন্ধে ঠিক ছটার সময়ে ? চমকে যাবে সবাই আপনাকে দেখলে – যাবেন কিন্তু ? এই নিন কার্ড।"

"নিশ্চয়।"

হেসে বিদায় নিল মমতাজ।

হাসিমুখেই সেদিকে চেয়ে রইল ভবশংকর। তারপর আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে।

মুখ এখন গম্ভীর। হাসি মিলিয়ে গেছে চোখমুখ থেকে।

ঘন্টা তিনেক পর।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইয়ের নট ঠিক করছে ভবশংকর, বেজে উঠল ডিংডং ঘন্টা। নিমেষে মুখটা থমথমে হয়ে ওঠে ভবশংকরের। পরক্ষণেই মুখের সহজ ভাব ফিরিয়ে এনে এগিয়ে গেল দরজার সামনে।

ল্যাচ ঘুরিয়ে পাল্লা খুলতেই পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল শেখ রহিম।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ভবশংকর। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে শেখ রহিমের উদভ্রান্ত মুখচ্ছবির দিকে।

"কি হয়েছে, রহিম ?"

"বেগম নাদিয়া কোথায় ?"

"কোথায় মানে ?" অবাক স্বর ভবশংকরের।

"সকালে গেছিলাম ওর ফ্ল্যাটে। দরজা খোলা। খাটের ওপর পেলাম এই চিঠিখানা।" একটা নীলাভ খাম এগিয়ে দিল শেখ রহিম। খামের মুখ খোলা। ভেতরে চিঠিটাও নিশ্চয় পড়া হয়ে গেছে, তাই এমন ফ্যাকাসে পানা মুখখানি।

খামের ওপর অবশ্য লেখা রয়েছে :

টু মাই ডার্লিং নবাব আমিনুল্লা ওরফে রাজা ভবশংকর মল্লিক। খামটা হাতে নিয়ে লেখাটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ভবশংকর। তারপর খামের ভেতর থেকে টেনে বার করল চিঠির কাগজটা। নীলাভ কাগজ। চার ভাঁজ করা। ভাঁজ খুলতেই জ্বলজ্বল করে উঠল মাত্র তিনটে লাইন :

চললাম।<br>
ফিরে এসে মুখোশ খুলে দেব।<br>
বেগম নাদিয়া।

চোখ তোলে ভবশংকর, শান্ত, অচঞ্চল চাহনি। বিহ্বল চোখে তা দেখল শেখ রহিম। বিমূঢ় হল। "মানে কি, আমিনুল্লা ? মানে কি এ চিঠির ? দেখা হয়েছিল কাল রাতে ? কি হয়েছিল ? বলো কি হয়েছিল ?"

প্রশ্ন তো নয়, যেন একঝাঁক শিলাবৃষ্টি। ভবশংকর কিন্তু অবিচলিত। নির্বিকার। নিশ্চুপ।

"আমিনুল্লা, তোমার নার্ভ স্ট্রং হতে পারে, কিন্তু আমি.....আমি......কি চায় বেগম নাদিয়া ? কোথায় গেছে ?"

মৃদু স্বরে বললে ভবশংকর – "কোথায় গেছে, যদি জানতাম – এখুনি গিয়ে খুন করতাম নিজের হাতে। রহিম, সে যা চেয়েছিল, তা না পেয়ে বাঘিনী হয়ে গিয়েছে।"

"এখন উপায় ?"

"উপায় ?" ভুরু দুটোকে সেকেন্ড ব্রাকেট বানিয়ে কিছুক্ষণ ভাবে ভবশংকর – "বিপদ ঘনিয়ে আসার আগেই, বিশ্বাসঘাতিনী নাদিয়া আমার মুখোশ খুলে দেওয়ার আগেই কাজ শেষ করে পাততাড়ি গুটোতে হবে আমাদের। প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দাও সব ঘটনা। ডিসিশন উনিই নেবেন।"

"ডিসিশন ! মানে –"

"আসল কাজ শুরু করার ডিসিশন। কবে, কোন কোন পয়েন্টে কাজ শুরু হবে – তা ফাইনালাইজ করে ফেলবেন এ ঘটনা শোনার সংগে সংগে। হয়ত তারিখটা এগিয়েও আনতে পারেন।"

"একটা মেয়েছেলের জন্যে ?"

ঘৃণাবঙ্কিম হাসি হাসল ভবশংকর – "রহিম, সীতার জন্যে সোনার লংকা পুড়ে ছাই হয়েছিল। হেলেনের জন্যে ট্রয় ধ্বংস হয়েছিল। মেয়েদের এত তুচ্ছ কোরো না। সমস্ত প্ল্যান ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে দেশদ্রোহিনী নাদিয়ার জন্যে।"

গুম হয়ে গেল শেখ রহিম।

"কি ভাবছ রহিম ?"

চমক ভাঙল শেখ রহিমের – "ভাবছি প্রেসিডেন্টের ডিসিশনটা কি হতে পারে। তাঁকে আমি চিনি, আমিনুল্লা। হাড়ে হাড়ে চিনি। ক্রুয়েল, ড্রাসটিক, আনসেন্টিমেন্ট্যাল।"

"কি বলতে চাও ?"

ভবশংকরের চোখে চোখ রাখল শেখ রহিম – "নাদিয়া নিরুদ্দেশ। কিন্তু তুমি তো আছো। বিপদ তোমাকে নিয়েই। তোমাকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।"

আশ্চর্য হাসি হাসল ভবশংকর। মোনালিসার হাসির মতই দুর্জ্ঞেয় হাসি। ভয়ের ছায়াপাতও নেই সেই হাসির মধ্যে।

পাতলা ঠোঁট দুটোকে ভোজালির মত বেঁকিয়ে বললে মৃদু স্বরে – "যার ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একশ কোটি টাকা জমা পড়েছে, তাকে এত সহজে কি ধরাধাম থেকে সরাতে পারেন প্রেসিডেন্ট ?"

## মমতাজ কোথায় ?

পার্ক স্ট্রীট থানার অফিসার ইন চার্জ গরম গরম তেলেভাজা খাচ্ছিলেন সকালবেলা। বউ ভেজে পাঠিয়ে দিয়েছে ওপরের কোয়ার্টার

"কিন্তু আমি তো এখন –" 'তেলেভাজা খাচ্ছি' কথাটা তেলেভাজার সঙ্গেই কোঁৎ করে গিলে নিলেন রামচন্দ্র রায়।

"মিঃ রায়," কণ্ঠস্বর কঠিন হল টেলিফোনে – "মমতাজকে খুঁজে বার করুন। নইলে প্রাইম মিনিস্টারকে জানাতে বাধ্য হব আপনার মত অপদার্থ অফিসার –"

"কি যে বলেন! কি যে বলেন! হেঁ হেঁ হেঁ! রামচন্দ্র রায় থাকতে আপনার চিন্তা কিসের?"

মমতাজকে কিন্তু আর খুঁজে পাওয়া গেল না। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল জলজ্যান্ত হাসিখুশি মেয়েটা।

সেদিনই সন্ধ্যা ছটায় মমতাজের নেমন্তন্ন রাখতে কি ভবশংকর রায় এসেছিল তার বাড়িতে?

না, আসেনি। ঠিক সেই সময়ে ভবশংকরকে দেখা গিয়েছিল অ্যাডভোকেট নকুল সাহার চেম্বারে।

লম্বা দিবানিদ্রা শেষ করে ফোলা ফোলা চোখে নকুল সাহা সবে নেমেছেন চেম্বারে। ঘুরন্ত চেয়ারে বসে মৌজ করে গড়গড়া টানছেন। স্ফীত নাসারন্ধ্র দিয়ে জাহাজের চিমনি থেকে যেন ধোঁয়া বেরোচ্ছে। স্তিমিত নয়নে তিনি অবলোকন করছেন পাত্রমিত্র, মানে, মক্কেলদের। দেখে নিচ্ছেন, কোনটি বেশি শাঁসালো – তাকেই ধরবেন আগে।

হঠাৎ গড়গড়ার নল খসে পড়ল হাত থেকে। তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন দোর্দণ্ড প্রতাপ অ্যাডভোকেট।

কারণ, চৌকাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দ্য গ্রেট রাজা ভবশংকর মল্লিক।

"আসুন, আসুন।"

মক্কেলদের দিকে না চেয়েই দ্রিমিদ্রিমি স্বরে বললে ভবশংকর – "মর্টগেজ খালাস হয়েছে?"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়! কাগজপত্র –"

"পরে দেখব। কাল যাচ্ছি সিংহগড়ে।"

চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল নকুল সাহার – "সিংহগড়ে? যাবেন না, স্যার, যাবেন না।" যেন হিমালয়ের ডগা থেকে একজোড়া ঠান্ডা চোখ চেয়ে রইল নকুল সাহার দিকে – "কেন? লিলাবতীর ভয়ে?"

ঢোক গিললেন নকুল সাহা – "না......মানে......ছুরি হাতে সারা রাত আপনাকে খুঁজে বেড়ান তো –"

"ওর পরিশ্রমটা বন্ধ করার জন্যেই যাবো। আপনিও যাবেন আমার সঙ্গে।"

"আ-আমি!"

"কাল সকাল সাতটায় গাড়ি নিয়ে আসব। তৈরি থাকবেন। দিন-দুই পরে আমার গাড়িই ফিরিয়ে দিয়ে যাবে আপনাকে।"

"কি-কিন্তু এখানকার কাজকর্ম –"

"বন্ধ থাকবে।"

থেকে। এর পরেই আসবে গরম চা। তারপর বেরোবেন হোটেলগুলোয় চক্কর দিতে। ট্রু পাইস তো ঐসব জায়গায়। কলকাতার বিশেষ কয়েকটা থানায় পোস্টেড হওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। পার্ক স্ট্রীট থানার ও-সি হয়ে ইস্তক ভাগ্য খুলে গিয়েছে রামচন্দ্র রায়ের।

রামচন্দ্র রায় মানুষটি চেহারায় কিন্তু সজীব ডিসপেপসিয়া। অজীর্ণ রোগে ভোগেন বলেই মেজাজ সব সময়ে তিরিক্ষে। এই মুহূর্তে তিনি আলুর চপ চিবোতে চিবোতে ভাবছিলেন, গিন্নীকে একহাত নেওয়া দরকার। পই পই করে বলা সত্ত্বেও এত লঙ্কা দিয়েছে যে......

ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। যেন বউকেই সামনে পেয়েছেন, এমনি ভাবেই খ্যাঁক করে চেপে ধরলেন রিসিভারটা। মুখের কাছে এনেই ছাড়লেন পুলিশী হুংকার – "কে? কাকে চাই?"

রামচন্দ্র রায়ের টেলিফোন সম্ভাষণ এইরকমই। যারা জানে, তারা গায়ে মাখে না।

অপর পক্ষও গায়ে মাখল না। শুধু বললে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে – "আমার বউকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কার বউ? কেন পাওয়া যাচ্ছে না?"

"আমি টার্কিশ কনসুলেট জেনারেল –"

"কেয়াবাৎ! ইব্রাহিম সাহেব? আপনার বউ হারিয়েছে? কেন বলুন তো? হারিয়ে গেল কেন?"

"সকালবেলাই মমতাজ বেরিয়েছিল গাড়ি নিয়ে। একা। একটু আগে দেখা গেল গাড়ি কনসুলেট হাউসের সামনে – চাবিও ঝুলছে কী বোর্ডে। মমতাজ নেই ভেতরে।"

"ভেতরে না থাকলে বাইরে আছে। মানে, বাড়ির ভেতরে।"

"না, বাড়ির ভেতরেও নেই। ও যেখানে যেখানে যেতে পারে, সব জায়গায় ফোন করলাম – কোথাও যায়নি। গাড়িটাকেই বা বাড়ির সামনে রেখে গেল কেন?"

"ভেরি মিস্টিরিয়াস ব্যাপার তো! মিসিং স্কোয়াডে খবর দিয়েছেন?"

"ওটা আপনি করুন।"

## সিংহগড়ে

কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুর যাওয়ার পথ বেয়ে নক্ষত্রবেগে উড়ে যাচ্ছে বিলিতি গাড়িখানা।

পেছনের সিটে এককোণে পুঁটলির মত গুটিসুটি মেরে বসে নকুল সাহা। আর এক কোণে আমিরী ভঙ্গিমায় বসে রাজা ভবশংকর। দাঁতের ফাঁকে ডানহিল নাম্বার ফোর।

"জঙ্গল তো শুরু হল," বললে ভবশংকর।

কাষ্ঠ হেসে বললেন নকুল সাহা – আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারই জঙ্গল।"

"হুঁ।"

আড়চোখে ভবশঙ্করের মুখটা একটু দেখে নিয়ে শুকনো গলায় বললেন নকুল সাহা – "আমি বলছিলাম কি – " বলেই কি বলছিলেন, সেটা আর না বলাই সমীচীন বোধ করলেন ভদ্রলোক।

"বলুন কি বলছিলেন ?" দুপাশের মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ গভীর জংগল দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক সুরে বললে ভবশঙ্কর।

"বলছিলাম কি, বিষ্ণুপুর তো এখান থেকে আট দশ কিলোমিটার।"

"বেশ ?"

"ওখানকার টুরিস্ট লজখানাও খাসা। হাল আমলের তৈরি। আপনার সময়ে ছিল না।"

"খুব ভাল।"

"ঐখানে উঠলে হয় না? ম্যানেজার আপনার নাম শুনলেই –"

"না।"

একদম চুপ মেরে গেলেন নকুল সাহা।

কিছুক্ষণ পরে বললে ভবশঙ্কর –

"ড্রাইভারকে বলে দেবেন কোন দিকে টার্ন নিতে হবে। জংগলে তো রাস্তাঘাট ঢাকা পড়ে গেছে। এতদিন পরে –"

"আপনার লাগানো সিংহগড় লেখা নেমপ্লেটটা কিন্তু এখনো খুঁটিতে লাগানো আছে।"

"আপনি দেখিয়ে দেবেন।"

একটু পরেই দেখা গেল খুঁটিখানা। নিবিড় জংগলের কিনারায় পিসার হেলে পড়া টাওয়ারের মত একটা একটা খুঁটি। ডগায় এনামেল করা একটা নেমপ্লেট। বাংলায় লেখা : সিংহগড়।

পাশ দিয়ে লাল মাটির সরু রাস্তা ঢুকে গেছে ডানদিকের জংগলে। সুঁড়িপথ বলাই সংগত। দুপাশের আগাছা এগিয়ে এসে প্রায় দখল করে ফেলেছে পথটা।

গাড়ি ঢুকল সেই পথে।

জংগল নিবিড়তর। শালগাছ শেষ হল, শুরু হল আরও রকমারি গাছপালার জটলা। সমতলভূমির ওপর জংগল এত ভয়ংকর হয় না। সে জংগলের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে।

কিন্তু এখানকার জমি ভয়ানকভাবে উঁচুনিচু, এবড়োখেবড়ো। কোথাও ঠেলে উঠেছে টিলার মত, কোথাও গিরিখাতের মত দুপাশে বিকট খাড়াই পাড় সৃষ্টি করে অনেক নিচ দিয়ে বইয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঝর্নার জলধারা। ছোটবড় গাছ কিন্তু সর্বত্রই। গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। ফাঁক নেই কোথাও।

গাড়ির ওপরেও আছড়ে পড়ছে আগুয়ান গাছের ডালপাতা। বেশ বোঝা যায়, ভয়াবহ এই অরণ্য অঞ্চলে মানুষের যাতায়াত প্রায় নেই বললেই চলে।

পাখির দল তাই এত নির্ভয়। পক্ষীকূজনে মুখরিত গোটা বন। গাছে গাছে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কতরকমের পাখি। মাঝে মাঝে জলা। মানুষ সমান উঁচু শরবনে ঢাকা। কোথাও শরবন নেই। সাদা বক ডানা মেলে জল ছেড়ে উঠে পড়ছে গাড়ির শব্দে। এমনিতেই চঞ্চল হাঁড়িচাঁচার দল কিছুতেই স্থির থাকতে পারছে না গাছের ওপর। 'ক্যাঁক্-ক্যাঁক্-ক্যাঁক-ক্যাঁক-ক্যাঁ' করে চেঁচাতে চেঁচাতে লাফাচ্ছে ডাল থেকে ডালে। এক জায়গায় ১০০-১৫০ পাতিকাক পঞ্চায়েতি সভায় বসেছিল। দারুণ বাক্-বিতণ্ডার পর যেই তাড়া করে অপরাধীকে আঁচড়ে কামড়ে শাস্তি দেওয়া শুরু করেছে, ঠিক তখনি গাড়ি দেখেই কা-কা শব্দে চম্পট দিল চারিদিকে। একটা হাত দুই লম্বা বনবিড়াল লাফ দিয়ে উঠে পড়ল গাছের ওপর। রাস্তা পেরিয়ে গেল একপাল বুনো শুওর।

"হরিবল্! " মন্তব্য করলেন নকুল সাহা – "এরকম বিচ্ছিরি জংগল সুন্দরবনেও নেই।"

মুগ্ধ চোখে কিন্তু তাকিয়ে ছিল ভবশঙ্কর। চোখ না ফিরিয়েই বললে – "শিকারের উপযুক্ত জায়গা। অনেকদিন সে কাজটি হয়নি বলেই সংখ্যায় এত বেড়েছে। হায়না-টায়নাও নিশ্চয় আছে।"

"এককালে তো ভাল শিকারীই ছিলেন –" কথাটা শেষ করতে পারলেন না নকুল সাহা।

ঠান্ডা চোখে তাকাল ভবশংকর।

বলল – "এখনও আছি।"

মিনিট পনেরো পর দেখা গেল সিংহগড়ের ছোট তোরণ। পাতলা ইটের তৈরি। এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি পুরু। টেরাকোটার কাজ ছিল এককালে। এখনও আছে। কিন্তু তা ঢেকে গেছে সবুজ শ্যাওলায়। মাথার ওপর দিকটা ভেঙে পড়েছে।

এই তোরণ পেরিয়েই মূল গড়। একদা জলভরা পরিখা ছিল, এখন তা জলহীন শুষ্ক খাত। খাতের পাশেই ভাঙা দেওয়ালের স্তূপীকৃত ইটের ওপর মাটির পাহাড়। গড়ের প্রাচীর বলে চেনাই মুশকিল।

ঢিবি আকারে ভেঙে পড়া এই পাঁচিলের মাঝে রয়েছে মূল তোরণ। বিশাল। হাতি চলে যেতে পারে হাওদা সমেত। প্রস্থে প্রায় বিশ ফুট। লম্বায় তিরিশ ফুট তো বটেই। ভেতরে গাড়ি ঢুকতেই দেখা গেল মাথার ওপর খিলেনের ওপর ছাদ। প্রায় ছটা খিলেন ধনুকের মত বেঁকে ধরে রেখে দিয়েছে ভারী ইটের ছাদটাকে।

সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে বললেন নকুল সাহা – "আপনার মামার বংশ সত্যিই বীর ছিলেন বটে। জংগলের মধ্যে কেল্লাখানা কিরকম বানিয়েছেন বলুন।"

"নরানাং মাতুলক্রমঃ।" ভবশংকরের মন্তব্য।

"তা যা বলেছেন। মামার বাড়ির ধাত পেয়েছেন আপনিও। মল্লভূমের রক্ত যার ধমনীতে, এইরকম দুঃসাহস তাঁকেই মানায়।"

"দুঃসাহস ?

থতমত খেলেন নকুল সাহা – "এই মানে ...... জায়গাটা বড় নির্জন তো ......"

"বহু বছর এইখানেই কাটিয়েছি, নকুলবাবু।"

"তা ঠিক ...... তা ঠিক ...... কিন্তু থাকতে তো পারেননি শেষ পর্যন্ত। পালিয়ে না গেলে –"

দপ্ করে দুচোখ জ্বলে উঠল ভবশঙ্করের।

ভড়কে গিয়ে কথা ঘুরিয়ে নিলে নকুল সাহা – "এসে গেছে আপনার মামার বাড়ি।"

"দেখেছি।"

গাড়ি ব্রেক কষল যেখানে, ঠিক তার সামনেই নয়া দিল্লির পার্লামেন্ট হাউসের মত একটা বিশাল গোলাকার ইমারত। ছ ফুট অন্তর চতুষ্কোণ থাম। আগাগোড়া টেরাকোটার কাজ। পোড়া ইটের অপূর্ব কারুকাজ পুরোপুরি ঢেকে গেছে সবুজ শ্যাওলায়। সবুজ থামের সারি গোল হয়ে ঘিরে রেখেছে বিশাল প্রাসাদটাকে। স্তম্ভশ্রেণীর পরেই প্রায় পনেরো ফুট চওড়া দালান। তারপর সারি সারি দরজা।

দালান যেখানে শুরু হয়েছে, ঠিক সেইখান থেকেই পিরামিডের মত থাকে থাকে ইটের সাজ শুরু হয়ে উঠে গিয়েছে শীর্ষবিন্দুতে।

এ রকম বিচিত্র প্রাসাদ সচরাচর দেখা যায় না। বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চের সাদৃশ্য আছে কিছুটা – পুরোপুরি নয়। কেননা, পিরামিড সদৃশ গম্বুজে মাঝে মাঝে জানলা, দরজা, বারান্দা দেখা যাচ্ছে।

দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে ভগ্ন দেউল, একটা বিরাট প্রায় ছতলা উঁচু চতুষ্কোণ প্রাচীর সৌধ – চারপাশের দেওয়ালে দরজা জানলার বালাই নেই। লাল ইট সবুজ হয়ে গেছে শ্যাওলার আস্তরণে।

অবক্ষয়, দৈন্য আর অবহেলার স্বাক্ষর চারিদিকে।

গাড়ি থামতেই সবচাইতে কারুকাজ করা দরজা খুলে বেরিয়ে এল লিকলিকে লম্বা এক বৃদ্ধ। চুল বিলকুল সাদা। ভুরু বাইসনের শিংয়ের মত বাঁকানো, গোঁফও সাদা। কিন্তু শিরদাঁড়া সোজা। হেঁটে এল যুবকোচিত দৃপ্ত ভঙ্গিমায়। পরনে ধুতি। খালি গা। সটান এসে দাঁড়াল গাড়ির সামনে। নিজেই দরজা খুলে নেমে এল ভবশঙ্কর। অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে রইল বৃদ্ধের পানে। তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছে।

তীক্ষ্ণ চোখে ভবশঙ্করের দিকে চেয়ে আছে বৃদ্ধ।

ওদিকের দরজা খুলে নেমে এলেন নকুল সাহা।

বললেন সোল্লাসে – "হাঁ করে কি দেখছো রামহরি? চিনতে পারছো না দাদাবাবুকে?"

"দাদাবাবু!" হতভম্ব স্বরে বলে রামহরি যার নাম, সেই বৃদ্ধ।

"কী আশ্চর্য! যাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করলে মা মারা যাওয়ার পর থেকে – তাকে চিনতে এত সময় লাগে?"

"দাদাবাবু!"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাদাবাবু। রাজা ভবশঙ্কর মল্লিক। দশ বছর পর ফিরে

এসেছেন রাজার মত টাকার কুমীর হয়ে", বলেই জিভ কেটে কথা ঘুরিয়ে নেন নকুল সাহা – "আপনাকে বলিহারি যাই, স্যার। যার হাতে মানুষ হলেন, তাকে চিনতে পারছেন না?"

"রামহরি! এত বুড়িয়ে গেছো!" অন্যমনস্ক সুরেই বলে ভবশংকর। চাহনি তখনও বুঝি স্মৃতির ভারেই উদাস।

"তুমিও তো দাদাবাবু অনেক পালটে গেছো", থেমে থেমে বিমূঢ় স্বরে বলে রামহরি।

আস্তে আস্তে চাহনি স্বচ্ছ হয়ে আসে ভবশংকরের। রামহরির চোখে চোখ রেখে বলে মৃদু হেসে – "কতটা পালটেছি রামহরি?"

"ঠিক যেন সোলজার। শিরদাঁড়া সিধে করে এমনি ভাবে তো কখনো দাঁড়াতে দেখিনি তোমাকে।"

"আর কিছু?" হাসছে ভবশংকর।

"অবাক হচ্ছি তোমার সাহস দেখে। এত সাহস তো তোমার ছিল না। তোমার চোখে সাহস, তোমার হাসিতে সাহস। দুর্জন সিংহের রক্ত যার গায়ে, এত সাহস অবশ্য তাকেই মানায়। কিন্তু –"

"ছিল, রামহরি। মিথ্যে কলংক এড়াতে তা দেখাইনি। দশ বছর পরে ফিরে এলাম সাহস দেখিয়ে খুনী বদনাম ঘোচাতে।"

"মরবে ...... মরবে ...... এখানে থাকলে তুমি মরবে।"

"না, রামহরি। বাঁচব বলেই এসেছি ফিরে – সেই সংগে বেঁচে থেকেও যে মরে রয়েছে – বাঁচিয়ে তুলব তাকেও।"

জবাবটা এল আতীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠে – কারুকাজ করা দরজার কাছ থেকে।

"বেরোও ...... বেরোও ...... এখান থেকে! নইলে শিলাবতীর হাতেই খুন হবে তুমি! খুনী! খুনী! আমার ছেলের রক্তে হাত রাঙিয়েছে যে, তার ঠাঁই নেই এ বাড়িতে!"

বিষম ভ্যাবাচাকা খেয়ে বারকয়েক ঢোক গিললেন নকুল সাহা। বুকটাও ধড়ফড় করছে অসভ্যের মত। আইসোড্রিল ট্যাবলেটটা বার করবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময়ে দেখলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল রামহরি।

দাঁড়াল চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা রুদ্ররূপিনী বৃদ্ধার সামনে। বিধবা। সাদা চুল খোঁপা করে বাঁধা মাথার ওপর। গায়ের রঙও ধবধবে সাদা। কিন্তু চোখ দুটোয় যেন জ্বলছে দুটুকরো অংগার। ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা ছড়িয়ে আছে লোল চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে।

কড়া গলায় বললে রামহরি – "শকুন্তলা, এ বাড়ির মালিক তুমি নও – দাদাবাবু। তাকে বেরিয়ে যেতে বলার তুমি কে?"

"আমার ছেলেকে যে মেরেছে, তাকে ঢুকতে দেব না ...... কক্ষনো না ...... কক্ষনো না! যে শিলাবতীকে আমি কোলেপিঠে মানুষ করেছি, তার ধারেকাছেও ওকে আসতে দেব না ...... কক্ষনো না ...... কক্ষনো না! আমার শিলাবতীকে যে পাগলী বানিয়ে ছেড়েছে, তার সংগে এক বাড়িতে ওকে আমি থাকতে দেব না ...... কক্ষনো না ...... কক্ষনো না!"

টপ করে একটা আইসোড্রিল ট্যাবলেট জিভের তলায় রাখলেন নকুল সাহা। অবাধ্য হৃৎপিণ্ড বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে।

কুলিশকঠোর মূর্তি নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে বৃদ্ধার কাক-চিল তাড়ানো নাটকীয় চিৎকার শুনে গেল ভবশংকর।

চিৎকার থামিয়ে দিল কিন্তু রামহরি – "বৌদিমণিকে তুমি যেমন আঁতুড় থেকে মানুষ করেছো, আমিও তেমনি দাদাবাবুকে আঁতুড় থেকে মানুষ করেছি। আমি তাকে রেখে দেব এ বাড়িতে। দরকার হলে –"

এগিয়ে এল ভবশংকর। একহাত রাখল রামহরির কাঁধে। আর একহাত তুলে বাড়ির ভেতর দেখিয়ে বললে বজ্রনাদে – "হ্যাঁ, দরকার হলে তোমাকেই বেরিয়ে যেতে হবে এ বাড়ি থেকে। যাও, ভেতরে যাও। শিলাবতীকে খবর দাও আমি ফিরে এসেছি।"

চোখ কুঁচকে অনেকক্ষণ ভবশংকরের চোখের দিকে চেয়ে রইল শকুন্তলা। চোখের পাতা পড়ছে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ইস্পাত চাহনি, দেখছে পাথরকঠিন মুখ, দেখছে শালগাছের খুঁটির মত সিধে শক্ত দেহ।

বিড়বিড় করে বললে অনেকক্ষণ পরে – "সে তো ...... সে তো এরকম ছিল না! এ কে? ...... এ কে? ......এ কে?"

পেছন ফিরেই বাড়ির মধ্যে ছুটে মিলিয়ে গেল শকুন্তলা। শেষ স্বগতোক্তির ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি লহরীর পর লহরী তুলে ধেয়ে এল কিন্তু দরজার দিকে।

"এ কে? ...... এ কে? ...... এ কে?"

## ভবশংকর কি সত্যিই খুনী?

"তা হয় না, দাদাবাবু, ও ঘরে রাতে তোমাকে থাকতে দেব না কিছুতেই।"

কথা হচ্ছে সিংহগড় ভবনের একতলার একটি ঘরে। চতুষ্কোণ থাম দিয়ে ঘেরা গোলাকার ইমারতের তলার কিনারা ঘিরে সারি সারি ঘর। ইমারতের ঠিক মাঝখানে যেন একটা প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ থাম সোজা উঠে গেছে পিরামিডের মত চূড়ার শীর্ষদেশ পর্যন্ত। আসলে এটা থাম নয়। সংকীর্ণ সিঁড়ি গোল হয়ে ঘুরে উঠে গেছে ওপর দিকে। যেমনটি আছে অকটারলোনী মনুমেণ্ট অথবা কুতুবমিনারে। এককথায় বলা যায়, বাড়ির মধ্যে একটা চারকোনা মিনার। ওপর দিকে রশ্মিরেখার মত বারান্দা বেরিয়ে গেছে পিরামিড-ছাদের গা ফুঁড়ে। ফলে একতলার ঘরে হাওয়া খেলে ভাল – সব দিক থেকেই।

একতলার অগুন্তি ঘরের একটিতে দাঁড়িয়ে জোর গলায় কথা কাটাকাটি করছে রামহরি, দাদাবাবু ভবশংকরের সংগে। ঘরটি বসবার ঘর বা বৈঠকখানা। চওড়া জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সিংহগড়ের পর-পর দুটো তোরণ, দূরের ভাঙা দেউলের পর দেউল, আর সেই অদ্ভুত গড়নের চারকোনা ছ-তলা উঁচু ইটের পাঁজার মত বিচিত্র বস্তুটি। জেলখানার পাঁচিল যেন। না আছে জানলা, না আছে দরজা। সবুজ হয়ে রয়েছে শ্যাওলায়।

সাঁচিস্তূপ তো গোলাকার। এটা চারকোনা। নিরেট ইটের অতিকায় ছক্কা।

সেকেলে ঢাল তলোয়ার, তীর ধনুক, টাংগি বল্লম আর একেলে আমেরিকান এবং চেকোশ্লোভাকিয়ান পয়েণ্ট টু-টু রাইফেল দিয়ে সাজানো ঘরটার জানলার সামনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে ফের বললে রামহরি – "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে দাদাবাবু? ও ঘরের দেওয়ালে আর মেঝেতে কত যে চোরা দরজা আছে, তা কি তোমার জানা নেই? কতগুলোকে তুমি বন্ধ করবে ভেতর থেকে?"

"বন্ধ করব কে বলেছে?" জীর্ণ কোচে গা এলিয়ে বসে হাসিমুখে বললে ভবশংকর। পাশেই বসে উৎকৃষ্ট ব্র্যান্ডি সেবন করছেন নকুল সাহা। ব্র্যান্ডি হার্টের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী এবং দশ বছর ধরে দাদাবাবুর প্রিয় ব্র্যান্ডি পাতালঘরে রামহরি রেখে দিয়েছে শুনেই আনিয়েছেন একটা বোতল।

কিন্তু কী আশ্চর্য! রামহরির চোখ কপালে উঠে গেছে ভবশংকরের সুরায় অরুচি দেখে। সেই ভবশংকর! যে কিনা দশ বছর আগে প্রতি সন্ধ্যায় পুরো একটি বোতল সাবাড় করতো জল না মিশিয়ে – বোতলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে গেলাসে ঢেলে এগিয়ে দিয়েছে নকুল সাহাকে। নিজে পান করেনি একফোঁটাও।

সত্যিই পাল্টে গিয়েছে ভবশংকর! একেবারেই অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছে। বউয়ের চেয়ে মদকে যে ভালবাসত বেশি, সেই মদকে ত্যাগ করেই শুধু পাল্টে যায়নি – শিলাবতীর ঘরের পাশের ঘরে শুতে যাওয়ার অভিপ্রায়টা প্রকাশ করতেই রীতিমত আঁৎকে উঠেছে রামহরি।

রামহরি যে জানে ও ঘরের মত বিপজ্জনক ঘর আর নেই। সেই সেকেলে আমল থেকেই দুটি ঘরের মধ্যে অসংখ্য গুপ্ত পথের ব্যবস্থা রেখে গেছেন সিংহগড়ের নির্মাতা তাঁর কুশলী স্থপতিকে দিয়ে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় দুটি ঘর আলাদা। কিন্তু যে কেউ যখন খুশি যাতায়াত করতে পারে এ ঘর থেকে সে ঘরে। কোনো গুপ্তপথই বন্ধ করা যায় না কোনোদিক থেকেই।

সবাই জানে ভবশংকর জেনেশুনে গোড়া থেকেই জিদ ধরেছে ঐ ঘরেই রাত কাটাবে সে।

অথচ, রাতের অন্ধকারে ঐ ঘরেই খোলা ছুরি নিয়ে হানা দিয়েছিল শিলাবতী। ভবশংকর তখন ব্র্যান্ডির নেশায় অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। অন্ধকারে ছুরি মেরেছিল শিলাবতী। ভবশংকরের উরু ফুঁড়ে ফলা ঢুকে

গিয়েছিল বিছানায়।

পরের দিনই দেশত্যাগী হয় ভবশংকর। রক্তপাগল বউয়ের ছুরি একবার তার টুঁটি ফসকে গিয়েছে কপালক্রমে – দ্বিতীয় সুযোগ আর দেয়নি।

নিজেই সেই গল্প শোনাচ্ছিল নকুল সাহাকে। চোখ বড় বড় করে (এবং ব্র্যান্ডির গেলাসে চুমুক দিতে দিতে) কাহিনী শুনছিলেন অ্যাডভোকেট মশাই।

তারপরেই দুম করে বলে বসল ভবশংকর – "রামহরি, ঐ ঘরেই আজ থেকে শোব আমি।"

হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল রামহরি। বউয়ের ছুরির ভয়ে যে মানুষটা ভারত ছেড়ে চম্পট দিয়েছিল আমেরিকায়, সে কিনা আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে এসে থাকতে চায় নিশীথরাতের আতংকঘন ঐ ঘরেই! আমেরিকা দেশটা কি জাদুর দেশ? ভীতু ভবশংকরকে ভীমভবানী করে ছেড়েছে দশ-দশটা বছরে!

অতএব শুরু হয়েছে প্রবল আপত্তি। প্রাণ থাকতে দাদাবাবুকে সে ও ঘরে থাকতে দেবে না – কিছুতেই না।

তারপর এখন বলে কিনা, গুপ্তপথ খোলা রেখেই ঘুমোবে! বন্ধ করবে না! বন্ধ করতে চাইলেও তো বন্ধ করা যায় না – তাও তো জানে ভবশংকর।

"গোঁয়ার্তুমি করতে যেও না দাদাবাবু। এই দশ বছরে হেন রাত বাদ যায়নি যে রাতে বৌদিমণি ছুরি নিয়ে ও ঘরে যায়নি। প্রতি রাতে খুঁজেছে তোমাকে। খুঁজবে আজকেও – হারামজাদি শকুন্তলা উসকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।"

নিরীহ মুখে ভবশংকর বললে – "শুনলেন নকুলবাবু?"

"অ্যাঁ? কি …… কি শুনলাম?"

"শুনলেন না রামহরি বলল শকুন্তলাই উসকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে শিলাবতীকে?"

"বলল নাকি? তাই বলল? ভারী অন্যায়, ভারী অন্যায় …… ইন্ডিয়ান পেন্যাল কোডের …… কত ধারা যেন? দূর ছাই, সব গুলিয়ে গেল।"

"মনে করতে আপনাকে বলছি না, শুধু শুনে রাখুন – আমাকে খুন করতে আমার স্ত্রীকেই উসকে দেয় তার ধাই মা। কারণটা আমরা সবাই জানি। শকুন্তলার ধারণা, তার ছেলেকে খুন করেছি আমি। আর আমার রক্তাক্ত মূর্তি দেখেই নাকি পাগল হয়ে গেছে তার আদরের শিলাবতী।"

কিন্তু-কিন্তু করে বললে রামহরি – "রাগ করো না, দাদাবাবু। ধারণাটা যদি ভুলই হবে তো তুমি পালিয়ে গেলে কেন?"

"রাগ করব কেন রামহরি?" হাসিমুখে বললে ভবশংকর – "আমি যে খুন করিনি – এই কথাটাই তোমরা কেউ বিশ্বাস করতে পারোনি। মনে বড় চোট পেয়েছিলাম। তাই চলে গেছিলাম।"

"সে রাতটার কথা মনে করে দ্যাখো দাদাবাবু, তোমার সারা গায়ে মুখে রক্ত, হাত ভাঙা – ছুটতে ছুটতে এলে ঠিক এই ঘরটাতে। বৌদিমণি তখন বসেছিল ঐ কোচটায় – যে কোচে এখন তুমি বসে আছো। ছিটকে উঠে বৌদিমণি বলেছিল – এ কী! কাকে খুন করে এলে? তুমি চিৎকার করে বললে – তোমাকে বিয়ে করার জন্যে যে পাগল হয়েছিল – তাকে …… তাকে …… তাকে! – মনে পড়ে?"

স্মিত মুখেই বললে ভবশংকর – "বেশ মনে পড়ে। কিন্তু তারপর কি বলিনি, শকুন্তলার ঐ গুণধর পুত্রটি, যে কিনা স্কুলমাস্টার ছাড়া আর কিছুই নয়, ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় অন্ধকারে ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপরেই?"

"বলেছিলে, কিন্তু প্রমাণ তো করতে পারোনি।"

"কি করে প্রমাণ করব, রামহরি? হতভাগাকে সেই রাত থেকে তো আর দেখাই যায়নি।"

"দাদাবাবু, সেইটাই তো বড় প্রমাণ যে খুন করেছো তুমিই? লাশ পর্যন্ত লুকিয়ে ফেলেছো?"

"রামহরি, তুমিও?"

"দাদাবাবু, তুমি যে বংশের ছেলে, সে বংশে খুন-টুন সবাই করেছে, তুমিও না হয় করলে – পালিয়ে যাবে কেন?"

"রামহরি, খুন আমি করিনি।"

"তাহলে সুবোধ ব্যাটাচ্ছেলে গেল কোথায়?"

"সেই রহস্য ভেদ করব বলেই তো ফিরে এলাম, রামহরি। আমি খুনী, এই মেণ্ট্যাল শক থেকেই তো পাগল হয়েছে শিলাবতী?"

"তা তো বটেই।"

"আমি যে খুনী নই, তা প্রমাণ করে দিলেই আবার ভাল হয়ে উঠবে শিলাবতী।"

"পারবে না, দাদাবাবু, পারবে না। দুটো কারণে পারবে না।"

এই প্রথম হাসি মিলিয়ে গেল ভবশংকরের মুখ থেকে।

"কারণ দুটো কি, রামহরি?"

"প্রথম কারণ ঐ ডাইনি শকুন্তলা। অষ্টপ্রহর বৌদিমণির কানে বিষ ঢালছে। ওকে বাড়ি থেকে না তাড়ালে পারবে না। তাড়াতেও পারবে না। বৌদিমণি ছাড়বে না।"

"দু নম্বর কারণটা?"

"দু নম্বর কারণটা?" বলতে বলতে মুখচ্ছবি পাল্টে গেল রামহরির। নিঃসীম আতংক ফুটে উঠল চোখেমুখে। এতক্ষণ কথা বলছিল জোরে, জোরে, এবার স্বর নেমে এল খাদে। বললে ফিসফিস করে – "রোজ রাতে সুবোধের প্রেতাত্মা যে আসে!"

"সুবোধের প্রেতাত্মা!" সোজা হয়ে বসল ভবশংকর।

"রোজ রাতে আসে …… রোজ রাতে আসে দাদাবাবু …… আসে বৌদিমণির জানলার তলায় …… অমানুষিক হাহাকারে আকাশবাতাস ফালাফালা করে দিয়ে মিলিয়ে যায় হাওয়ায়!"

ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল ভবশংকর।

নকুল সাহার হাত থেকে ব্র্যান্ডির গেলাস পড়ে গেছে মেঝেতে!

## প্রেতাত্মার হাহাকার

জেনারেটর বন্ধ হয়েছে অনেক আগেই – রাত দশটায়।

এখন রাত একটা। জানলার সামনে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে ভবশংকর। নিথর। নিস্পন্দ। তাকিয়ে আছে বাইরের অরণ্যের দিকে। অমাবস্যার অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। আকাশ মেঘলা। তারার আলোও নেই।

মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে নিশাচর প্রাণীদের হাঁকডাক। পেঁচার ঘুৎকার। প্রাণ ফিরে পেয়েছে রাতের অরণ্য। নিষ্প্রাণ হয়ে রয়েছে যেন সিংহগড় ভবন।

পেল্লায় এই শ্মশানপুরীতে মাত্র তিনটি প্রাণী প্রাণের ধুকপুকুনি টিকিয়ে রেখেছিল। এই দশটি বছর – শিলাবতী, শকুন্তলা আর রামহরি।

আর কেউ টিকতে পারেনি। কেউ না। শুধু ঐ প্রেতাত্মার ভয়ে। অশরীরী সুবোধ হানা দেয় প্রতিরাতে। হাহাকার করে যায় শিলাবতীর জানলার নিচে। বহুবার টর্চ নিয়ে ছুটে গেছে রামহরি।

কিন্তু দেখতে পায়নি কাউকেই।

হানাবাড়ির মতই তাই এই বাড়ি পরিত্যক্ত। অরণ্য অঞ্চলকে পর্যন্ত এড়িয়ে চলে আশেপাশের লোকজন। অতৃপ্ত আত্মা নাকি টহল দিয়ে বেড়ায় বনের মধ্যেও।

ভুতুড়ে বনের মধ্যে ভুতুড়ে বাড়িতে আজ এসেছে আরও তিনটি প্রাণী – ভবশংকর, নকুল সাহা আর ড্রাইভার।

বিদেহীর আবির্ভাবের কাহিনী শোনবার পর হৃদরোগী নকুল সাহার হৃৎকম্পন অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় রামহরি শয্যা রচনা করেছে তাঁর ঘরে।

কিন্তু ভবশংকর একাই রাত কাটাচ্ছে এই ঘরে – অভিশপ্ত এই ঘরে।

টর্চ জ্বালাল ভবশংকর। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল দেওয়াল আর মেঝে। প্রতিটি দেওয়ালেই একাধিক কুলুঙ্গি। দেড় ফুট বাই তিন ফুট। এত কুলুঙ্গি রাখার কোনো মানে হয় না। প্রতিটি কুলুঙ্গিই শূন্য।

কিন্তু ঐগুলোই তো গুপ্ত পথের চোরা দরজা। খোলবার কৌশল যে জানে, চকিতে সুড়ঙ্গপথে অদৃশ্য হতেও সে জানে।

ভবশংকর জানে না সেই কৌশল। জানে না অতগুলো কুলুঙ্গির মধ্যে সব কটাই গুপ্তপথের প্রবেশমুখ কিনা। জানে না, ঠিক কোন পথ দিয়ে অমানিশার অন্ধকারে হানা দেবে উন্মাদিনী শিলাবতী।

নিরুপায় ভবশংকর। কিন্তু ভয়াতুর নয়।

টর্চটা নিভিয়ে দিয়ে তাই শুয়ে পড়ল উঁচু পালংকে। ঘরের ঠিক মাঝখানে। দেওয়াল চারটের দূরত্ব পালংক থেকে হাত দশেক তো বটেই। পায়ের শব্দেও সতর্ক হওয়া যাবে। হাতের কাছেই রইল টর্চ। সংগে সংগে জ্বালিয়ে নিয়ে দেখা যাবে শিলাবতীকে। হাতে যার রক্তলোলুপ নগ্ন ছুরিকা। হৃদয়ে শোণিত তৃষ্ণা – নিজের স্বামীর রুধির ধারায় স্নান করার অদম্য বাসনা।

মাথার তলায় দুহাত দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল ভবশংকর। আলগা করে ফেলে রেখেছে নেটের মশারি। যাতে চট করে বেরিয়ে আসা যায়। অসাধারণ রূপসী শিলাবতীর রক্তপাগল মূর্তিটাকে ভাল করে দেখা যায়।

রূপসীই ছিল বটে শিলাবতী। এখনও কি আছে? সুদীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধানে এখনও কি সারা অংগে ঝরে পড়ে সেই লাবণ্য, সেই মাধুর্য, সেই স্নিগ্ধ দ্যুতি – যা দেখে দশ বছর আগে পাগল হয়েছিল ভবশংকর মল্লিক? ঐশ্বর্যের বিনিময়ে ঘরণী করে নিয়ে তুলেছিল এই প্রাসাদপুরীতে?

সুবোধ ...... স্কুল মাস্টার সুবোধও মনে মনে যাচ্ঞা করেছিল তাকে। কিন্তু মুখ ফুটে বলার আগেই ফোটা ফুলটাকে তুলে নিয়ে এসেছিল ভবশংকর। সংগে এসেছিল সুবোধেরই মা – শিলাবতীর ধাই মা।

তারপর থেকেই মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয় সুবোধের। রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ে গাছের ডাল থেকে ভবশংকরের ঘাড়ে।

হাত ভেঙে গিয়েছিল ভবশংকরের প্রথম চোটে। কিন্তু এড়িয়ে যায় ছুরির কোপ। ছিনিয়েও নিয়েছিল ছুরি – অক্ষত দেহে অবশ্য নয়। অন্ধকারে সুবোধও কি অক্ষত ছিল? নিশ্চয় না। অত রক্ত ভবশংকরের গায়ে লেগেছিল সেই কারণেই।

নিশ্চয় মারাত্মক জখম হয়েছিল সুবোধ। গোঙানি শুনেই ছুরি ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল ভবশংকর।

এবং তার সেই করাল রুধিরপ্লাবিত মূর্তি দেখেই আর বিকট চিৎকার শোনার সংগে সংগে জ্ঞান হারিয়েছিল নরম প্রকৃতির শিলাবতী।

নামেই যে শিলাবতী – শিলার মত কঠিন হিয়া তার নয় মোটেই। অন্তত ছিল না দশ বছর আগে।

কিন্তু এখন শিলাবতী সত্যিই যেন শিলা দিয়ে গড়া মানবী – রক্তের বদলে রক্ত না নেওয়া পর্যন্ত শিলাবতীর শিলা গলবে না কিছুতেই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ভবশংকর। কোথাও যেন ডেকে উঠল একটা তক্ষক। ঠিক-ঠিক-ঠিক-ঠিক করে সায় দিল দেওয়ালের টিকটিকি।

ঘুমিয়ে পড়ল ভবশংকর। ধকল কম যায়নি সারাদিন। কাঁহাতক আর চোখ মেলে থাকা যায়!

ঘুম ভেঙে গেল একটা তীব্র যন্ত্রণায়।

শীতল ইস্পাতের সূচীতীক্ষ্ম অগ্রভাগ ঢুকে রয়েছে কণ্ঠদেশে – চামড়া ভেদ করেছে – কণ্ঠদেশ এখনো ছিন্ন হয়নি।

যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙেছে সেই কারণেই। কিন্তু নড়বার উপায় নেই। মাথার তলা থেকে হাত দুটো টেনে আনাও সম্ভব নয়। তৎক্ষণাৎ ছুরির ফলা আমূল ঢুকে যাবে গলার মধ্যে।

চেয়ে থাকার উপায়ও নেই। চোখের ওপর পড়েছে জোরালো টর্চের আলো।

চোখ বন্ধ করেই কাঠ হয়ে শুয়ে রইল ভবশংকর। মুখের একটা পেশীও কাঁপল না। যন্ত্রণার সামান্য বিকৃতি ছাড়া।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অনেকেই নির্বিকার হয়ে যেতে পারে এইভাবে। পারে এই ভবশংকরও।

টর্চের আলো স্থির হয়ে রয়েছে মুখের ওপর। ছুরির ফলা ঢুকে রয়েছে চামড়ার মধ্যে – রক্ত গড়াচ্ছে টের পায় ভবশংকর – কিন্তু নড়ছে না।

স্টীল নার্ভ বটে। ইস্পাতের স্নায়ু।

বিস্মিত হল ছুরি যার হাতে – রাতের সেই আততায়ীও।

বললে সাপের হিসহিসানির মত চাপা গলায় – "নড়বে না – গলা দু টুকরো করে দেব। আগে দেখি ...... ভালো করে দেখে নিই ...... তারপর ......!"

দেখুক শিলাবতী। ভাল করেই দেখুক। তারপর যা প্রাণ চায়, তাই করুক।

চোখ বুজে রইল ভবশংকর।

কানে ভেসে আসছে উত্তেজিত নিঃশ্বাসের শব্দ।

আচমকা ছুরির ফলা বেরিয়ে গেল চামড়ার মধ্য থেকে। নিভে গেল টর্চের আলো। মেঝের ওপর শোনা গেল লঘু চরণে ছুটে যাওয়ার শব্দ।

নিমেষে সিধে হয়ে বসল ভবশংকর। টর্চটা হাতড়ে তুলে নিয়েই টিপল বোতাম। ঘর ভেসে গেল পাঁচ ব্যাটারীর জোরালো আলোয়।

ঘর শূন্য। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে উন্মাদিনী শিলাবতী।

থ হয়ে বসে রইল ভবশংকর। রক্ত গড়িয়ে পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে বুক। খেয়াল নেই। আর ঠিক সেই সময়ে ...... আচম্বিতে ......

নিশীথরাতের নৈঃশব্দ্য খানখান্ হয়ে গেল একটা অপার্থিব হাহাকারে। একটা আর্তীব্র আর্তনাদে। একবার ...... দুবার ...... তিনবার। শিহরিত হল রজনী। দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল অমানুষিক সেই বিলাপের প্রতিধ্বনি যেন নরককুণ্ড ভেদ করে উঠে আসা রক্ত জল করা ভয়াল শব্দলহরী।

"দাদাবাবু! দাদাবাবু!"

দুম্ দুম্ করে ধাক্কা পড়ছে দরজায়। বাইরে চেঁচাচ্ছে রামহরি।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল ভবশংকর।

লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে রামহরি। পাশেই নকুল সাহা। স্পষ্টত কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে, দুচোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে।

লণ্ঠন তুলে ধরল রামহরি। আঁৎকে উঠল ভবশংকরের রক্তমাখা গলা আর বুক দেখে। ফর্সা, চওড়া, নগ্নবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে টকটকে লাল শোণিত স্রোত।

কণ্ঠস্বর কিন্তু নির্বিকার। নিরুত্তেজ।

"কার চিৎকার, রামহরি?"

"সুবোধের। কিন্তু এ কী ...... দাদাবাবু?"

"তোমার বৌদিমণির কাণ্ড, রামহরি। কিন্তু প্রাণে মারল না কেন বলো তো?"

কারণটা জানা গেল পরের দিন সকালে।

## ভবশংকর নিহত হল না কেন?

ভোরের রোদ এসে পড়েছে বৈঠকখানায়।

মেহগনী কাঠের কারুকাজ করা কেদারায় বসে ভবশংকর আর নকুল সাহা।

ভবশংকরের গলায় স্টিকিং প্লাসটার। মুখভাব নির্লিপ্ত। কিন্তু ভীষণ এক্সাইটেড নকুল সাহা। যা তাঁর মত দুঁদে উকিলকে মানায় না মোটেই।

যতরকম যুক্তি আছে তাঁর যুক্তির তূণে, সবগুলোই একে একে নিক্ষেপ করেছেন এতক্ষণ ধরে। কিন্তু টলাতে পারেননি গোঁয়ার গোবিন্দ ভবশংকরকে।

না। সিংহগড় ছেড়ে কলকাতা কেন, বিষ্ণুপুরের টুরিস্ট লজেও যাবে না ভবশংকর।

কেন যাবে না? প্রাণ আগে না ......!

এ কান দিয়ে শুনছে ভবশংকর, বার করে দিচ্ছে ও কান দিয়ে। চুপচাপ এতক্ষণ খেয়েছে রামহরির আনা ব্রেকফাস্ট। কফির পেয়ালাও শেষ হয়েছে। এখন অগ্নিসংযোগ করেছে ডানহিল নাম্বার ফোরে।

কানের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে সুমিষ্ট কিন্তু কঠিন সেই নারীকণ্ঠ – "নড়বে না – গলা দু টুকরো করে দেব। আগে দেখি ...... ভাল করে দেখে নিই ...... তারপর ......!"

তারপর চলে গেল সে। এসেছিল নিঃশব্দে – গেল কিন্তু চঞ্চল চরণে। তারপরেই রজনীর নৈঃশব্দ্য বিদীর্ণ হয়ে গেল অমানুষিক অপার্থিব হাহাকারে। পরলোক থেকে এসে বুক চাপড়ানোর মত শব্দে ককিয়ে উঠে পরলোকেই ফিরে গেল সুবোধের অতৃপ্ত আত্মা।

সরীসৃপের মত এঁকেবেঁকে ধোঁয়ার রেখা উঠছে ডানহিল নাম্বার ফোর থেকে।

কানের কাছে অনর্গল যুক্তিজাল বিছিয়ে চলেছে নকুল সাহা।

ভবশংকরের মগজের মধ্যে কিন্তু অনুরণিত হয়ে চলেছে মাঝরাতের শেষ ক'টি কথা – "...... আগে দেখি ...... ভাল করে দেখে নিই ...... তারপর ......!"

কি দেখেছে শিলাবতী? কি দেখে ছুরির ডগা রক্তে ভিজিয়ে নিয়েও পালিয়ে গেল চক্ষের নিমেষে? বিফল মনোরথ প্রেতাত্মা কি সেইজন্যেই হাহাকার করে উঠল প্রায় সেই মুহূর্তেই?

সংবিৎ ফিরল কাংস্যকণ্ঠের আওয়াজে। চোখ ফেরাল ভবশংকর। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে শকুন্তলা। যেন একটা সাদা পাথরের মূর্তি। চোখমুখ মার্বেলের মত কঠিন।

"শিলাবতী ডাকছে তোমাকে।"

"চল", যেন তৈরি হয়েই ছিল ভবশংকর। উঠে দাঁড়াল ডানহিল কামড়ে।

যেন জল পড়ল নকুল সাহার কথার তুবড়িতে – বোবা মেরে গেলেন তৎক্ষণাৎ।

শকুন্তলার পেছন পেছন শিলাবতীর ঘরে ঢুকল ভবশংকর।

এ ঘরেও পালংক পাতা ঘরের ঠিক মাঝখানে। এ ঘরেও সকালের রোদ হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে ঘরের মেঝেতে।

কিন্তু হাসছে না পালংকে আসীন মোমের পুতুলের মত নারীমূর্তিটি। অপলকে চেয়ে আছে ভবশংকরের মুখের দিকে। চোখ নেমে এল গলার স্টিকিং প্লাস্টারের ওপর। আবার ফিরে গেল দুই চোখের দিকে।

পাতা পড়ছে না সে চোখ দুটিতেও। অনিমেষে দেখছে মোম-সুন্দরীকে।

মোম দিয়েই গড়া যেন মুখখানা। সাদা মোম। রক্তের আভা নেই। লম্বা বেণী ঘাড়ের ওপর দিয়ে এসে এলিয়ে রয়েছে বুকের ওপর। সরু সরু আঙুল দিয়ে বেণীর অগ্রভাগ পাকিয়ে চলেছে অবিরাম। চঞ্চল আঙুল। স্নায়ু অস্থির। হাল্কা হলুদ রঙের শাড়ি আর সাদা ব্লাউজ সোনালী রোদে যেন প্রভা বিকিরণ করছে অংগ ঘিরে।

দু পা মুড়ে বসে মোমসুন্দরী চেয়ে রইল ঠিক এইভাবেই দশ বছর পরে ফিরে আসা একদা পলাতক স্বামীর দিকে।

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে সহজ গলায় বলল ভবশংকর – "ডাকা হয়েছে কেন?"

হাতের ইশারায় শকুন্তলাকে বাইরে যেতে বলল রোগশীর্ণা শিলাবতী।

বেরিয়ে গেল শকুন্তলা। খুশিমনে যে নয়ই, তা বোঝা গেল যাওয়ার ধরন দেখেই।

গলার মধ্যে যেন নূপুরনিক্বণ বাজিয়ে বললে শিলাবতী – "বসবে না?"

"না।"

"রাগ হয়েছে?"

"না।"

"কাল রাতে তোমাকে খুন করতে গিয়েও খুন করলাম না কেন, জানতে ইচ্ছে করছে না?"

"না।"

"কেন ফিরে এলে, তাও বলবে না?"

"না।"

"এতদিন পরে দেখা হল, আমি কিরকম আছি জানতে চাইবে না?"

"না।"

হেসে উঠল শিলাবতী। যেন নাচের মহড়া দিয়ে নিল গলার নূপুর।

"আমি পাগল, তাই না?"

এবার একটু থেমে বললে ভবশংকর – "না।"

"সে কি গো! দুনিয়ার লোক আমাকে পাগলী বলে, তুমি বলবে না?"

"দুনিয়ার লোক তোমাকে পাগলী বানিয়ে রেখেছে।"

"কি করে বুঝলে?"

"তোমার চোখ দেখে।"

"কি দেখছো চোখে?" বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে কৌতুকতরল কণ্ঠে বলে শিলাবতী।

"আর যাই থাক, পাগলামির ছায়া নেই।"

"এত বোকো তুমি?"

"না বুঝলে জেনেশুনে ঐ ঘরে শুতে যেতাম না।"

"তবে কাপুরুষের মত পালিয়েছিলে কেন?"

"কেন, সেটা যথাসময়ে বুঝবে।"

"আমার বোঝা হয়ে গেছে।"

"কি বুঝেছো?"

"তুমি আমার স্বামী নও।"

ভবশংকর নিশ্চুপ।

আবার নূপুর বাজল শিলাবতীর গলায় – "কিগো, এবার তো কই না বলতে পারলে না?"

ভবশংকরের মুখে কথা নেই।

"কাল রাতে ঐ জন্যেই তো মারলাম না তোমাকে। এত সাহস আমার স্বামীর ছিল না। হ্যাঁগো, সে কোথায়?"

ভবশংকর নীরব।

"বলো না, কাউকে বলব না। মরে গেছে?"

ডানহিল মুখে দিল ভবশংকর।

"ভালই হয়েছে। কাউকে বলব না। কেউ ধরতে পারেনি। আমি কিন্তু ঠিক ধরেছি। আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি – তুমি আমার স্বামী নও, স্বামী নও, স্বামী নও।"

বলে দুষ্টুমি ভরা চোখে চেয়ে রইল শিলাবতী।

শেষ কথাটা বলল ফিস ফিস করে – "তবুও তোমায় ভালবাসি ...... ভালবেসেছি কাল রাত থেকেই।"

## গুমঘর

"শাবাশ, দাদাবাবু, হাতের টিপ এখনও আগের মতই, রাইফেল পর্যন্ত বাগিয়ে ধরেছ আগের মত! কে বলে তুমি আমার দাদাবাবু নও!"

ক্যাঁক-ক্যাঁক-ক্যাঁক-ক্যাঁক-ক্যাঁ শব্দে নিস্তব্ধ বন সচকিত করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল হাঁড়িচাঁচাগুলো। একটা পাখি ধপ করে এসে পড়ল রামহরির পায়ের কাছে।

ভারী চেকোশ্লোভাকিয়ান রাইফেলটা নামিয়ে ভবশংকর বললে – "কেউ তা বলে বুঝি?"

"বলার লোক তো একজনই।"

"শকুন্তলা?"

"হ্যাঁ। বিদেয় করো না ওটাকে বাড়ি থেকে।"

"তুমি তো বললে বৌদিমণি ছাড়বে না।"

"শকুন্তলা তাই বলে, দাদাবাবু। কিন্তু আমি তো জানি –"

গাছের ডালে হঠাৎ একটা বনবেড়াল দেখেই সংগে সংগে রাইফেল তুলে ফায়ার করে ভবশংকর। নিশানা বটে। রক্তাক্ত দেহটা আছড়ে পড়ে নিচে। খুলি গুঁড়িয়ে গেছে।

"ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেছে দাদাবাবু। দাও, নতুন ম্যাগাজিন দিই।"

"থাক, রামহরি – দশটা খুনই একদিনে যথেষ্ট। কিন্তু তুমি কি যেন বলছিলে?"

"বৌদিমণি দু চক্ষে দেখতে পারে না ঐ ডাইনিকে। কিন্তু যেন তুক করেছে – তা ছাড়া একা একা থাকেই বা কি করে ...... তুমি যখন এসে গেছ –"

"চল, ফেরা যাক। বারোটা বেজে গেল – নকুলবাবু ছটফট করছেন ...... কিন্তু আমি তো এখানে বারোমাস থাকতে আসিনি, রামহরি।" রাইফেলটা রামহরির হাতে দিয়ে জংগল ভেঙে সিংহগড়ের দিকে যেতে যেতে বলল ভবশংকর।

"সে কী!" চোখ কপালে তুলে ফেলে রামহরি – "এতদিন পরে এসেই আবার যাবে কোথায়?"

"কলকাতায়। অনেক কাজ সেখানে। ভাবছি তোমার বৌদিমণিকেও নিয়ে যাব সংগে। চিকিৎসা দরকার, পরিবেশ পালটানো দরকার।"

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একপাল বুনো শুওর পালালো পাশের ঝোপ থেকে। এক ঝাঁক টিয়া উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। অরণ্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে দুর্দান্ত শিকারী ভবশংকরের আবির্ভাবে।

"সে তো ভালই, দাদাবাবু – ডাইনি শকুন্তলাটাকে বিদেয় করে যেও যাবার আগে। কবে যাবে?"

"সুবোধের প্রেতাত্মার আগে একটা হিল্লে করি – তারপর!"

দাঁড়িয়ে গেল রামহরি – "দাদাবাবু, নিজের কানেই তো শুনলে কাল রাতে ...... ওকে ঘাঁটাতে যেও না।"

"দাঁড়ালে কেন? চলো। রামহরি, সুবোধের প্রেতাত্মা, শিলাবতীর পাগলামি আর আমার খুনী নামের অপবাদ – এই তিনটেই এক সুতোয় গাঁথা। একটা রহস্যের জট খুললেই – সব কটার খুলে যাবে।"

"কিন্তু ভূতপ্রেত নিয়ে –"

"ভূত! কার ভূত? সুবোধের? লাশই পাওয়া গেল না, ভূত হয়ে গেল?"

"হায়নায়-টায়নায় খেয়ে নিয়েছে হয়ত।"

"হাড়গোড় পর্যন্ত পড়ে রইল না? অনেক তো খোঁজা হয়েছিল – ঝোপঝাড় ঠেঙিয়েও তো আধখাওয়া লাশ পাওনি।"

আমতা আমতা করে রামহরি বললে – "ঐ জন্যেই তো শকুন্তলা বলে লাশ লুকিয়ে ফেলেছো তুমি।"

"শকুন্তলা বলে, তাই না? শকুন্তলা বলে!" চোখ জ্বলে ওঠে ভবশংকরের – "শিলাবতীকেও নিশ্চয় তাই বুঝিয়েছে?"

"তা তো বটেই।"

সিংহগড়ের তোরণ পেরিয়ে এল দুজনে। প্রথম তোরণের পর দ্বিতীয় তোরণ। ভবশংকর নীরব। কি যেন ভাবছে। অদূরে বিশালকায় সেই ইটের স্তূপ – চারকোনা।

থমকে দাঁড়ায় ভবশংকর।

"শ্যাওলায় সবুজ হয়ে গেছে যে, রামহরি – সাফসুতরো করা দরকার।"

"কেউ করবে না, দাদাবাবু। লোক পাবে না।"

"কেন?"

"গুমঘরের ধারেকাছেও কেউ যাবে না। তোমার মামারা, তাঁদের বাপঠাকুর্দারা কত মানুষ গুম করেছে ওখানে, তার হিসেব তুমিও জানো না, দাদাবাবু। চারশ বছর ধরে গুমঘরে তাদের প্রেতাত্মা আটকে আছে।"

হেসে ফেলে ভবশংকর – "তোমার মুন্ডু। প্রেতাত্মাদের কেউ আটকে রাখতে পারে না।"

"হেসো না, দাদাবাবু, হেসো না। আরও কটা রাত থাকো – ভূতের কান্না শুনতে পাবে গুমঘরের মধ্যে।"

"ভূতের কান্না?" থমকে দাঁড়ায় ভবশংকর।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভূতের কান্না। চারদিকের দেওয়ালে তো ফুটোফাটাও নেই – কান্নাটা গুম গুম করে উঠে যায় আকাশের দিকে ...... এই দ্যাখো, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার", – হাত বাড়িয়ে দেয় রামহরি। সত্যিই লোম খাড়া হয়ে গেছে।

"চলো তো কাছে গিয়ে দেখি।"

"যেও না, দাদাবাবু, যেও না – কেউ যায় না –"

"ধ্যাৎ! এসো। মই-টই যোগাড় করতে পারবে?"

"কি করবে?"

"উঠে গিয়ে দেখবো কি আছে গুমঘরে।"

"কিচ্ছু নেই, দাদাবাবু, হাড়গোড় ছাড়া। তেনাদের হাড়গোড়।"

"কিন্তু ভেতরে ফেলা হল কি করে? সিঁড়ি তো নেই।"

গুমঘরের সামনে ঢিবির নিচে দাঁড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে শ্যাওলাসবুজ ইটের দিকে অন্যমনস্ক চোখে চেয়ে শুধোয় ভবশংকর।

"যাচ্চলে! সব ভুলে মেরে দিয়েছো? লোহার সিঁড়ি তো ছিল দাদাবাবু। দলমাদল কামান যে লোহায় তৈরি – সেই লোহার সিঁড়ি। ঐ তো ওখানে পড়ে আছে। বড় দুষ্টু ছিলে তুমি – যখন তখন ওপরে উঠতে – তোমার বড় মামাই তো খুলে রেখে দিল।"

"ও হ্যাঁ ...... ভুলেই গেছিলাম। সে কী আজকের কথা রামহরি?" অন্যমনস্কভাবে সবুজ দেওয়ালের দিকে চেয়ে থেকে যেন আত্মগত সুরে বলে ভবশংকর – "দূরবীনটা দাও তো।"

"দিই।" ঝোলার মধ্য থেকে বায়নাকুলার বার করে দেয় রামহরি – "কি দেখবে?"

"দেওয়ালগুলো। এত প্রাচীন একটা জিনিস – মেনটেন করাই হচ্ছে না – দেখি ফেটেফুটে গেল কিনা – আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে।"

"দেখো।"

প্রায় পনেরো ফুট উঁচু মাটির ঢিপিটার তলা দিয়ে এক পাক ঘুরে এল ভবশংকর চোখে বায়নাকুলার লাগিয়ে। ঘাড় বেঁকিয়ে প্রায় ছতলা উঁচু বিশাল নিরেট দেওয়ালের প্রতিটি ইট যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ঝাড়া আধঘন্টা ধরে। ঝোলা আর রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে সাদা গোঁফে তা দিতে দিতে সকৌতুকে দাদাবাবুর কান্ড দেখে গেল রামহরি। ছেলেবেলায় কম দুষ্টুমি করেছে! গুমঘরের ওপরে ওঠার কৌতূহল এখনও যায়নি।

"হল?" বায়নাকুলার নামিয়ে ভবশংকর ফিরে আসতেই হাসিমুখে বললে রামহরি।

হাসল ভবশংকরও তবে হাসিটা যেন কেমনতর।

কথা বলল যেন অন্য কথা চিন্তা করতে করতে – "ওপরে উঠলেই ভূতে ঘাড় মটকে দেবে, রামহরি, তাই না?"

সাদা চুল আর সাদা গোঁফের সংগে ম্যাচ করা সাদা দাঁতের বাহার দেখিয়ে হেসে ফেলল রামহরি – "যা ডাকাবুকো ছিলে তুমি – এটুকু বয়সে ভূতে ঘাড় মটকাতে যখন পারেনি – এখনও পারবে বলে মনে হয় না। তবে ও সব হাংগামায় যেও না, দাদাবাবু। অপদেবতাদের বিশ্বাস নেই।"

[এরপর ৬৪ পাতায় দেখুন]

[উপন্যাস নকল নবাব : ৬১ পাতার পর]

## অপদেবতার সঙ্গে টক্কর

"রামহরি, তোমার বৌদিমণিকে ডাক্তার দেখানো হয়নি অ্যাদ্দিন?"

ভবশংকর প্রশ্নটা করল দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই। মেঝেতে আসন বিছিয়ে খেতে বসে, ভারী খুশি নকুল সাহা। তাঁর মতে, বাঙালি প্রথায় বাঙালি খানা খেলে নাকি পেট ভরে ভালমন্দ খাওয়া যায়। টেবিলে বসে সাহেবিয়ানাই হয় – খাওয়া হয় না।

এঁটো থালা বাসন তুলতে তুলতে বললে রামহরি – "কেন হবে না? বিষ্ণুপুর থেকে আমিই তো মাঝে মাঝে নিয়ে আসি দীনু ডাক্তারকে। জিনিসপত্র কিনতে যেতেই হয় আমাকে – ওষুধপত্তরও আনি। তবে –"

"তবে কি?"

"ইদানীং আর ওষুধপত্তর দেন না। আসেনও না।"

"কেন?"

"কি জানি। বলেন, কোনো লাভ নেই। জংগল থেকে এনে বিষ্ণুপুরে যদি রাখতে পারো – ভাল হবে। নইলে নয়।"

"নিয়ে যাওনি কেন?"

"এই দ্যাখো! আমাকে দুষছো কেন? বৌদিমণি তো যাবে না – ঐ মাগী শকুন্তলাই যেতে দেয় না। তাছাড়া –"

"থামলে কেন?"

আমতা আমতা করে নকুল সাহার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলে রামহরি – "মানে, বুঝতেই তো পারছ – খরচপত্র অনেক – উকিলবাবু যা পাঠান, তাতেই কুলোয় না –"

হাঁ-হাঁ করে ওঠেন নকুল সাহা – "সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। এখন তোমার দাদাবাবুর অনেক টাকা। বিষ্ণুপুরে গেলে যদি বৌদিমণি ভাল হয় –"

"বিষ্ণুপুরে নয়।" মৃদুস্বরে বলে ভবশংকর – "ওকে কলকাতাতেই নিয়ে যাবো – ভাল ডাক্তার দেখাবো। তার আগে দীনু ডাক্তারের সংগে কথা বলতে চাই। হাত ধুয়ে নিন, নকুলবাবু – এখুনি বেরোবো।"

"এখুনি?"

"হ্যাঁ। রামহরি, তুমিও যাবে। ড্রাইভারকে খেতে দাও, তুমিও খেয়ে নাও।"

ভাঙা টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে একটি শারদীয় সংখ্যা পড়ছিলেন বৃদ্ধ দীনু ডাক্তার। আজকালকার পশারওলা ডাক্তাররা ডাক্তারী বই পড়ে প্র্যাকটিস করেন না। দীনুবাবু বৃদ্ধবয়সে তাদের পদাংক অনুসরণ করেছেন।

মানুষটা না-রোগা না-মোটা, না-লম্বা না-বেঁটে, না-ফর্সা না-কালো। ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার মত মামুলি চেহারা।

কিন্তু ব্যক্তিত্ব আছে শুধু দুচোখের খরদৃষ্টিতে আর কণ্ঠস্বরের করাত-চালানো শব্দে। গলা শুনলেই মনে হয় যেন করাত চলছে – গলা কাটা যাবে এখুনি। যদিও গলাকাটা দক্ষিণা তিনি নেন না কারো কাছ থেকেই। তাই ভাঙা টেবিলের জায়গায় নতুন টেবিল আসেনি, ছ্যাতলাপড়া আলমারি পালটে সানমাইকা ক্যাবিনেট কেনেননি। রুগীদের তিনি আত্মীয়জ্ঞান করেন আর রোগ দেখলেই তাড়া করেন। ফলে, নেই-নেই করেও তাঁর যা আছে, দুটো-তিনটে পাশ দেওয়া ঠাট-বাটওলা ডাক্তারদেরও তা নেই।

এ হেন দীনু ডাক্তার ভবশংকরের অভিজাত মূর্তিটাকে সহসা টেবিলের সামনে সটান দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চশমার ওপরের ফাঁক দিয়ে জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে কাঠ-চেরা গলায় বললেন – 'ওলাউঠা টলাউঠা হয়েছে নাকি কারো? অমন প্যাট প্যাট করে দেখবার কি আছে? দেখছেন না বই পড়ছি? কে আপনি? থাকা হয় কোথায়?"

পেছন থেকে এগিয়ে এল রামহরি – "পা-দুখানা নামিয়ে বসুন, ডাক্তারবাবু। ইনি দাদাবাবু।"

"দাদাবাবু! সেটা আবার কে?" পা না নামিয়েই বললেন দীনু ডাক্তার।

"রাজা ভবশংকর মল্লিক।"

"ভবশংকর? ভবশংকর?" কপাল কুঁচকে নামখানা বারদুয়েক আওড়ে নিলেন দীনু ডাক্তার – "ভবশংকর মানে সেই পাজীর পাঝাড়াটা? কাপুরুষ খুনেটা? বউকে প্যাগলী বানিয়ে পালিয়েছিল যে নচ্ছারটা?"

"কি যা-তা বলছেন, ডাক্তারবাবু? পা দুখানা নামান না।"

"কেন? কার খাতিরে নামাবো?" দমাস করে শারদীয় সংখ্যাটা টেবিলে রেখে খপাৎ করে নস্যির ডিবে তুলে নিয়ে পেঁচিয়ে ডালা খুলতে খুলতে দীনু ডাক্তার খেঁকিয়ে ওঠেন কর্কশ গলায় – "বউয়ের ওপর যার কর্তব্যজ্ঞান নেই, তাকে আবার খাতির কিসের রে? পা নামাবো না। ইচ্ছে হয় বসুক, না হয় দূর হয়ে যাক।" বলেই ফোঁ-ফোঁ করে নস্যি নিলেন দুবার।

"প্রফেশন্যাল এটিকেটটাও জানেন না দেখছি", একদম পেছন থেকে ফোঁস করে কর্তব্য করলেন অ্যাডভোকেট নকুল সাহা।

"আপনি আবার কে? চোরের সাক্ষী মাতাল নাকি?"

"আজ্ঞে না। আমার নাম নকুল সাহা। অ্যাডভোকেট। আমার মক্কেল ভবশংকর মল্লিকের সম্মান রেখে কথা যদি না বলেন, মানহানির মামলায় আপনাকে –"

"কি বললেন!" ঝপ করে পা নামিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন দীনু ডাক্তার। "মামলা করবেন? মামলা? বেরোন ...... বেরোন ...... এখুনি বেরোন আমার চেম্বার থেকে!"

"আঃ! কি হচ্ছে নকুলবাবু!" গুরুগম্ভীর গলায় এতক্ষণ বাদে কথা বলল ভবশংকর – "আমি ফিরে এসেছি আমার কর্তব্য করতেই। শুনলাম আপনি বলেছেন, শিলাবতীকে জংগলের বাইরে এনে রাখলে ভাল হয়ে যাবে। ওকে আমি কলকাতায় নিয়ে যাবো। তার আগে কনসাল্ট করতে চাই আপনার সংগে।"

কটমট করে তাকিয়ে ভবশংকরের শান্ত চোখে চোখ রেখে গর্জে উঠলেন দীনু ডাক্তার – 'খুনীকে কনসাল্টেশন দিই না আমি।"

"আমি যে খুনী নই, সেটাও প্রমাণ করব বলে আমি ফিরে এসেছি।"

"আপনার চোদ্দপুরুষও প্রমাণ –" বলেই সামলে নিলেন দীনু ডাক্তার – "দুনিয়ার লোক জানে আপনি খুনী। আপনি খুনী বলেই পাগল হয়ে গেছে শিলাবতী।"

"আর যদি প্রমাণ করতে পারি আমি খুনী নই তাহলে ভাল হয়ে যাবে শিলাবতী?"

"নো গ্যারান্টি। তবে চান্স আছে। বাট ইউ কান্ট।"

"আই উইল। শিলাবতী জানে আমি খুন করিনি।"

"শিলাবতী জানে আপনি খুন করেননি!" হোঁচট খেতে খেতে বললেন দীনু ডাক্তার। হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল রামহরিও। এ খবরটা তার কাছে একেবারেই নতুন।

হাসল ভবশংকর – "কনসাল্টেশনটা সেই কারণেই। অবশ্যই প্রাইভেটলি।"

ইংগিতটা বুঝলেন নকুল সাহা। বললেন তড়িঘড়ি – "তাই ভালো, তাই ভালো। প্রাইভেট অ্যাফেয়ারে প্রাইভেটলি কথা বলাই ভাল। এই রামহরি, চলো আমরা বাইরে যাই।"

টেবিলের দু পাশে এখন দুজন বসে আছে। দীনু ডাক্তারের চোখ ছানাবড়ার মত বিস্ফারিত।

"বলেন কী! শিলাবতীর বিশ্বাস আপনি ওর স্বামী নন?"

"আপনার মুখটা ...... আপনার মুখটা ......" বলতে বলতে তীক্ষ্ণ চোখে ভবশংকরের মুখমণ্ডল খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন দীনু ডাক্তার – প্রায় সেইরকমই অবিশ্যি ...... পার্সোন্যালিটি অনেক বেড়েছে ...... কাওয়ার্ডিস ভাবটা চলে গেছে ...... নার্ভ খুব স্ট্রং হয়ে গেছে ...... আমেরিকার জলহাওয়ায় ম্যাজিক আছে নাকি?"

"তা আছে। সব চেয়ে বড় ম্যাজিক আছে টাকায়। একশ কোটি টাকা আছে আমার ব্যাঙ্কে।"

"এ-ক শ কোটি!" খাবি খেলেন দীনু ডাক্তার। "বলেন কি? লটারী জিতে নাকি?"

"ব্যবসা করে। সে কথা থাক। ও এখন যে ইলিউশনে রয়েছে, সেটা ভেঙে দেওয়াটা কি এখন ঠিক হবে?"

"ইলিউশন? রাইট! রাইট! হক কথা বলেছেন মশায়। ওর ধারণা আপনি ওর স্বামী নন?"

"হ্যাঁ।"

"এই ধারণাটা ভেঙে গেলেই ও আবার আপনাকে ঘৃণা করবে, ছুরি নিয়ে তেড়ে আসবে?"

"নিশ্চয়।"

"কিন্তু মেয়েদের কাছে ইলিউশন ভেঙে যায় যে একটি ব্যাপারে ব্রাদার – সেটা কি আপনি এড়িয়ে চলতে পারবেন?"

বিচিত্র হাসল ভবশংকর। নাদিয়ার ভ্রম কেটে গিয়েছিল যে ঘটনার পর – সেই ঘটনারই ইংগিত করছেন ডাক্তার।

বললে "পারব। দেহগত কোনো সম্পর্ক রাখব না।"

"বাঃ! বাঃ! ফাইন! পার্মানেন্টলি অবশ্য নয় – জখম নার্ভসেলগুলো একটু সামলে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"তাহলে ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি?"

"একশবার। ঐ মাগী শকুন্তলাটার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যান, – এমন জায়গায় যান যেখানে সুবোধের প্রেতাত্মা যেতে পারবে না।"

"সুবোধের প্রেতাত্মাও একটা কারণ?"

"নিশ্চয়। রোজ রাতে জানলার নিচে এসে অমন বিকট চেঁচালে আপনিও পাগল হয়ে যেতেন, ব্রাদার।"

"বেশ, সুবোধের প্রেতাত্মার ব্যবস্থা আজ রাতেই করছি।"

"কি ...... কি করবেন?" আঁৎকে উঠলেন দীনু ডাক্তার।

"শুনবেন কালকে। আজ চলি। নমস্কার।"

## প্রেতাত্মা রহস্য

শুধু রামহরিকে বলেছিল ভবশংকর রাতের প্ল্যান।

শুনে শিউরে উঠেছিল রামহরি – "দাদাবাবু, ভূতপ্রেতের সংগে ছেলেখেলা করতে যেও না।"

কোনো কথা শোনেনি ভবশংকর। অগত্যা ......

রাত তখন দুটো।

কালি মাখা আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। কালি দিয়ে লেপে দেওয়া হয়েছে বিশাল অরণ্য। জোনাকির আলোয় চমকে চমকে উঠছে তমিস্রা। নৈঃশব্দ্য ভংগ হচ্ছে নিশাচর প্রাণীর চিৎকারে।

সিংহগড় ভবন সুষুপ্ত। অন্ধকার। জেনারেটর বন্ধ হয়েছে তো সেই রাত দশটায়।

গোল হয়ে যে চৌকোনা থামগুলো ঘিরে রেখেছে পার্লামেন্ট হাউসের মত বিরাট ইমারতকে, তার দুটির আড়ালে দাঁড়িয়ে দুটি মূর্তি।

ভবশংকর আর রামহরি।

ভবশংকরের প্যান্টের পকেটে সরু নাইলন দড়ির একটা বান্ডিল। রামহরির হাতে টর্চ।

মাঠের ওপর থেকে একটা ইঁদুর ধরে নিয়ে উড়ে গেল একটা বাদুড়। দূর বনে হা-হা-হা-হা করে হেসে উঠল হায়না। শেয়ালের হুক্কা-হুয়া হাক শোনা গেল পরক্ষণেই।

আবার নৈঃশব্দ্য। থমথম করছে বনাঞ্চল। বিশ্বচরাচর!

আচমকা নিশুতিরাতের অসহ্য স্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে দিয়ে কে যেন অমানুষিক স্বরে হাহাকার করে উঠল শিলাবতীর জানলার ঠিক নিচে। রক্ত-জল-করা অপার্থিব চিৎকার। বনের ওপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিকট আওয়াজটা মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে।

এবং কক্ষচ্যুত উল্কার মত থামের আড়াল থেকে শব্দ লক্ষ্য করে ধেয়ে গেল ভবশংকর। যেন একটা শরীরী বিদ্যুৎ।

পরক্ষণেই জাগ্রত হল একটা জান্তব হুংকার। ঝটাপটির শব্দ। লোম খাড়া করা অমানবিক হুংকারের পর হুংকারে ঠক্‌ঠক্‌ করে হাঁটু কাঁপতে থাকে রামহরির।

"রামহরি! রামহরি! টর্চ! জলদি!"

আর রামহরি! ভূতের খপ্পরে পড়েছে দাদাবাবু। টর্চ মেরে কি হবে? তবুও দৌড়োয় শব্দ লক্ষ্য করে। টর্চও জ্বালে।

আর দেখে সেই বিচিত্র দৃশ্য। অবিশ্বাস্য দৃশ্য!

অন্ধকারের মধ্যেই অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় নাইলন দড়ি দিয়ে একটা মূর্তিমান বিভীষিকাকে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলছে ভবশংকর। অপার্থিব চিৎকারটা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে করাল আকৃতি বিকটাকার সেই আতংকের কণ্ঠ চিরে।

বাঁধা শেষ। চকিতে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ায় ভবশংকর।

"টর্চটা মুখে ফ্যালো, রামহরি। চিনতে পারছো?"

ভূতের মুখে টর্চ ফেলবে রামহরি? হাত তো কাঁপছে থরথর করে। লিকলিকে কুৎসিত কদাকার বিকৃত দেহটা বাঁধা অবস্থাতেই পাকসাট খাচ্ছে মাটির ওপর।

হাত থেকে টর্চ ছিনিয়ে নিল ভবশংকর। ভয়াবহ আকৃতিটার চুলের মুঠি একহাতে খামচে ধরে টর্চ ফোকাস করল মুখে।

জীবন্ত দানো নাকি? একেবারে উলংগ। যেন পোড়া কালো চামড়া সেঁটে রয়েছে হাড়ের ওপর। কোটরের মধ্য থেকে নরকের আগুনের মত ধক ধক করে জ্বলছে দুটো চোখ।

ধমকে ওঠে ভবশংকর – "আরে গেল যা! অত কাঁপছো কেন? চিনতো পারছো কিনা বলো।"

হ্যাঁ, এবার চিনতে পেরেছে রামহরি। শ্বাপদের মত জিব আর দংষ্ট্রা দেখিয়ে জান্তব গর্জন করে চললেও চিনতে পেরেছে বইকি রামহরি। খুবই কষ্ট করে চিনতে হচ্ছে যদিও। তবুও চিনেছে রামহরি ...... চিনেছে!

দীর্ঘ দশ বছর আগে যার লাস নিপাত্তা হয়ে গিয়েছিল – এ সেই!

"দানো! দানো! দাদাবাবু! সুবোধের দানো!"

"ননসেন্স! দানো নয় – মানুষ! দেখো গায়ে হাত দিয়ে – সাবধান – কামড়ে দেবে – মুখের কাছে হাত এনো না!"

"সুবোধ! সুবোধ! বেঁচে আছে সুবোধ!"

"হ্যাঁ, বেঁচে আছে সুবোধ, আমার সুবোধ!" আতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল পেছন থেকে।

চকিতে সুবোধের চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ভবশংকর। পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে সাদা থান কাপড় পরা যেন একটা প্রেতিনী মূর্তি।

রামহরির হাত থেকে টর্চটা ছিনিয়ে ফোকাস করল ভবশংকর মূর্তিমতী নিশীথিনীর মুখে।

বললে দাঁতে দাঁত পিষে – "শকুন্তলা যে! সুবোধকে তাহলে আমি খুন করিনি – তাই না?"

"ছেড়ে দাও ওকে! জানোয়ার কোথাকার!"

গর্জে ওঠে এবার রামহরি – "চোপরাও মাগী! টেনে জিব ছিঁড়ে দেব!"

"তার দরকার হবে না, রামহরি", হিমশীতল কণ্ঠে বলল ভবশংকর – "কাল ভোরের আলো ফোটবার আগেই ওকে চলে যেতে হবে সিংহগড় ছেড়ে – সংগে নিয়ে যাবে অপদার্থ কুলাংগার এই ছেলেকে।"

টর্চের আলোয় অংগারের মত চোখ জ্বলছে শকুন্তলার। মুখে কথা নেই।

শ্লেষতীক্ষ্ণ স্বরে বলে চলে ভবশংকর – "ফন্দীটা ভালই এঁটেছিলে, শকুন্তলা। গুমঘরের ভূতুড়ে কান্নার ব্যাপারটা রামহরির মুখে না শুনলে এ রহস্য ভেদ করতে আরো সময় লাগত আমার।"

"গুমঘর!" হতভম্ব স্বরে বলে রামহরি।

"হ্যাঁ, রামহরি। ঐ গুমঘরেই এই দশবছর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল সুবোধকে। মাথা খারাপ হয়েছিল আগেই – আমার সংগে শেষ টক্করের পর জখম হয়ে একেবারেই অমানুষ হয়ে যায় সুবোধ। পশুর সংগে ওর আর কোনো তফাত নেই। তাই না শকুন্তলা?"

শকুন্তলা নিথর।

চোয়ালের হাড় কঠিন করে বলে যায় ভবশংকর – "তাই এই রাতের নাটক করার দরকার হয়েছিল। প্রেতাত্মা নয় – স্বয়ং সুবোধ রোজ আসত গুমঘরের বাইরে – সারাদিন কাটত গুমঘরে। কেন আসত জানো, রামহরি? দুটো মহৎ কারণে। এক, পেটের খিদে মিটোনো। গুণবতী মা রোজ খাবার রেখে যেত এই জানলার নিচে। খাবার পেয়েই উল্লাসে বিকট চেঁচিয়ে ফের গুমঘরেই ফিরে যেত সুবোধ।"

অমানুষিক গর্জন করে ওঠে সুবোধ।

ভ্রূক্ষেপ করে না ভবশংকর – দু নম্বর উদ্দেশ্যটা আরো মহৎ। ওই চিৎকার দিয়ে রক্ত জল করে ছাড়ত শিলাবতীর। রাতের পর রাত অতৃপ্ত প্রেতাত্মার চিৎকার শুনিয়ে পাগল বানিয়ে রেখেছে শিলাবতীকে। পশু হয়ে গিয়েও প্রেমের আগুন যে এখনো ধিকিধিকি করে জ্বলছে বিকৃত মস্তিষ্কের কোষে কোষে। কি শকুন্তলা, ঠিক বলছি তো?"

শকুন্তলার মুখে কথা নেই।

কথা বলল রামহরি – বিমূঢ় স্বরে – "কিন্তু গুমঘরে তো সিঁড়ি নেই। নামবে কি করে? উঠবেই বা কি করে?"

"দড়ি বেয়ে।"

"দড়ি বেয়ে?"

"দূরবীন দিয়ে সকালেই দেখে নিয়েছিলাম, ঘন সবুজ শ্যাওলার আস্তরণ ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে দেওয়ালের ওপর দিকে। দেওয়ালের যেখান দিয়ে রোজ ওঠানামা করে, সেখানেও আস্ত নেই সবুজ শ্যাওলার প্রলেপ। সন্দেহটা মাথায় এসেছিল তখনি।"

"কিন্তু দাদাবাবু, দশ বছর আগেও তো সিঁড়ি ছিল না গুমঘরে? কি করে ওপরে উঠল সুবোধ?"

"জবাবটা শকুন্তলাই দেবে। ওর মত কূটবুদ্ধি মেয়েছেলের পক্ষে সব সম্ভব।"

কিন্তু কোনো জবাবই দিল না শকুন্তলা। অগ্নিগর্ভ চোখে কেবল চেয়ে রইল ভবশংকরের পানে। সেকাল হলে নির্ঘাত ভস্ম হয়ে যেত ভবশংকর।

মৃদু কঠিন হেসে বললে ভবশংকর – "রামহরি, ইচ্ছে হলে গিয়ে দেখে আসতে পারো – গুমঘরের দড়ি অথবা দড়ির মই ঝুলছে এখনো।"

ওপরে উঠে রোজ টেনে নিত সুবোধ।

"কিন্তু প্রথমবার উঠল কি করে?"

"জবাবটা শকুন্তলা দিলে আমার মেহনত অনেকটা কমে যেত।"

কিন্তু শকুন্তলা আর জবাব দেয়নি। পরের দিনই বিদেয় নিয়েছিল সিংহগড় থেকে সুবোধকে নিয়ে।

ভবশংকরও আর মেহনত করেনি – সময়ই পায়নি।

কারণ, পরের দিন থেকেই প্রভঞ্জন গতিতে বিপদের পর বিপদ এসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

## বিপদের ঘনঘটা

"শিলাবতী, সব শুনেছো?"

"হ্যাঁ।"

"এখন বিশ্বাস হল তো আমি খুন করিনি?"

"তুমি?" বিচিত্র চোখে তাকায় শিলাবতী। কথা হচ্ছে তারই ঘরে – সকালবেলা। "তুমি তো সে তুমি নও গো। সে তো পালিয়ে গেছে – কাপুরুষ।"

"আর আমি?"

"পুরুষ। এ কাজ তার দ্বারা সম্ভব হত না।"

"আজই কলকাতায় যাবো – তোমাকে নিয়ে।"

"আমাকে নিয়ে!" রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ে মোমসুন্দরীর রক্তহীন গালে "সত্যিই তাহলে ভালোবাসো আমাকে?"

"না বাসার কি আছে?"

"সত্যি স্বামী তো নয়।"

"কিন্তু একটা শর্ত আছে, শিলাবতী।"

"বলো।"

"ডাক্তার বলেছেন – দীনু ডাক্তার – বেশ কিছুদিন আলাদা ঘরে শুতে হবে আমাদের।"

"কেন? দীনু ডাক্তারের মাথা খারাপ।"

"তোমার ভালর জন্যেই। একেবারে সেরে না ওঠা পর্যন্ত –"

"বেশ গো, বেশ, তাই হবে। তুমি আমার কাছে কাছে থাকলেই আমি ভাল থাকব।"

"থাকব, শিলাবতী, কথা দিচ্ছি থাকব।"

কড়া নড়ে উঠল দরজার – "দাদাবাবু!"

"দরজা খুলে ধরল ভবশংকর – "কি ব্যাপার রামহরি?"

"কলকাতা থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন – এখুনি দেখা করতে চান।"

বৈঠকখানায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেখ রহিম আর ভবশংকর। প্রথম জনের মুখ ভয়বিকৃত। দ্বিতীয় জনের মুখ ইস্পাতকঠিন।

ভবশংকর বলছে – "এখানে কেন?"

"পেছনে ফেউ লেগেছে।"

"ফেউ?"

"হ্যাঁ। কদিন ধরেই সন্দেহ হচ্ছিল। ধরা পড়তে পারি যে কোনো মুহূর্তে। তাই এলাম এই দুটো জিনিস তোমার হেপাজতে রাখতে।" দুটো প্যাকেট এগিয়ে দিল শেখ রহিম।

"কি আছে এতে?"

"একটায় আছে ইন্ডিয়ায় আমাদের স্পাইদের নামধাম ঘাঁটি। কমপ্লিট লিস্ট। আর একটায় আছে ব্লুপ্রিন্ট।"

"কিসের ব্লুপ্রিন্ট?"

"শেষ কাজের ব্লুপ্রিন্ট। কোন্ কোন্ পয়েন্টে শুরু হবে কাজটা। ইন্ডিয়ার কোন্ কোন্ জায়গায় একই সঙ্গে মাথাচাড়া দেবে আমাদের সিক্রেট ফোর্স – তার ব্লুপ্রিন্ট।"

"আমার কাছে রাখছো কেন?"

"এই জংগলই একমাত্র নিরাপদ জায়গা বলে। রাজা ভবশংকর মল্লিককে অন্তত কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।"

প্যাকেট দুটো হাতে নিয়ে পাশের টেবিলে রাখল ভবশংকর। প্রায় সংগে সংগে ঘরে ঢুকল রামহরি।

"দাদাবাবু, আর একটা গাড়ি এল কলকাতা থেকে।"

"কে এল?"

"একটা বেঁটে লোক।"

"বেঁটে লোক!" নিমেষে শক্ত হয়ে ওঠে ভবশংকরের শিরদাঁড়া। "নাম কি?"

"ডক্টর ইরানী।"

বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে এখন তিনজন। ডক্টর ইরানী, শেখ রহিম আর ভবশংকর।

হাসছে খর্বকায় ইরানী – "এত অবাক হচ্ছেন কেন নবাব সাহেব?" কথা হচ্ছে উর্দুতে।

"আপনার তো এখানে আসার কথা নয়", ইস্পাতকঠিন স্বর ভবশংকরের।

"সিরিয়াস ব্যাপার।"

"কি?"

"এঁর সামনে তো বলা যাবে না", শেখ রহিমকে দেখিয়ে বললে ডক্টর ইরানী।

"খুব বলা যাবে। উনি আমাদের একজন।"

"তাই নাকি? তাহলেও", দ্বিধার সুরে বলে ডক্টর ইরানী – "ইনফরমেশনটা এতই সিক্রেট যে আপনার কানে কানে বলতে চাই।"

"বলুন।"

দীর্ঘকায় ভবশংকর মাথা হেঁট করে কান বাড়িয়ে দেয় খর্বকায় ইরানীর দিকে।

ইরানী বাঁ হাত ভবশংকরের ঘাড়ের পেছনে ধরে আর একটু নামিয়ে নেয় মাথাটা। মুখ নিয়ে যায় কানের কাছে।

পরক্ষণেই যেন প্রলয় ঘটে যায় ঘরের মধ্যে।

আচম্বিতে ইরানীর ডান হাত মুচড়ে ধরে রিভলবারটা ছিনিয়ে নিয়ে সবেগে লাথি মেরে তাকে ছিটকে ফেলে দেয় ভবশংকর। মেঝের ওপর ছিটকে গিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে ইরানী।

ভবশংকরের হাতের রিভলবার কিন্তু টিপ করে রয়েছে তার বুকের দিকে।

শেখ রহিম হতভম্ব!

ইরানী নির্বোধ নয়। নিজে একটুও না নড়ে তাকায় শেখ রহিমের দিকে – "আপনি আমাদের একজন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কি পাগল হয়েছেন ডক্টর ইরানী? আপনার নাম আমি শুনেছি। কেন এসেছেন ইন্ডিয়ায়? কেন মার্ডার করতে যাচ্ছিলেন নবাব সাহেবকে?"

"কারণ", আশ্চর্য শান্ত স্বরে বললে ইরানী – "উনি নবাব আমিনুল্লা নন।"

"নবাব আমিনুল্লা নন! তবে উনি কে?"

"রাজা ভবশঙ্কর মল্লিক!"

"তিনি তো খুন হয়েছেন সিয়েরা নেভাদায় – লাশ পড়ে আছে ডেথ ভ্যালীর বালির তলায়।"

"ভুল! ভুল! প্রথম ভুল আমি করেছিলাম – তারপর একই ভুল করেছে সবাই।"

"ভুল!"

"হ্যাঁ, মারাত্মক ভুল। ভবশঙ্করকে নবাব সাহেব নিয়ে গেছিলেন খুন করে ভবশঙ্কর সেজে ফিরে আসবেন বলে। কিন্তু ঘটেছে ঠিক তার উল্টো। নবাবসাহেবকেই খুন করে ভবশঙ্কর ফিরে এসেছে নবাবসাহেব সেজে।"

"বলছেন কী!"

"বালির মধ্যে পড়ে থাকা লাশটাকে প্রপার্লি গোর দেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল হঠাৎ। তখনি দেখেছিলাম ঘাড়ের আঁচিলটা।"

"আঁচিল!" শেখ রহিম বিমূঢ়।

"হ্যাঁ। নবাব সাহেবের ঘাড়ে একটা লাল আঁচিল ছিল – এইমাত্র ভবশঙ্করের ঘাড়ে হাত দিয়ে দেখে নিলাম আঁচিল নেই।"

সাদা হয়ে যায় শেখ রহিমের মুখাবয়ব – "সর্বনাশ! ওর কাছেই রাখলাম এখুনি ফাইনাল ব্লুপ্রিন্ট আর স্পাই নেট ওয়ার্কের ডিটেলস্।"

"ছিনিয়ে নিন – খুন করুন – এখুনি।" ছিটকে উঠেছিল ডক্টর ইরানী।

কথা ফুরোতে না ফুরোতেই শেখ রহিম ধেয়ে গিয়েছিল ভবশঙ্করের দিকে – ভোজবাজির মত হাতে দেখা গিয়েছিল একটা ছুরি।

কিন্তু উপর্যুপরি দুবার শোনা গেল রিভলবারের নির্ঘোষ। যন্ত্রণাবিকৃত মুখে মেঝেতে বসে পড়েছে শেখ রহিম আর ডক্টর ইরানী। দুজনেরই পা ফুঁড়ে চলে গেছে সিসের বুলেট।

ভবশঙ্করের হাতের রিভলবারের নলচে থেকে ধোঁয়া উঠছে। দেহ নিস্পন্দ। যেন পাথরের মূর্তি।

পেছনের দরজায় শোনা গেল শিলাবতীর ভয়ার্ত স্বর – "এসব কী! এসব কী! খুন চাপল তোমারও মাথায়? হ্যাঁগো –"

বলেই হাঁ করে চেয়ে রইল বাইরের দরজার দিকে।

চলন্ত বিস্ময় ঢুকছে দরজা দিয়ে।

আর এক ভবশঙ্কর!

## শেষ বিস্ময়

দুই ভবশঙ্কর তাকিয়ে দুজনের দিকে। নতুন ভবশঙ্করের পেছনে রামহরি। দুচোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে মেঝেতে বসে থাকা শেখ রহিম আর ডক্টর ইরানীরও।

দরজা ধরে টলছে শিলাবতী। অজ্ঞান হয়ে যাবে বোধহয় এখুনি।

বজ্রকঠিন স্বরে বললে রিভলবারধারী ভবশঙ্কর – "হাঁ করে দেখছিস কি? গিয়ে ধর বউকে – পড়ে যাবে যে!"

ত্রস্তে ঘর পেরিয়ে এল দ্বিতীয় ভবশঙ্কর। দুহাত বাড়িয়ে শিলাবতীকে ধরার আগেই জ্ঞানহীনা শিলাবতী লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

"রামহরি", আবার সেই কর্তৃত্বব্যঞ্জক হুকুম জাগ্রত হল রিভলবারধারী ভবশঙ্করের কণ্ঠে – "বৌদিমণির মাথায় জল দাও। আসুন আপনারা। বড় দেরি করে ফেললেন কিন্তু।"

ঘরে ঢুকল কয়েকজন ভদ্রলোক। প্রত্যেকের হাতে রিভলবার।

সবার আগে টাকমাথা ভদ্রলোক একগাল হেসে বললে – "তা একটু দেরি হয়ে গেল। টায়ার পাংচার হওয়ায় – আরে! শেখ রহিমের সঙ্গে ওটা আবার কে?"

"ডক্টর ইরানী।"

নকুল সাহা বললে – "আর এক মুহূর্তও নয়। এখুনি বাড়ি যাবো আমি। এত ঘনঘন পিলে চমকালে নির্ঘাত হার্টফেল করবে আমার।"

"যাবেন বইকি – আমার সঙ্গেই যাবেন", বললে ভবশঙ্কর ডানহিল টানতে টানতে। ঘরে এখন এই দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। "পুরো ব্যাপারটা এখুনি শুনবেন, না, যেতে যেতে শুনবেন?"

"তাড়াতাড়ি বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন।"

"আসল ভবশঙ্কর মল্লিককে ফিরিয়ে আনার জন্যেই আমি গেছিলাম আমেরিকায়। কারণ ও আমার অনেক দিনের বন্ধু। ওর জীবনে সুখ ফিরিয়ে আনাই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।"

"সাধু উদ্দেশ্য। কিন্তু দুজনকে একরকম দেখতে কেন মশাই?"

"এই পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপারই দেখা যায়। এটাও তার মধ্যে একটা। যমজ না হয়েও আমাদের দুজনকে দেখতে একই রকম। আমি ওর পিছু নিয়েছি টের পেয়ে ভবশঙ্কর পালায় ডেথ ভ্যালী পেরিয়ে সিয়েরা নেভাদায় – বউয়ের ওপর দুর্জয় অভিমান নিয়ে বিদেশেই দেহ রাখবে – এই ছিল ওর প্রতিজ্ঞা।"

"কিন্তু সেটা রাখল না কেন জানতে পারি?" যেন টগবগ করে ফুটছেন নকুল সাহা।

"কারণ, সিয়েরা নেভাদায় পড়ল হুবহু ওরই মত দেখতে আর এক জনের খপ্পরে, নাম তার আমিনুল্লা।"

"বলেন কী! একই রকমের তিনটি লোক!"

"ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন, নকুলবাবু। আমিনুল্লা প্ল্যান করে ছিল ভবশঙ্করকে খুন করে ভবশঙ্কর সেজে ইন্ডিয়ার বুকে বসে স্পাই নেট ওয়ার্ক কন্ট্রোল করবে – প্ল্যান অনুযায়ী শেষ কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত। আড়াল থেকে সব শুনলাম। আমিনুল্লাকে খতম করলাম আমিই। পাচার করলাম আসল ভবশঙ্করকে। নকল নবাব আর নকল রাজা সেজে ইন্ডিয়ায় ফিরে এলাম। কিন্তু ডক্টর ইরানী –"

ঘরে ঢুকল আসল ভবশঙ্কর, পাশে শিলাবতী। মোমমুখ রাঙা। চাহনি সলাজ।

হাসল নকল ভবশঙ্কর – "যাক, পুনর্মিলন ভালভাবেই ঘটে গেছে দেখছি। ভব, তোর বউয়ের গায়ে কিন্তু হাত দিইনি – কথা রেখেছি।"

"স্টুপিড!" বললে আসল ভবশঙ্কর – "ও যে তোকে আমার চাইতেও বেশি ভালবেসে ফেলেছে – কি করি বলতো?"

"সে প্রব্লেমটাও আমাকে সল্‌ভ্ করতে হবে? চলুন নকুলবাবু। গাড়ি রেডি।"

"কিন্তু মশাই, আপনার আসল নামটা তো বললেন না?"

"ইন্দ্রনাথ রুদ্র – প্রাইভেট ডিটেকটিভ।"

"আমিনুল্লার শেষ কাজটা কি ছিল বলবেন না?"

"না। ওটা টপ সিক্রেট – কেউই জানবে না।"

"প্ল্যানটা কাদের?"

অদ্ভুত চোখে চাইল ইন্দ্রনাথ রুদ্র – "ওটাও টপ সিক্রেট। জানতে চাইবেন না।"

## নাদিয়া কোথায়? মমতাজ কোথায়?

রাত দুটো। বড় বড় গাছগুলো চাঁদের আলোয় অপরূপ হয়ে উঠেছে। সিংহগড়ের অভিষেক মণ্ডপের বাঁদিকে জ্যোৎস্নাধারায় ধুয়ে যাচ্ছে ভগ্নপ্রায় সিংহতোরণ। বনজ্যোৎস্না চারটে গম্বুজের ওপর মায়াময় পরশ বুলিয়ে যেন জাগিয়ে দিতে চাইছে সিংহমূর্তি দুটিকে।

অভিষেক মন্ডপের মাথার কারুকাজ করা ছাউনি এককোণে ভেঙে পড়েছে। চারকোণের চারটি থাম এখনো অটুট। মাঝের মর্মর সিংহাসনও অটুট।

এই সিংহাসনে বসে পাশাপাশি দুটি মূর্তি। ভবশঙ্কর আর শিলাবতী।

ভবশঙ্করের হাতের ওপর রয়েছে শিলাবতীর হাত।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল শিলাবতী।

বললে অচঞ্চল ভবশঙ্কর – "অতবড় নিঃশ্বেসটা কেন ফেললে, শিলাবতী?"

বাতাসের সুরে বললে শিলাবতী – "ভুল, ভুল, শুধুই ভুলে ভরা এই জীবনটা।"

"ভগবানও ভুল করে শিলাবতী, শয়তানে করে না।"

"কিন্তু আমার এই ভুলের ক্ষমা নেই। ইন্দ্রনাথ রুদ্র না থাকলে এ ভুল থেকে যেত চিরকাল। তোমার স্ত্রীভাগ্য ভাল নয়, কিন্তু বন্ধুভাগ্য ভাল।"

"ইন্দ্রনাথের মত মহৎ প্রাণের মানুষ পৃথিবীতে বিরল, শিলাবতী। বিরল তোমার মত বউও।"

"বলো না, ওকথা আর বোলো না। ভালবেসে বিয়ে করেছিলে, তা সত্ত্বেও তোমাকে ভুল বুঝলাম – খুনী মনে করলাম – কেন? কেন? ওগো কেন, তা বলতে পারো?"

"আমারই দোষে শিলাবতী, শকুন্তলাকে এ বাড়িতে ঢুকতে দিয়েই ভুল করেছি – তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি বলেই –"

"ডাইনি! রামহরিদা ঠিকই বলে – ও একটা ডাইনি। জানো তোমাকে দশ বছর আগে কে ছুরি মেরেছিল?"

এবার চঞ্চল হয় ভবশঙ্কর – "কে?"

"ঐ শকুন্তলা।"

"বলো কি!"

"সুবোধের ভূত, মানে, সুবোধ রোজ রাতে এলে শকুন্তলা বেরিয়ে যেত ওকে তাড়িয়ে দিতে। আসলে খেতে দিত, তা তো জানতাম না। ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতাম ঘরে বসে। বিড় বিড় করে মন্তর পড়ত। আসলে কথা বলত। একদিন কয়েকটা ছাড়া ছাড়া কথা কানে ভেসে এসেছিল।"

"কি কথা, শিলাবতী?" ভবশঙ্কর ঘুরে বসে এবার।

"আজও স্পষ্ট মনে আছে। শকুন্তলা বলছিল ...... যা ...... যা ...... শিলাবতী আজও জানে ওর ছুরির ভয়েই ও পালিয়েছে ...... যা বুঝিয়েছি ...... ঘুমের ঘোরে ছুরি মেরেছিল ...... আমিই যে মেরেছি আজও জানে না ...... ইচ্ছে করেই উরুতে ......।"

"মাই গড!" চমকে ওঠে ভবশঙ্কর – "শকুন্তলাই ছুরি মেরেছিল আমাকে সেই রাতে।"

"হ্যাঁ। আমাকে বুঝিয়েছিল ঘুমের ঘোরে আমিই মেরেছি ...... আমার মাথার ঠিক ছিল না ...... তুমি অভিমান করে চলে না গেলে একদিন ধরে ফেলতেই।"

"দশ-দশটা বছর এই ভুল নিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। হরিবল্!"

"ভুল তুমি আরও করেছিলে। কি করে ভাবলে তোমার বন্ধুকে পাঠিয়ে আমার চোখে ধুলো দেওয়া যাবে?"

"তুমি তো ধরে ফেলেছিলে। শুধু তাই নয়," ঈষৎ অভিমানাহত স্বরে বলে ভবশঙ্কর – "তাকে আমার চাইতেও বেশি ভালবেসেছিলে।"

জলতরঙ্গের সুরে হেসে উঠল শিলাবতী। মনে হল যেন ভোর হয়ে গেছে, কোকিল ডাকছে।

বললে – "ভুল, ভুল, ওখানেও ভুল করেছিলে।"

"ভুল! ইন্দ্রনাথকে তুমি ভালবাসোনি?"

"এখনও বাসি। কিন্তু সে ভালোবাসা আর স্বামীকে ভালোবাসা এক জিনিস নয়।"

"পরপুরুষকে ভালোবাসা –"

আবার সেই হাসি। হাসতে হাসতে ভবশঙ্করের গায়ে গড়িয়ে পড়ে গালে গাল ঠেকিয়ে বলে শিলাবতী – "তোমার মুন্ডু। ঈর্ষায় পাগল করে না তুললে কি ফিরে আসতে?"

"অ্যাঁ!"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ: সবটাই অভিনয়। বেগতিক দেখে তোমার বন্ধুই ফিরিয়ে এনে দিত তোমাকে। কিন্তু তুমি নিজে থেকেই ফিরে এলে।"

"বটে! পেটে পেটে তোমার এত বুদ্ধি!"

"ছাই বুদ্ধি। কুবুদ্ধি। সুবুদ্ধি থাকলে কি তোমাকে বাড়ি ছাড়া হতে দিতাম? শকুন্তলার ভয়ে, ভূতের ভয়ে তোমাকে ঘৃণা করে যেতাম? আসলে আমি পাগলই হইনি – প্রথম দেখাতেই ঠিক ধরে ফেলেছিল তোমার বন্ধু।"

"থাক, থাক, আর বন্ধু-প্রশস্তি গাইতে হবে না। ওর বুদ্ধির দৌড় আমার জানা আছে।"

"কি বললে? ইন্দ্রনাথবাবুর বুদ্ধি কম?"

"ফোঁস করে উঠলে যে? সুবোধ ব্যাটাচ্ছেলে গুমঘরের মাথায় উঠেছিল কি করে, তাই বলতে পারল না – মাথামোটা কোথাকার।"

"তুমি জানো?" উৎসুক চোখে তাকায় শিলাবতী।

"ছেলেবেলায় ঐভাবে উঠতাম বলেই তো বড় মামা তীর ধনুক সরিয়ে ফেলল।"

"তীর ধনুক দিয়ে?"

"আরে হ্যাঁ। খুব সোজা। তারের পেছনে সুতো বেঁধে ছুঁড়তাম গুমঘরের এদিক থেকে – গুমঘরের মাথা টপকে তীর গিয়ে পড়ত ওপাশে। এদিকের সুতোয় দড়ি বেঁধে টেনে নিতাম ওদিকে। গাছের গায়ে বেঁধে দড়ি বেয়ে উঠে যেতাম ওপরে।"

"কি দস্যি ছেলে!"

"সুবোধ হারামজাদা দড়ি ফেলে দিয়ে নিচে নামত – ওপরে উঠে দড়ি টেনে নিত।"

"যেমন মা, তার তেমনি ছেলে।"

পেছন থেকে ভেসে এল রামহরির গলা – "অ্যাদ্দিন বাদে বুঝলে বৌদিমণি?"

ত্রস্তে দুজনে দুদিকে সরে গেল। কৃত্রিম কোপে ধমকে ওঠে ভবশঙ্কর – "বুড়ো বয়েসে তোমার ভীমরতি ধরেছে, রামহরিদা। নিরিবিলিতে দুটো কথা বলছি –"

"রাত যে ভোর হয়ে এল, দাদাবাবু। এই শালটা এনেছি, গায়ে দিয়ে বসো – ঠান্ডা লাগবে। চা আনছি।"

গাছের আড়ালে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল দীর্ঘ শীর্ণ, পলিতকেশ বৃদ্ধ।

একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বললে ভবশঙ্কর – "মানুষ নয়, দেবতা।"

গরম শাল দিয়ে দুজনকে এক সঙ্গে মুড়তে মুড়তে শিলাবতী বললে – "হ্যাঁ গো, সেই নাদিয়া আর মমতাজ মেয়েদুটোর কি হল?"

হাসল ভবশঙ্কর – "ইন্দ্রনাথের উপস্থিত বুদ্ধি আর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তারিফ এবার করা যায়।"

"করতেই হবে। কি হয়েছে বলো না?"

"দুজনেই সরকারী হেপাজতে ছিল। নাদিয়া ফ্ল্যাট থেকে বেরোতে না বেরোতেই তুলে নিয়ে যায় ইন্দ্রনাথের নির্দেশ মত। মমতাজকেও লোপাট করা হয় হোটেলের বাইরে পা দিতেই।"

"কিন্তু মমতাজ তো কোনো দোষ করেনি?"

"ওকে তো ওর দোষের কথা কিছু বলাও হয়নি। মেয়েরা বড় পেট আলগা হয় – পুরো প্ল্যানটা ভেস্তে যেত ও বাড়ি ফিরে গেলে।"

"কিন্তু এখন?"

"বাড়ি ফিরে গেছে মমতাজ। বলেছে, কারা যেন ওকে একটা ঘরে আটকে রেখেছিল অ্যাদ্দিন। তারা কারা ও জানে না – কোনদিন জানবেও না।"

"আর নাদিয়া?"

"বর্ডার পার করে দেওয়া হয়েছে।"

"ইন্দ্রনাথবাবুর ব্যাঙ্কের অত টাকা?"

"আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবর রাখবার দরকার কি গো?"

ঠোঁটের ওপর উষ্ণ পরশ পাওয়ায় শিলাবতী আর প্রশ্ন করতে পারেনি।

আমরাও না হয় আর নাই করলাম?

**সমাপ্ত**

ছবি : পোলারিশ

গল্প অদ্রীশ বর্ধন

# কাঠের গুঁড়ো

## গোয়েন্দা কাহিনি

কবিতা বললে, 'ঠাকুরপো, তুমি আগের জন্মে নিশ্চয় নিয়ানডারথাল মানব ছিলে।'

অ্যাটাকটা কোন দিক থেকে আসছে, আন্দাজ করতে না পেরে সজোরে দু'টিপ নস্যি নিল ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

আমি বললাম, 'হে মোর সুন্দরী বধূ, তোমার এহেন মন্তব্যের কারণটা কী জানতে পারি?'

কথা হচ্ছিল ইন্দ্রনাথের বেলেঘাটার বাড়িতে—রবিবারের আড্ডায়। এই একটা দিন তো আমরা দোঁহে মিলে উত্যক্ত করি ইন্দ্রনাথকে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওর পেট থেকে টাটকা-বাসি সব রকমের কেস হিস্ট্রি খসিয়ে আনি। তারপর তাই নিয়ে আমি গল্প রচনা করি। আমি কলম ভাঙি, ইন্দ্রনাথের নাম হয়। আমার কপালে জোটে কচুপোড়া।

রুমাল দিয়ে গ্রিক নাক মুছতে মুছতে ইন্দ্র বললে, 'এতদিন তো শুনেছি, আমি নাকি কলির কেষ্ট, অথবা জন্মান্তরিত ভীষ্ম। এখন হয়ে গেলাম রূপান্তরিত নিয়ানডারথাল। এহেন সিদ্ধান্তের কারণটা জানতে পারি?'

কবিতা ওর ডাগর চোখে চক্ষুপল্লবের ঝাপটা মেরে বললে, 'ব্রেন তো বড় ছিল নিয়ানডারথালদের। ঠাকুরপোর ব্রেনও বেশ বড়। নইলে এত কেরামতি দেখাতে পারছে কী করে।'

মুচকি হেসে ইন্দ্রনাথ বললে, 'বউদি, নিয়ানডারথাল মানব হাইটে কিন্তু ছিল ছোট আমার চেয়ে। আমার পাঁজরার খাঁচাও ঠেলে বের করা নয়!'

কবিতা বললে, 'নিয়ানডারথালরা ধরায় ছিল চব্বিশ হাজার বছর আগে। সময়টা কম নয়। পরলোক থেকে আসবার সময়ে স্বর্গের সার্জনকে দিয়ে খাঁচা ছোট করে এনেছ।'

আমি মিনমিন করে বললাম, 'তবে যে তুমি বলো, ইন্দ্র আগে ছিল স্বর্গের ইন্দ্র। হাজার চোখ দিয়ে মেয়েছেলে দেখত।'

অট্টহেসে ইন্দ্র বললে, 'নইলে হাজারো রহস্যের সূত্র দেখতে পাই কী করে?'

জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে কবিতা বললে, 'বেশ কিছুদিন তুমি ইন্ডিয়ায় ছিলে না। কোন রহস্যের পেছনে ধাওয়া করে ক'টা মেয়েকে ঘায়েল করে এলে জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়', বললে ইন্দ্রনাথ, 'তবে মেয়ে ঘায়েল করতে নয়—ঘায়েল হওয়া একটা মেয়ের খুনিকে কোর্ট-খতম করতে—তেরো বছর পরে।'

এরপর রসিয়ে রসিয়ে ইন্দ্রনাথ রুদ্র যে কাহিনিটা শুনিয়ে রোববারের আসর জমিয়ে দিয়েছিল, এবার তা বলা যাক।

চঞ্চলা সেনশর্মা দেখে নিয়েছিল, বেড়াল দুটোকে ভেতরে নেওয়া হয়েছে কি না। তারপর বন্ধ করে দিয়েছিল সব কটা দরজা।

এপ্রিল মাস সবে শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু গরম বেজায় পড়েছে বলেই একতলা বাড়ির জানলায় জানলায় মশা আটকানোর জাল এর মধ্যেই লাগাতে হয়েছে।

বাড়িটা বিষমগঞ্জের শহরতলিতে। শহর থেকে মোটরে এক ঘণ্টার জার্নি। চঞ্চলা সেনশর্মা বয়সে তরুণী। কিন্তু এই বয়সেই বৈজ্ঞানিক হিসেবে নাম করে ফেলেছে। শুধু তরুণী নয়, রূপসীও বটে। তার চোখেমুখে এমন একটা লাবণ্য আছে, যা শুকনো খটখটে বিজ্ঞানের ঠিক বিপরীত। পলিমাটির দেশের মেয়ে। স্নিগ্ধতা সর্ব অঙ্গে। মাটি মাটি গায়ের রং। কিন্তু খরদ্যুতি দুই চোখে। সে চোখে বিদ্যুতের রোশনাই খেলে যায় আলোচনার বিষয়টা যখন হয় বিজ্ঞান।

তরুণী বিজ্ঞানী পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল শোবার ঘরে। চোখ গেল ক্যালেন্ডারের দিকে। আর দু-দিন বাকি। ব্যবসা-সফর শেষ করে ফিরে আসবে স্বামী।

কিন্তু তার মুখ চেয়ে তো বসে থাকতে পারবে না চঞ্চলা। সে নিজেও তো সাতকাজের মেয়ে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের কাজ। যে কাজে বিলম্ব করতে নেই। তুফান স্পিডে চলতে হয়।

শনিবারের সন্ধে। শৈব কোম্পানিতে ধকল গেছে গোটা একটা সপ্তাহ। এ কোম্পানি চিকিৎসায় রোগ নির্ণয় সম্পর্কিত ব্যবসায়ে পৃথিবীজোড়া নাম কিনেছে। মার্কেট লিডার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাথার মধ্যে বিজ্ঞানের কীট যদি কিলবিল করতে থাকে, চট করে ঘুম আসতে চায় না চোখে। চঞ্চলা তাই হালকা ডিটেকটিভ গল্পে মন দিল কিছুক্ষণ। চোখে ঘুম নামাতে, সারাদিনের শারীরিক ধকল কাটাতে যার জুড়ি নেই।

রাত দশটা নাগাদ বই রেখে নিভিয়ে দিল বেডসাইড ল্যাম্প। এলিয়ে পড়ল শয্যায়। এক ঘুমে রাত কাবার করে দেওয়া যাক।

বিশ মিনিট পর...

আধা আলোয় একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল শোবার ঘরের দরজায়। চৌকাঠ জুড়ে।

মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রবল হয়। বিজ্ঞানী হলেও চঞ্চলা কায়মনে নারী।

ঘুম ছুটে গেল চোখ থেকে।

শব্দহীন চরণপাতে এগিয়ে এল ছায়ামূর্তি। ডান হাতে একটা বৈদ্যুতিক মশাল। বাঁ-হাতে রয়েছে একটা রিভলভার, দেখতে পাচ্ছে চঞ্চলা আলোক আভায়।

হাঁটুর ওপর উঠে বসেছিল তৎক্ষণাৎ। বিছানার চাদর টেনে জড়িয়ে নিয়েছিল সারা গায়ে।

'খোলো নাইটি?' চাপা গলায় গর্জে উঠেছিল ছায়ামূর্তি। দ্রুত চিন্তা করে গেছিল ধীমতী চঞ্চলা। হাতে রিভলভার নিয়ে ধর্ষণ করতে যে এসেছে, আগে তার কথা শোনা যাক।

খুলে ফেলেছিল নাইটি, মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে।

তারপর টাকা দিতে চেয়েছিল। সতীত্ব থাকুক, টাকা যাক।

রিভলভারের ইঙ্গিতে তাই চেয়েছিল নিশার আগন্তুক।

ওই অবস্থাতেই বিছানা ছেড়ে নেমে পড়েছিল চঞ্চলা। গেছিল পাশের ঘরে। আলো জ্বালিয়ে হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে উপুড় করে দিয়েছিল টেবিলের ওপর।

বলেছিল, 'যা আছে, সব নিয়ে যাও!'

কিন্তু তেত্রিশ টাকার বেশি ছিল না ব্যাগে।

চাপা গলায় বলেছিল নিশার আততায়ী, 'শোবার ঘরে চলো। আলো নিভিয়ে দিয়ে যাও।'

তাই করেছিল চঞ্চলা। তখন তার হাত কাঁপছে। সারা গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। রিভলভারের নলচে যে স্থির, ট্রিগারে রয়েছে তর্জনী। ক্ষণিকের দ্বিধায় মৃত্যুদূত ধেয়ে আসতে পারে নলচের মধ্যে থেকে।

'উঠে বসো খাটে।'

তাই করেছিল চঞ্চলা। আড়চোখে দেখেছিল ছায়ামূর্তিকে। মুণ্ডু ঢাকা মুখোশ। কান পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, যেন বোরখা পরা মূর্তি। জ্বলছে শুধু দুটো ক্ষুধিত চক্ষু।

রিভলভার ছোট টেবিলে রেখে এগিয়ে এসেছিল নিশার আতঙ্ক। দুই হাত রেখেছিল চঞ্চলার নিরাবরণ দুই কাঁধে।

ছটফটিয়ে উঠেছিল চঞ্চলা।

দু-হাতে আততায়ীকে ঠেলতে ঠেলতে বলেছিল, 'না! না! না! আমার ইচ্ছে নেই!'

কিন্তু তাকে ঠেলে চিৎ করে শুইয়ে দিয়েছিল নিশাচর। দুই হাতের আসুরিক শক্তি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল চঞ্চলা।

নিঃসীম আতঙ্কে চঞ্চলার শরীর যেন শক্তিহীন হয়ে গেছিল। তার ওপর ওই আসুরিক শক্তি। যেন এক ক্ষুধিত শ্বাপদের গরম নিঃশ্বাসের ছলনায় চোখ-মুখ পুড়ে যাচ্ছিল।

তা সত্ত্বেও অবশ দুই হাতে মানুষ জানোয়ারটাকে ঠেলে তফাতে রাখতে চেয়েছিল চঞ্চলা।

হিসহিসিয়ে বলেছিল ক্ষুধিত নরপশু, 'বাধা দিও না। রিভলভার চালাব। জানে খতম করে দেব। তার চেয়ে বরং একটু হয়ে যাক। মজা... আনন্দ... আরাম।

জিন্স-এর জিপ-চেন টেনে খোলা হয়ে গেছিল এর পরেই।

দু'দিন পর।

মোহনগঞ্জ থানার ইন্সপেক্টর শান্তনু সরখেল দ্বিতীয়বার মন দিয়ে শুনে গেলেন চঞ্চলা-ধর্ষণের পুরো কাহিনি। এই ঘটনার তদন্ত করছেন ইনিই। ঘটনার দু-দিন পরে।

প্রশ্ন করলেন, 'লোকটার মুখ দেখা যায়নি একেবারে?'

'না।' চোখ নামিয়ে স্তিমিত গলায় বলেছিল চঞ্চলা, 'মুণ্ডু ঢাকা ছিল বোরখার মতো ঢাকনায়... কান চোখ মুখ কপাল দাঁত নাক কিচ্ছু দেখা যাচ্ছিল না।'

'গলার আওয়াজ শুনে বয়স ঠাহর করতে পেরেছিলেন?'

'গলার আওয়াজ শুনে?' একটু ভেবেছিল চঞ্চলা। তারপর বলেছিল, 'মনে হয় ২২ থেকে ২৮-এর মধ্যে।'

'সঠিক?'

'গলার আওয়াজ শুনে কিছুটা তো বোঝা যায়। মেয়েরা পারে।'

'প্রশ্নটা করলাম সেইজন্যই। মেয়েরা অনেক জিনিস বুঝতে পারে। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। মনের শক্তি দেওয়া হয়েছে শরীরের শক্তির বদলে। হাইট কতটা হবে বলে মনে হয়েছিল?' সাইকেলের হ্যান্ডল বারের মতো জাঁকালো গোঁফে তা দিতে দিতে বলেছিলেন শান্তনু সরখেল।

একটু ভেবে নিয়ে চঞ্চলা জবাব দিয়েছিল, 'বেশ ঢ্যাঙা।'

'কতটা?'

'প্রায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি।'

'আন্দাজ করলেন কীভাবে?'

'আমি নিজেই যে বেশ ঢ্যাঙা মেয়ে... পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি... আমার মাথা ছাড়িয়ে গেছিল।'

মনে মনে বললেন শান্তনু সরখেল, 'চৌকস মেয়ে। মর্মান্তিক ফ্যাসাদে পড়েও নিজের হাইট দিয়ে আততায়ীর হাইটের হিসেব করে

নিয়েছে।'

মুখে বললেন, 'আন্দাজি ওজন? রোগা, না ভারী?'

'অ্যাথলেটিক গড়নপেটন। না ভারী, না রোগা।'

সেটা যে ধর্ষণের সময়ে বুঝতে পেরেছে চঞ্চলা, তা আর বলল না।

'বোরখা মুখোশের ছেঁদা দিয়ে চোখ দেখতে পাচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কী রং চোখের? চাহনি কী রকম?'

'চাহনি জানোয়ারের মতো ধকধকে। যেন চামড়া ফুঁড়ে দেখছিল। রং, কুচকুচে কালো কি না বোঝা যায়নি। দেখতে পাইনি। দেখছিলাম শুধু চোখের মণিদুটো। জ্বলন্ত।'

'বাঘের চোখের মতো? বেড়ালের চোখের মতো?

'প্রায়।'

'আর কিছু নজরে এসেছিল?'

'নজরে আনা যায়নি অন্ধকারের জন্যে। তবে খেয়াল করেছিলাম।'

'যথা?'

'গলার আওয়াজ বেশ মার্জিত। শিক্ষিত কণ্ঠস্বর।'

'গুড পয়েন্ট। বুঝলেন কী করে?'

'খিস্তি করছিল না বলে।'

'আর কিছু? নাক দিয়ে কিছু টের পেয়েছেন? আই মিন আপনার

চঞ্চলা শুধু মাথায় ঢ্যাঙা নয়, মনের মধ্যেও শক্তি ধরে বিলক্ষণ। তাই ধর্ষিতা হওয়ার পরের দিন ছুটে গেছিল থানায়। থানায় কেস রেকর্ড করে বাড়ি ফিরে এসে ছটফট করেছে। তার বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মন আরও কিছু জানতে চেয়েছে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার মতো মেয়ে সে নয়

ঘ্রাণেন্দ্রিয়তে কিছু ধরা পড়েছে? এনি পার্টিকুলার সেন্ট? মেয়েলি নাক খুব প্রখর হয় বলেই প্রশ্নটা করলাম। প্লিজ হেল্প মি।'

মনে পড়ে গেছিল চঞ্চলার। পাশবিক ক্রীড়ার আদি মধ্যে অন্তে একটা সুগন্ধ টের পেয়েছে ঘ্রাণশক্তি দিয়ে।

বললে, 'হ্যাঁ, পেয়েছি। একটা পারফিউমের গন্ধ। লেগেছিল গেঞ্জিতে।'

দুই চোখে অকৃত্রিম প্রশংসাজাগ্রত করে বলেছিলেন ইন্সপেক্টর সরখেল, 'আপনার মনের জোর আছে বটে। বেশির ভাগ ধর্ষিতা মেয়ে ধর্ষণের কাহিনি চেপে যায়। কাউকে বলে না। বিশেষ করে পুলিশের কাছে। আপনি কিন্তু মন খুলে সব বলে যাচ্ছেন। আমি খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছি বলে কিছু মনে করবেন না। আমার দরকার ক্লু, জোগাচ্ছেন আপনি। গুড, গুড।'

চঞ্চলা শুধু মাথায় ঢ্যাঙা নয়, মনের মধ্যেও শক্তি ধরে বিলক্ষণ। তাই ধর্ষিতা হওয়ার পরের দিন ছুটে গেছিল থানায়। থানায় কেস রেকর্ড করে বাড়ি ফিরে এসে ছটফট করেছে। তার বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মন আরও কিছু জানতে চেয়েছে। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার মতো মেয়ে সে নয়।

তাই দু'দিন পরে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে দেখেছিল বাড়ির চারদিকে—যদি কিছু ক্লু পাওয়া যায়, এই আশা নিয়ে।

রান্নাঘরের জানলার বাইরে দেখেছিল একটা উলটোনো কাঠের প্যাকিং বাক্স। নিশার আগন্তুক নিশ্চয় এই বাক্সের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছিল। মশা আটকানোর জাল খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকেছিল। হালফ্যাশানের এই বাড়িতে গরাদ বা গ্রিল থাকে না। স্রেফ কাচ বসানো বড় পাল্লার ফ্রেম।

বাগানে পেয়েছিল প্রিয় টি-পট। এই পট সাধারণত রাখা হত জানলার ফ্রেমের ওপর। আততায়ী জানলা গলে ভেতরে ঢোকবার আগে নিশ্চয় নামিয়ে রেখেছিল মাটিতে—যাতে পড়ে গিয়ে আওয়াজ না করে।

তাহলে তো লোকটার আঙুলের ছাপ থাকতে পারে টি-পটের গায়ে।

ফের থানায় গেছিল চঞ্চলা। ইন্সপেক্টর শান্তনু সরখেলকে ব্যাপারটা বলতেই তিনি ছুটে এসেছিলেন ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্টদের নিয়ে। আঙুলের ছাপ তুলেছিলেন। পুলিশ রেকর্ডে রাখা চেনাজানা ক্রিমিন্যালদের আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলছে কি না দেখেছিলেন।

কিন্তু ছাপ মেলেনি রেকর্ডে রাখা কোনও ছাপের সঙ্গে।

হাল ছাড়েননি তা সত্ত্বেও। চঞ্চলাকে থানায় ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শয়তানটাকে যদি ধরতে পারি, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সব বলতে পারবেন তো?'

ধর্ষণের কথা বলতে চায় না কোনও মেয়েই—বিশেষ করে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। ভেবেছিলেন, চঞ্চলাও পেছিয়ে যাবে।

সে কিন্তু চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে বলেছিল, 'পারব।'

চঞ্চলার এহেন তেজি কাঠামো গড়ে তুলেছিল তার পিতৃদেব।

এক সন্তান ছিল চঞ্চলা। যাদের ভাইবোন থাকে না, তারা বড় নিঃসঙ্গ বোধ করে। চঞ্চলাকে তাই তিনি পাঁচজনের মধ্যে রেখে মানুষ করেছিলেন নাটকের দলে। ছবি আঁকার ক্লাসে রেখে মেধা বিকশিত হতে দিয়েছিলেন। পাঁচজনের মধ্যে থেকে মেয়ে বড় হয়ে উঠুক, তবেই তো সে দুনিয়াটার সঙ্গে টক্কর দিয়ে বড় হতে পারবে। জীবন সংগ্রামে হারতে চাইবে না—জিততেই হবে, এহেন মনোভাব মনের মধ্যে আসবে।

শিক্ষা তার বৃথা যায়নি। প্রয়োজনে একাই লড়ে যাওয়ার মতো মানসিকতা এসে গেছিল ভেতরে। যেখানে থাকবে, সেখানেই হবে এক নম্বর—মাথার ওপর কেউ থাকবে না। স্কুলে বরাবর ফার্স্ট হয়েছে। কলেজে সবাইকে টেক্কা মেরেছে।

বড় হয়ে প্রাণরহস্যের চাবিকাঠির অন্বেষণ করে গেছে। ডিএনএ'র ডাবল হেলিক্স নিয়ে মেতেছে।

বায়োকেমিস্ট্রিতে ডিগ্রি নেওয়ার পর বিয়েটা করে নিয়েছিল। প্রেম করে। স্বামী তরতাজা খোলামেলা মানুষ। বউকে পিএইচডি করতে উৎসাহ দিয়ে গেছিল। নিজে করত নগরনকশা করার কাজ—একটা কোম্পানিতে।

যথা সময়ে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছিল চঞ্চলা। ঝকঝকে মেয়ে। বুদ্ধির রোশনাই ঠিকরে ঠিকরে যেত চোখমুখ কথাবার্তা থেকে। প্রতিভার

তারও মুণ্ড ঢাকা ছিল বোরখার মতো কিছু একটা দিয়ে—বেরিয়েছিল শুধু চোখ!
এই লোকই তাহলে সেই লোক!
আর দেরি নয়। এবার আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখা যাক।
টি-পট-এর আঙুলের ছাপের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছিল জামিনে খালাস লোকটার আঙুলের ছাপ।

চঞ্চলা যেদিন ধর্ষিতা হয়েছিল, সেইদিন থেকে ঠিক এক বছর পর বিষমগঞ্জ থানা এলাকার স্পোর্টস কমপ্লেক্সের একটা অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় আঙুলের গাঁট ঠুকলেন ইন্সপেক্টর শান্তনু সরখেল।
পাল্লা খুলে গেল একটু পরেই। সামনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘকায় কৃষ্ণকায় এক পুরুষ। আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে নিলেন শান্তনু সরখেল। যা দেখবার দেখে নিলেন। মনের খাতায় টুকে নিলেন।
মুখে বললেন, 'আপনার নাম বিশু প্রামাণিক?'
'লোকে আমাকে সেই নামেই ডাকে।' তির্যক জবাব দিল বিশু প্রামাণিক। মুখে কথা বললেও তার চোখ ঘুরছে পুলিশ অফিসারের ওপর। যে চোখ বাঘের চোখের মতো। ধকধকে।
শান্তনু সরখেল বললেন, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'
কথা হয়েছিল বসবার ঘরে বসে। জানা গেছিল, বিশু প্রামাণিকের বয়স তিরিশ। কাজ করে একটা প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে—টাকা-পয়সা কন্ট্রোল করার কাজ। অ্যাকাউন্টিং-এর ডিগ্রি আছে। খেলাধুলোয় মন আছে। কিন্তু বন্ধুসংখ্যা খুবই কম। হাতে টাকা-পয়সা আছে যথেষ্ট। ঘরে আছে বিয়ে করা বউ। তার নাম সুস্মিতা। মদ্যশালায় যায় মাঝেমধ্যে। আছে বেশ ক'জন গার্লফ্রেন্ড।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর পয়েন্টে চলে এসেছিলেন ইন্সপেক্টর শান্তনু সরখেল, 'মোহনগঞ্জ জায়গাটায় যাতায়াত আছে আপনার?'
দ্রুততর হয়েছিল বিশু প্রামাণিকের শ্বাসপ্রশ্বাস।
মুখে বলেছিল, 'জায়গাটা জানি কোথায়। কিন্তু খুব একটা চেনাজানা নয়। আমাদের কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকেন মোহনগঞ্জে।'
ইন্সপেক্টর সোজা চলে এলেন কাজের কথায়। পুলিশি অ্যাটাক।
'মোহনগঞ্জের চঞ্চলা সেনশর্মাকে আপনি রেপ করেছিলেন?'
'আজ্ঞে না', চোখের পাতা না কাঁপিয়ে সংক্ষিপ্ত জবাব বিশু প্রামাণিকের। একটুও না থমকে। জবাবটা যেন তৈরিই ছিল আগে থেকে।
'কেসটা সিরিয়াস। ধর্ষণ যে করেছিল, সে এসেছিল রান্নাঘরের জানলা দিয়ে। ঢোকবার আগে গোবরাটে রাখা একটা টি-পট সরিয়ে নামিয়ে রেখেছিল। টি-পটে তার আঙুলের ছাপ থেকে যায়। মিস্টার প্রামাণিক, সেই আঙুলের ছাপ আপনার।'
শুকিয়ে গেল বিশুর মুখ। নিরুত্তর।
ধারালো চোখে তা দেখে গেলেন ইন্সপেক্টর। বন্দুকের গুলি খেলে মুখের যে রকম অবস্থা হয়, কৃষ্ণকায় বিশুর মুখ অবিকল সেই রকম হয়ে গেছিল ইন্সপেক্টরের চোখা কথায়। মনে মনে নিশ্চয় ভাবছিল, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।
দুঁদে পুলিশ ইন্সপেক্টর কিন্তু ওইখানেই থামেননি। শুধু কথার জেরা নয়, মোক্ষম প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন।
বলেছিলেন, 'বিশুবাবু, আপনাকে আর-একটু কষ্ট দেব।'
বিশুর মুখে কথা নেই।
ইন্সপেক্টর চালিয়ে গেছিলেন, 'চঞ্চলা সেনশর্মার বালিশে যে বীর্য পাওয়া গেছে, তার রক্তরস অ্যানালিসিস করিয়ে রেখেছি। আপনার বীর্য-র সঙ্গে তা মেলে কি না দেখতে চাই।'
ট্যাঁ-ফুঁ করতে পারেনি বিশু প্রামাণিক। বীর্য দিতে হয়েছিল। ইন্সপেক্টর সেরলজি অ্যানালিসিস করিয়েছিলেন। বালিশে পাওয়া বীর্য আর বিশুর বীর্য যে এক, তা প্রমাণিত হয়ে গেছিল। দুটোরই ব্লাড গ্রুপ 'ও'। প্রাক ডিএনএ অ্যানালিসিসে এই প্রমাণটা কম নয়।

এই একটা বছরে কিন্তু চঞ্চলার কর্মজীবনেও অনেক পরিবর্তন এসেছিল। স্বামীকে নিয়ে চলে গেছিল পাঁচশো মাইল উত্তরের করিমগঞ্জ থানা এলাকায়—নতুন কাজ নিয়ে। তিন জন ইয়ং সায়ান্টিস্ট সেখানে 'জিন প্রোব' নাম দিয়ে একটা নতুন সংস্থা খুলেছিল। ডিএনএ অনুসন্ধানের ব্যাপারে বিশেষ গবেষণার জন্যে—যাতে সংক্রামক রোগ চট করে আরও সঠিকভাবে ধরা যায়।
চঞ্চলাকে সেই সংস্থায় টেনে নেওয়া হয়েছিল ডিএনএ নিয়ে তার বিশেষ কাজকর্মের জন্যে। তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ। ওই বয়সেই হয়ে গেছিল নতুন কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট। স্বভাবগত উদ্দীপনা নিয়ে শুরু করেছিল কাজকর্ম। ডাক্তারদের কাছে পপুলার হয়ে গেছিল। ডিএনএ ফোরেনসিক টেস্টিং নিয়েও কাজ চলছিল 'জিন প্রোব' সংস্থায়। অগ্রণী হয়েছিল চঞ্চলা।
সুখেই ছিল স্বামী-স্ত্রী। বাবা আর মা মাঝে মাঝে এসে থেকে যেত মেয়ে-জামাইয়ের কাছে।
সুখের এই সংসারে একদিন এল একটা টেলিফোন। রিসিভার তুলেছিল শীতল।
শুকনো মুখে বলেছিল চঞ্চলাকে, 'পুলিশ ইন্সপেক্টর শান্তনু সরখেল-এর ফোন। একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে রেপ করার ব্যাপারে। তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে গিয়ে এভিডেন্স দিয়ে আসতে হবে।'

বিশু প্রামাণিকের উকিল এক ঘণ্টারও বেশি সময় নিয়ে জেরা করে গেছিল চঞ্চলাকে। যাবতীয় উকিলি ধূর্ততা প্রয়োগ করে। কথায় কথায় নাস্তানাবুদ করার এই টেকনিক যে উকিল যত রপ্ত করে, তার পসার তত বেশি।
কিন্তু বেশি খাপ খুলতে পারেনি চঞ্চলার কাছে। যে মেয়ে ধর্ষিতা হওয়ার পরেই থানায় ছুটে গিয়ে ডায়েরি লেখায়, সে-ও কম তুখোড় নয়। আদালত জমে গেছিল কথাকাটাকাটির ঝড়ে। চঞ্চলা যে কতখানি রণরঙ্গিণী হতে পারে, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার প্রমাণ রেখে গেছিল মুহুর্মুহু।
ধর্ষক বিশু প্রামাণিককে প্রাথমিক শুনানিতে আদৌ কাঠগড়ায় তোলা হবে কি না, এই নিয়েই লেগেছিল বাগ্‌যুদ্ধ। বিশু প্রামাণিকের চৌকস উকিল নিরন্তর কথার লড়াই চালিয়ে গেছে যাতে তার মক্কেল বিশু প্রামাণিককে কাঠগড়ায় না দাঁড়াতে হয়। একটা ব্যাপার প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে। চঞ্চলা ধর্ষকের যে বর্ণনা দিয়েছে, তার সঙ্গে কই তার মক্কেলের শারীরিক বর্ণনা একেবারেই তো মিলছে না! গায়ের চামড়ার রং থেকে পিউবিক কেশ—কিছুই তো মিলছে না। নিশ্চয় চঞ্চলার চোখের ভুল। কেননা, সেই সন্ধ্যায় এক গেলাস বিয়ার খেয়েছিল চঞ্চলা। ভ্রান্তি ঘটেছে সেই কারণেই।
শেষকালে ভেঙে পড়েছিল চঞ্চলা। ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। ফুঁসে উঠে বলেছিল, 'কী আশ্চর্য! আমি তো তখন ধর্ষককে শনাক্ত করার জন্যে মাথা ঘামাইনি—বাঁচতে চেয়েছিলাম!'
ধর্ষক বিশু প্রামাণিক কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চুপচাপ বসেছিল এককোণে। নির্বিকার মুখচ্ছবি। চঞ্চলা তার চোখে চোখ মিলিয়েছিল একবারই—ধর্ষকের হাইট আর বিশুর হাইট এক কি না—যাচাই করার জন্যে।
তখন বিশুর চোখ ছিল নিরুত্তাপ। স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে গেছিল চঞ্চলার

দুই চক্ষু।

চঞ্চলার উকিল কিন্তু কম তুখোড় ছিলেন না। সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে জজসাহেবকে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিলেন—ধর্ষণের অপরাধে আর রিভলভার সঙ্গে রাখার অপরাধে বিশু প্রামাণিকের বিচার হওয়া দরকার।

কিন্তু বিচারপর্ব শিকেয় তুলে রেখে চঞ্চলাকে ছুটতে হয়েছিল মুমূর্ষু মায়ের কাছে। লিউকিমিয়ার ফাইনাল স্টেজে ছিল মা। প্রাণে বাঁচেনি। মারা যায় বাহাত্তর বছর বয়সে।

শোকে মুহ্যমান বাবাকে এনে কাছে রেখেছিল চঞ্চলা।

কিছুদিন পরে রেললাইনের ধারে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠে গেছিল। সে বাড়ি ছ'ফুট উঁচু কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা। পাশেই ঝাঁকাল গাছের জঙ্গল।

সুবল সেন-এর পছন্দ হয়নি বাড়ি। সান্ধ্যভ্রমণ সেরে বাড়ি ফেরার সময়ে বেশ কয়েকবার মনে হয়েছে, কে যেন আড়াল থেকে দেখছে তাঁকে। নার্ভাস বোধ করেছিলেন।

জামাই কথা দিয়েছিল, শিগগিরই একটা বাড়ি কিনবে। উঠে যাবে এই ঝুপসি জায়গা থেকে।

মেয়ে ভরসা দিয়েছিল বাবাকে, 'ভয় কী?'

কিন্তু মনের ভয় কাটাতে পারেননি পিতৃদেব। কিছুদিন পরে চলে গেছিলেন কলকাতায়—নিজের বাড়িতে।

তারপর...

ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে উঠেছিল চঞ্চলা আর শীতল।

সকাল আটটায় গাড়ি হাঁকিয়ে কাজের জায়গায় চলে গেছিল শীতল। যাবার সময়ে ছ'ফুট উঁচু কঞ্চির বেড়ার পাল্লা বন্ধ করেছিল শীতল। সিকিউরিটি ল্যাচ টেনে দিয়ে দরজা লক করেছিল চঞ্চলা, গেছিল বাড়ির ভেতরে অফিস যাওয়ার আগে কয়েকটা ফোন করবার জন্যে।

কিন্তু অফিসে যায়নি।

সেদিন ছিল পরপর দুটো মিটিং। সকালের মিটিং-এ না যাওয়ায় অফিস কর্মীরা টেলিফোন করেছিল বাড়িতে। কিন্তু সাড়া পায়নি। রিং হয়ে গেছিল। ফোন গেছিল শীতলের কাজের জায়গায়।

দুপুর নাগাদ শীতল এসেছিল বাড়িতে।

দেখেছিল, চঞ্চলার স্পোর্টস মডেলের গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে। তাহলে তো চঞ্চলা বাড়িতেই আছে। গলা চড়িয়ে ডেকেছিল, 'চঞ্চলা!'

কেউ সাড়া দেয়নি।

বাগানের দরজাও তো খুলছে না এত ঠেলা সত্ত্বেও?

একটা উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে বেড়ার ওপর উঠে পড়েছিল শীতল।

দেখতে পেয়েছিল চঞ্চলাকে।

শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে। হ্যান্ডব্যাগ ছিটকে গেছে একদিকে। জুতো ছিটকে গেছে পা থেকে। মুখে কালসিটের দাগ। চুল ভিজে গেছে রক্তে।

বাড়ির মধ্যে ছুটে গিয়ে থানায় ফোন করেছিল শীতল।

পুলিশ এসে দেখেছিল, নিহত স্ত্রী-র পাশে বসে ফোলা ঠোঁট থেকে আস্তে আস্তে পিঁপড়েদের সরিয়ে দিচ্ছে শীতল।

না যৌন নিপীড়ন হয়নি চঞ্চলার ওপর। তবে পেটানো হয়েছিল নিষ্ঠুরভাবে। কশাইয়ের মতো। তারপর গলা টিপে প্রাণবায়ু বিলীন করা হয়েছিল শূন্যে। পোশাকে রক্তের মাখামাখি দাগ দেখে, আর ঘাড়, গলা, শরীরের নানা জায়গায় কালসিটের দাগ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেছিল—সহজে মরেনি চঞ্চলা—আপ্রাণ লড়াই চালিয়ে গেছিল শেষ পর্যন্ত।

সুবল সেন খবরটা পেয়েছিলেন শীতলের টেলিফোনে। ভেঙে পড়েছিলেন।

ভেঙে পড়েছিলেন ইন্সপেক্টর শান্তনু সরখেলও। ধর্ষিতা এখন আর বেঁচে নেই, কেস চলবে কী করে?

মোক্ষম চাল দিয়েছে ধর্ষক।

কিন্তু অন্য এক পুলিশ ডিটেকটিভের মনে খটকা লেগেছিল রহস্যময় এবং অতীব নিষ্ঠুর এই হত্যার প্রকৃত মোটিভ ভাবতে গিয়ে।

বলেছিলেন শান্তনু সরখেলকে, 'এমনও তো হতে পারে, চঞ্চলার স্বামীই চঞ্চলাকে খুন করে এখন সাধু সেজে দোষ চাপাচ্ছে ধর্ষকের ওপর?'

পুলিশ মাত্রই যন্ত্রমানব হয় না। ইন্সপেক্টর শান্তনু সরখেল তা ছিলেন না। সটান বলে দিয়েছিলেন মানবিকতার প্রশ্ন মাথার মধ্যে রেখে, 'অসম্ভব। স্ত্রী-কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন শীতলবাবু।'

'খুনি তাহলে ধর্ষক বিশু প্রামাণিক?'

'অবশ্যই।'

ইন্সপেক্টর শান্তনু সরখেলের মাথায় গোঁ চেপেছিল। বিশু প্রামাণিকের গতিবিধির খবর নিয়েছিলেন। চঞ্চলা-নিধনের দিন সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল গাড়ি নিয়ে ভোর রাতে।

কোথায় গেছিল, ইন্সপেক্টরের এই প্রশ্নের জবাবে ঠান্ডা চোখে শুধু বলেছিল, 'হাওয়া খেতে।'

হাওয়া খেতে বেরিয়ে যে ধর্ষিতাকেই ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিয়ে গেছে খোদ পিশাচের মতো, মুখে তা না বললেও চোখ দেখে আঁচ করতে পেরেছিলেন শান্তনু ইন্সপেক্টর।

কিন্তু প্রমাণ করতে পারেননি।

একমাত্র মেয়ের এহেন নিষ্ঠুর মৃত্যু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছিল সুবল সেনকে। কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র তিনি নন। প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়েছিলেন।

একটাই খবর এনে দিয়েছিল তারা।

চঞ্চলা-নিধনের দিন সকালের দিকে অদ্ভুত সব আওয়াজ শোনা গেছে চঞ্চলার বাড়ির দিক থেকে। কাকে যেন গলা টিপে ধরা হয়েছে। একটা বাড়ির চৌকস গিন্নি সেই আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছিলেন নিজের বাড়ি থেকে। চঞ্চলার বাড়ি পর্যন্ত গেছিলেন। কিন্তু বাগানের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে ফিরে গেছিলেন।

সেই সময়ে টিকিয়ে টিকিয়ে একটা মালগাড়ি যাচ্ছিল বাড়ির পাশ দিয়ে। খুনি কি তাহলে এই গাড়িতে উঠেপড়ে চম্পট দিয়েছে অকুস্থল থেকে?

হাল ছাড়েননি সুবল সেন। মা-মরা মেয়েটাকে তিনি বুকেপিঠে করে মানুষ করেছিলেন। শক্ত হতে শিখিয়েছিলেন। সেই শক্তির নমুনা সে দেখিয়ে গেছে ধর্ষণের পরেই থানায় গিয়ে, ধর্ষককে সাজা দেওয়ার জন্যে কোর্টে গিয়ে।

প্রাইভেট ডিটেকটিভকে দিয়ে আরও খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, চঞ্চলা-নিধনের পরের দিন বিশু প্রামাণিকের মুখে বিস্তর আঁচড়ের চিহ্ন দেখা গেছিল।

কিন্তু প্রমাণ করা যায়নি, সেই আঁচড়ানি ঘটেছে চঞ্চলার নখের জন্যে।

মোক্ষম প্রমাণ হাতের মুঠোয় এসেও যেন ফসকে ফসকে যাচ্ছে।

জেদ চেপে গেছিল সুবলবাবুর মাথায়।

ভেবেছিলেন... ভেবেছিলেন...

তারপর প্রাইভেট গোয়েন্দাদের বলেছিলেন, 'চঞ্চলা ডিএনএ গবেষণা নিয়ে মেতেছিল মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত। নতুন এই ডিএনএ টেস্ট দিয়ে কিছু কি প্রমাণ করা যায় না? টাকা লাগে লাগুক—আপনারা চেষ্টা করুন।'

কিন্তু হালে পানি পায়নি প্রাইভেট ডিকেটটিভ সংস্থা। উনিশশো পঁচাশি সালে বডি টিশু আর বডি ফ্লুইডের ডিএনএ টেস্টিং যে তখনও আঁতুড়ঘরে...

তেরো বছর পরে...

ইন্দ্রনাথ রুদ্র-র সঙ্গে একটা আর্ট গ্যালারিতে আলাপ হয় সুবল সেনের। দু'জনেই মনেপ্রাণে শিল্পী। ইন্দ্রনাথ অবসর পেলেই ভালো আঁকা ছবি দেখতে যেত। সুবল সেনও যেতেন।

পরিচয়ের পর সুবল সেন বলেছিলেন একমাত্র মেয়ের নিষ্ঠুর হত্যার কাহিনি। ইন্ডিয়া এমনই একটা দেশ যেখানে খুন করেও মানুষ বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে কি পুরানো ক্রাইমের কিনারা করা যায় না?

জেদ চেপে গেছিল ইন্দ্রনাথের। যেখানে রহস্য, সেখানেই যে সে।

ছুটে গেছিল মোহনগঞ্জ থানায়। ইন্সপেক্টর শান্তনু সরখেল এখন কোথায়, সে খোঁজ নিয়েছিল।

তিনি প্রোমোশন পেয়েছেন। রয়েছেন এখন সরকারি নথিশালায়। যেখানে রয়েছে উনিশো চৌত্রিশ সাল থেকে অমীমাংসিত তিনশো খুনের ইতিবৃত্ত।

ইন্দ্র বলেছিল, 'ধর্ষক বিশু প্রামাণিক কি এখনও বেঁচে আছে?'

'আছে। ফের বিয়ে করেছে।'

'আগের বউ?'

'ধর্ষণের কেস কোর্টে ওঠবার পর সে আর বিশুর সঙ্গে থাকতে চায়নি।'

'ডিভোর্স?'

'হ্যাঁ।'

'বিশু ফের বিয়ে করেছে! বেশ, বেশ! বাচ্চাকাচ্চা?'

'দুই ছেলে।'

'বিশুর কেস কদ্দুর এগিয়েছিল?'

'ধর্ষণ তো আর প্রমাণ করা গেল না। মার্ডারও নয়। বেকসুর খালাস পেয়ে বিজনেসে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে চাকরি করে যাচ্ছে। একজন গার্ল ফ্রেন্ডও রেখেছে।'

'এত খবর রাখেন আপনি?' চোখ নাবিয়ে বলেছিল ইন্দ্রনাথ।

'হেরে গেছিলাম বলে', মস্ত গোঁফ ঝুলিয়ে বলেছিলেন শান্তনু সরখেল।

'কিন্তু হেরে যাওয়ার মানুষ আপনি নন, মি. সরখেল', চোখে চোখে চেয়ে বলেছিল ইন্দ্রনাথ।

শান্তনু সরখেল নিশ্চুপ।

ইন্দ্রনাথ বলেছিল, 'মামুলি পুলিশ অফিসার আপনি নন। তাই ছিনেজোঁকের মতো বিশু প্রামাণিকের সাজা চেয়েছিলেন। চঞ্চলা খুন হয়ে যাওয়ায় তা পারেননি।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে শান্তনু বলেছিলেন, 'তা বটে। এ এক যন্ত্রণা। হেরে যাওয়ায় যন্ত্রণা।'

'আমি কিন্তু হারতে চাই না।'

'কী করতে বলেন?' স্থির চোখে বলেছিলেন শান্তনু।

'চঞ্চলার ডেডবডিতে যা কিছু পেয়েছিলেন, তা কি রেখে দিয়েছিলেন?'

ইন্দ্রনাথের চোখে চোখ মিলিয়ে শান্তনু বলেছিলেন, 'আঁচ করলেন কী করে?'

'ডিটেকশন আমার প্রফেশন বলে। রেখেছেন?'

'রেখেছি। খুনের দিন যে পোশাক পরেছিল, তা বহুবার ঘেঁটেছি। কিছু পাইনি। পরনে তো বাইরে যাওয়ার পোশাক ছিল না। ছিল একটা নাইটি। পায়ে ছিল চটি। ঠিকরে গেছিল একপাটি বাগানে মার খাওয়ার সময়ে। কান থেকে একটা দুল ঠিকরে গেছিল পিটুনি খাওয়ার সময়ে—লতি ছিঁড়ে ঠিকরে গেছিল। হ্যান্ডব্যাগের সব জিনিস ঘেঁটেছি—যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়। পাইনি। খুনির আঙুলের ছাপ? না। একেবারে নয়। নিজের বাগানে দাঁড়িয়ে মার খেয়ে মরেছে মেয়েটা। স্যাড কেস।'

বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন শান্তনু সরখেল।

ইন্দ্রনাথ খুব আস্তে বলেছিল, 'একটা ব্যাপার জানতে পারি?'

'বলুন।'

'মস্ত ধাঁধায় পড়ে অনেক মানুষ অনেক সময়ে নিয়মের বাইরে গিয়ে অনেক কাজ করেন।'

'এ কথা কেন বলছেন?'

'থানার দারোগা থাকার সময়ে চঞ্চলার কেসে যা কিছু পেয়েছিলেন সে সব থানায় না রেখে কি আপনার কাছে রেখেছেন?'

চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখা একটা পেপার ওয়েট নাড়াচাড়া করতে করতে শান্তনু বলেছিলেন, 'যদি বলি হ্যাঁ, তাহলে আপনার কাজের কি সুবিধে হবে?'

'কী-কী জিনিস রেখেছেন, সেটা জানবার পর জবাবটা দেওয়া যাবে।'

'তেরো বছর পরে?'

'ডিএনএ বিজ্ঞান এখন অনেক এগিয়েছে শান্তনুবাবু। বলুন না, কী-কী রেখেছেন?'

ময়নাতদন্তের সময়ে চঞ্চলার ডান হাতের কাটা নখ। তাতে লেগে রক্ত। আর ছিল একটা কাঠের গুঁড়ো।'

'কাঠের গুঁড়ো?'

'রক্তমাখা।'

হীরে জ্বলে উঠেছিল ইন্দ্রনাথের চোখে, 'মানুষের ডিএনএ নিয়ে রিসার্চ এখন অনেক এগিয়েছে, শান্তনুবাবু। কাঠের গুঁড়োয় লেগে থাকা রক্ত খুনির কি না, তা প্রমাণ করা শক্ত হবে না। কোথায় সেই কাঠের গুঁড়ো?'

'একটা প্লাস্টিক বাক্সের মধ্যে। কিন্তু—'

ইন্দ্রনাথ এই পর্যন্ত বলে এক টিপ নস্যি নিয়ে চেয়ে রইল কড়িকাঠের দিকে।

তেড়ে উঠেছিল কবিতা, 'সেই কাঠের গুঁড়ো নিয়ে তুমি কী করেছিলে ঠাকুরপো?'

ভিজে বেড়ালের মতো বলেছিল ইন্দ্রনাথ, 'চলে গেছিলাম ক্যালিফোর্নিয়ার SERI অর্থাৎ সেরোলজিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। ডিএনএ টেস্টিং করিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছি, কাঠের গুঁড়োয় লেগেছিল চঞ্চলার রক্ত আর—'

'আর কী?'

'মানুষ-পশু বিশু প্রামাণিকের রক্ত।'

*শিল্পী : সুদীপ্ত দত্ত*

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

# কোটিপতির কন্যা

অদ্রীশ বর্ধন

হ্যাঁ, আমি কোটিপতির কন্যা হয়ে জন্মেছিলাম। মরতেও চলেছি, কোটিপতির কন্যা হয়ে।

এই আমার ইচ্ছামৃত্যু। অন্যায় কিছু করছি না। আইন যতদূর জানি, ইচ্ছামৃত্যুতে অধিকার আমার আছে। আমার জীবন নিয়ে আমি যা খুশি করতে পারি, তাতে কারও কিছু বলার নেই। আমি হত্যা করছি আমাকে। তাতে কার কী? সংবিধানের আর্টিকেল 226 আমার জানা আছে। আমার স্বাধিকার থেকে কেউ আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না। আমার ইচ্ছামৃত্যু থেকেও নয়।

সুতরাং আমার এই ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর আর রোম্যান্টিক জীবনের শেষ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে লিখতে বসেছি আমার ইচ্ছাপত্র।

অনেক কিছুই পেয়েছি এই জীবনে, না চাইতেই পেয়েছি। কিন্তু যা চেয়েছি, তা পাইনি। সেটা পেলে হয়তো আমাকে আজ এই ইচ্ছাপত্র লিখতে বসতে হতো না।

আমি চেয়েছিলাম নীতিশকে।

নীতিশ কে? ভালো প্রশ্ন করেছেন। নীতিশ একজন পুরুষ। পুরুষ বলতে যা বোঝায়, সেই পুরুষ। পুরুষসিংহ বললেও একটুও বাড়িয়ে বলা হয় না। তাকে দেখতে সুন্দর, তার কথা সুন্দর, তার চাহনি সুন্দর, তার শরীরের বাঁধুনি সুন্দর। তার এই সৌন্দর্য দিয়ে সে আমাকে জয় করে নিয়েছিল।

নীতিশ! নীতিশ! নীতিশ! ভালোবাসা কাকে বলে, তুমি তা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছিলে। আজ তুমি নেই, আমিও থাকতে চাই না।

তুমি নেই, একথাই বা বলি কি করে! তুমি আছ বইকি—রক্তমাংসের স্থূল শরীরে তুমি আর নেই। কিন্তু তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ। সূক্ষ্ম শরীরে তুমি আছ। বিদেহী হয়েও তুমি আমার কাছে কাছে আছ। তুমি যে আছ, বিদেহী হয়েও সে প্রমাণ তুমি বারবার আমার কাছে রেখে গেছ।

নীতিশ, আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। একটু পরেই যাব। নাই বা থাকল দেহ। দেহ নিয়েই তো এত ঝঞ্ঝাট। এত উৎপাত। এত বিড়ম্বনা। আমার এই দেহটা অভিশপ্ত। আমি মূর্তিমতী পাপীয়সী—কোনও পাপ না করেই। তাই এই দেহ ত্যাগ করাই যাক।

নিশ্চয় তুমি অশরীরী চোখ নিয়ে আমার এই লেখা পড়ে যাচ্ছ—আর বলছ, ফুল্লরা, এমন দেহ ত্যাগ করো না। এমন সুন্দর দেহ কটা মেয়ে পায়?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি আমি সুন্দরী। মেকআপ করা, বিউটিশিয়ানের হাতে গড়া সুন্দরী নই। ভেজাল দেওয়া সুন্দরী নই। নিখাদ সুন্দরী।

কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কি মনে হচ্ছে

জানো, নীতিশ? বিধাতা আমার ভেতরে একটু ভেজাল দিয়ে দিলে ভাল করতেন। তাহলে আমার জীবনটাকে এইভাবে শেষ করে দেওয়ার জন্যে মনকে তৈরি করতাম না।

কী ভেজাল? ও হরি! সেটা যদি তুমি আগে জানতে, কক্ষণো আমাকে ভালবাসতে না। যে মেয়ের মধ্যে এই ভেজাল থাকে, সেই মেয়েকে কোনও পুরুষ তনুমন দিয়ে ভালবাসতে পারে না। তখন আর চুয়া আর চন্দনকে নিয়ে গল্প লেখা যায় না, রোমিও-জুলিয়েট আর লায়লা-মজনুর গল্পও যুগ যুগ ধরে প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেমের বহ্নিশিখায় ইন্ধন যুগিয়ে যেতে পারত না।

সবুর! সবুর! অত ছটফট করো না। আমারও একটা সূক্ষ্ম সত্তা আছে। সেই সত্তা দিয়ে বেশ টের পাচ্ছি, ভেজালটা জানবার জন্যে তুমি অধীর হয়েছো।

নীতিশ, পুরুষ চায় নারীর সৌন্দর্য, আর নারী চায় পুরুষের ঐশ্বর্য। এই ফরমুলা মেনে চলে যে মেয়ে ভালবাসে, তার ভালবাসার মধ্যে থাকে ভেজাল।

আমার তো মনে হয়, আজকাল ষোল আনা বিয়ে হচ্ছে, এই ভেজালকে সামনে রেখে। মেয়ের বাপ-মা দেখেশুনে যে-বিয়ে দিচ্ছেন, সেখানে তো আগে দেখা হচ্ছে, ভাবী জামাইয়ের পকেট ভারী কিনা, বাড়িঘরদোর আছে কিনা। মেয়ের সঙ্গে ছেলের আদৌ ম্যাচিং হলো কিনা—সে সব দেখেও দেখা হয় না। তখন বলা হয়, সোনার আংটি বেঁকা হলেও তা সোনা। অর্থাৎ কেলেকুচ্ছিৎ, অথবা লম্পট-দুশ্চরিত্র, অথবা ঘুষখোর কেরিয়ারিস্ট হলেও কিছু এসে যায় না।

এই হলো ভেজাল। মেয়ের বাপ-মা এই ভেজাল ইচ্ছে করেই মেয়ের মনের মধ্যে চালান করে দেন। দাম্পত্য জীবনে প্রেম আসবে কি আসবে না—তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার বোধ করেন না। তাঁরা দেখেন সিকিউরিটি—মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন যেন সোনার সংসার হয়ে ওঠে।

আরে বাবা, যেখানে প্রেম নেই, সেখানে রইল কি? বাড়িগাড়ি দাসদাসী কি প্রেমের পরিপূরক?

আশ্চর্য হচ্ছে এই যে, প্রেম করেও যে-মেয়েরা বিয়ে করছে—তারাও আগেভাগে যাচাই করে নিচ্ছে হবু বর ফরেন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছে কিনা, ভিসা অথবা এ.টি. এম কার্ড পকেটে রেখেছে কিনা, গাড়ি কিনেছে কিনা, বাপের সম্পত্তি পাবে কিনা।

ভাবতেও ঘেন্না হয়। এ তো মেকি প্রেম। ভেজাল মিশোনো প্রেম।

নীতিশ, তুমি জানো, আমি কি ধাঁচের মেয়ে। আমার রূপ আর রুপো দুটোই আছে। তোমার প্রথমটা আছে—দ্বিতীয়টা নেই। তবুও আমি তোমার গাছে নিজেকে বেঁধে ফেললাম। কারণ, তুমি অনেক বড় গাছ। অনেক...অনেক বড়। মেয়েরা চায় অবলম্বন—যাকে হেঁয়ালি করে বলা হয়েছে ঐশ্বর্য। পুরুষের প্রকৃত ঐশ্বর্য তার পৌরুষ—তার টাকাপয়সা নয়। এই ঐশ্বর্য অনিত্য—আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। কিন্তু পৌরুষ? যাবার নয়। যৌবন থেকে বৃদ্ধ—থেকে যায়। বৃদ্ধ সিংহও সিংহ। আমি সেই পুরুষকে ভালবেসেছিলাম। এখনও বাসি। জন্ম জন্ম ধরে বাসব।

কিন্তু আমি যাঁর কন্যা বলে পরিচিতি লাভ করেছি এই দুনিয়ায়—তিনি সেভাবে তোমাকে দেখতে পারেননি। টাকার স্কেল দিয়ে তিনি মানুষ বিচার করেন। তোমাকেও বিচার করেছিলেন।

মনে হচ্ছে যেন কিছু বলছ? পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটছি কেন?

নীতিশ, আমার লেখা কইবে কথা, যেদিন আমি রইব না। তোমাকে ভালবেসে অনেক কষ্ট পেলাম—তোমাকেও দিলাম। লিখে যাব না সে কথা? নিঃশেষে মুছে যাব পৃথিবী থেকে? দুনিয়াকে জানিয়ে যাব না বাবার অপকীর্তি? বাবা হিসেবে আমার বার্থ সার্টিফিকেটে যাঁর নাম লেখা আছে, তাঁর কথা আমি ছাড়া বলবে কে? আমি না তাঁর মেয়ে?

শুধু মেয়ে বললে কম বলা হবে। একমাত্র সন্তান। তাঁর কোটি মুদ্রা দামের সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ।

সেই আমি চলে যাচ্ছি দুনিয়া ছেড়ে—বাবাকে ছেড়ে—মাকে ছেড়ে—তোমার কাছে। আজকের পয়সা-পাগল যে মেয়েরা চোখের বিদ্যুৎ মেরে প্রেমিক শিকার করছে, গণ্ডায় গণ্ডায় প্রেমিক বধ করে ওজনদার প্রেমিককে বঁড়শিতে গেঁথে তুলছে—তাদের কাছে অন্তত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকুক আমার এই কাহিনী। সব পেয়েও আমি সব ছেড়ে যাচ্ছি—তোমাকে পেলাম না বলে।

সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে লজ্জায় মরে যাই আমি। তোমার কাছে আর কোনোদিন মুখ দেখাতে পারব বলে মনে হয়নি। ছিঃছিঃ! মানুষকে মানুষ বলে যিনি জ্ঞান করেন না, তিনি কি মানুষ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি আমার বাবার কথা বলছি। গ্রেট রবীন চৌধুরীর কথা বলছি।

বিজনেস-টাইকুন রবীন চৌধুরী নিজেকে স্বয়ং ঈশ্বর বলে মনে করেন বলেই তোমাকে ভিখিরি বলতে পেরেছিলেন!

ভিখিরি! ভিখিরি কাকে বলে, উনি তা জানেন না। ঐশ্বর্য কাকে বলে, উনি তাও জানেন না। এই জ্ঞানটা যার আছে, সে তোমাকে কড়ি দিয়েও কিনতে পারবে না—সোনা দিয়ে তো নয়ই।

আর শেষেরটাই উনি সত্যি বলে মনে করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যার পকেটে কানাকড়িও নেই—তাকে কিনা তাঁর কন্যা সোনা দিয়ে কিনতে যাচ্ছে!

তাই তোমাকে 'গেট আউট' করেছিলেন বাড়ি থেকে।

নীতিশ, তোমাকেও বলিহারি যাই। কেন গেছিলে ওঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে? আমাকে আগে বললে এই অপমান তোমাকে পেতে হতো না। আমি আমার বাবাকে চিনি। কিন্তু তুমি চিনতে না। পরে অবশ্য হাড়ে হাড়ে চিনেছ। জীবন দিয়ে চেনার মাশুল দিয়ে গেলে।

তারপর, তুমি যেটা করে বসলে, সেটা অন্যায়। খুবই অন্যায়। তোমার যুক্তিতে অবশ্য প্রেমে আর রণে কোনও অন্যায় নেই। তাই তুমি কোটিপতির কন্যাকে জয় করবার জন্যে লাখোপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখলে!

অবশ্য স্বপ্নটা তুমি নিজে দ্যাখোনি —তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল তোমার ওই বন্ধু প্রকাশ। কিন্তু সে তো অন্যায় পথে লাখোপতি হতে বলেনি। সাইড বিজনেস করতে বলেছিল, অফিসে অর্ডার সাপ্লাই করতে বলেছিল, এম-ডি নির্ঘাৎ তোমাকে হেল্প করতেন—তুমিও পেটি ক্লার্ক থেকে লাখোপতি বনে যেতে।

কিন্তু বাড়ি থেকে ভিখিরি বলে হাঁকিয়ে দেওয়ায় তোমার মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছিল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে তোমার মতন মানুষের। মানে, পুরুষের। তুমি পৃথ্বীরাজ চৌহান ভেবে বসলে নিজেকে! আমার নিজেরও মনে হয়, আগের কোনও এক জন্মে তুমি ছিলে পৃথ্বীরাজ—দিল্লি, আজমির আর বর্তমান রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অংশের রাজা পৃথ্বীরাজ—পয়লা নম্বর গোঁয়ার, পয়লা নম্বর প্রেমিক, পয়লা সারির বীর পৃথ্বীরাজ। আর আমি ছিলাম কনৌজের রাজপুত রাজা জয়চাঁদের মেয়ে সংযোগিতা, ওরফে সংযুক্তা। শৌর্য আর বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলে আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে—আমার সেই জন্মের বাবা জয়চাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

যদিও ঐতিহাসিকরা বহুল প্রচারিত এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে একমত নন—আমার কিন্তু কাহিনীটা দারুণ ভাল লাগে। এই না হলে প্রেম, এই না হলে পৌরুষ। মেয়েরা এই রকম পুরুষদেরই ভালবাসে—মানে, আমার মতন মেয়েরা—যাদের কাঞ্চন দিয়ে জয় করা যায় না—

সেই ভালবাসাই বোধহয় জন্ম জন্ম ধরে আমাদের কাছাকাছি এনেছে—আবার দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমার তো মনে হয়, সেই জন্মের জয়চাঁদ এই জন্মে রবীন চৌধুরী—সে জন্মে হেরে গেছিল তোমার পৌরুষের কাছে—হারিয়ে দিয়েছিল তোমাকে মহম্মদ ঘুরির কাছে—খতমও করিয়ে দিয়েছিল। এ-জন্মে ঝাল তুলেছে তোমাকে বাড়ি থেকে 'গেট আউট' করে দিয়ে।

কারণ, এ জন্মে তুমি পেটি ক্লার্ক।

কিন্তু এ-সব কি হাবিজাবি লিখে যাচ্ছি। মরবার সময় ঘনিয়ে এসেছে বলেই বোধহয় আমার মাথাটাও খারাপ হয়ে গেছে। হোক খারাপ। মরণদশায় যদি প্রাণের কথাই না লিখব তো লিখব কখন?

যা বলছিলাম, লাখোপতি হওয়ার আইডিয়াটা তোমার বন্ধু প্রকাশ দিয়েছিল ভালই। আমাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজও করতে বলেছিল। আর কি বলেছিল? লঙ্কাপুরী থেকে সীতাকে উদ্ধার করতেই হবে।

এই কথাটা অবশ্য ঠিক বলেনি —আপাতদৃষ্টিতে। রবীন চৌধুরী তো আর পরস্ত্রী হরণ করেননি—তিনি রাবণ নন এবং তাঁর বাড়িটাও লঙ্কাপুরী নয়। অবশ্য ঝোঁকের মাথায় প্রাণের বন্ধুরা উল্টোপাল্টা উপমা দিয়েই ফেলে। সে সব ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

তবে হ্যাঁ, না জেনেই তোমার বন্ধু প্রকাশ একটা সাচ বাৎ বলে ফেলেছিল। সেটা কী, সেটা একটু একটু করে ভাঙব।

কারণ, এই কাহিনীর মূল রহস্যটা তো সেইখানেই। গোড়ায় বলেছি, লিখতে বসেছি ইচ্ছাপত্র—কিন্তু চুটিয়ে লিখে যাচ্ছি আত্মকাহিনী। ইচ্ছাপত্র তো উইল। আত্মকাহিনী কি উইল হয়?

হয়, হয়। আমার ইচ্ছে, এই কাহিনী কোনও পত্রিকায় প্রকাশ পাক—অপটু হাতের লেখা হলেও এর মধ্যে যে দারুণ রহস্য আছে, তা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে বেরোলে আরও মারকাটারি লেখা হতো মানছি—কিন্তু মূল ব্যাপারটা তো পাঁচজনে জেনে যাবে—তাহলেই আমার বদলা নেওয়া হবে। সুইসাইড করেছি মোমেনটারি ইনস্যানিটির বশে—এটা বলবার স্কোপ আর থাকবে না। রীতিমতো আঁটঘাট বেঁধে বিদায় নেব মরজগৎ থেকে—যাব তোমার কাছে—যিনি তোমার অকালে পরলোকে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করেছেন—তাঁকে বেশ ভালোভাবেই ফাঁসিয়ে যাবো।

তোমার ওই অন্যায় কাজটা কিন্তু আমি বরদাস্ত করতে পারিনি। প্রেমে আর রণে কিছু অন্যায় নেই মানছি—তাই বলে তুমি টাকাচোর হবে? ভাল্লা ভদ্রলোক ক্যাশ চার লাখ দিলেন তোমার এম-ডি মিঃ চ্যাটার্জীকে, মিঃ চ্যাটার্জী কত বিশ্বাস করে ব্রীফকেস ভর্তি সেই টাকা তোমার হাতে তুলে দিলেন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার জন্যে—তুমি তাঁর বিশ্বাসকে চোট দিলে?

কাজটা ভাল করোনি নীতিশ, মোটেই ভাল করোনি। প্রকাশ তোমায় বলেছিল, ব্যবসা করে লাখোপতি হতে—তাহলে রবীন চৌধুরী নিজের হাতে গেট খুলে দিয়ে তোমাকে 'গেট ইন' করাতেন। কিন্তু তোমার মাথায় এমনই ভূত চাপল যে বিবেককে বিসর্জন দিয়ে চার লাখ চুরি করে বসলে।

শুনেছি, পুরুষরা প্রেমে পড়ে সব হারানোর জন্যে—আর মেয়েরা প্রেম করে সব পাওয়ার জন্যে। নীতিশ, তুমি প্রকৃতই প্রেমিক। তাই ফুল্লরার সঙ্গে প্রেম তোমাকে বিবেকহীন বানিয়ে দিল। সবই তো হারালে। যার বিবেক নেই, তার আর রইল কী?

আরে বোকা, তুমি যদি তোমার বন্ধু প্রকাশের কথামতো চলতে, আমাকে হরণ করে নিয়ে রেজিস্ট্রি ম্যারেজটা করে নিতে পারতে—একদিন দেখতে চার লাখ ইনটু অনেক লাখ তোমার পায়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে—কারণ তোমার বউ কোটিপতির কন্যা! রবীন চৌধুরী রেগে টং হলেও কোটিপতির বর হয়েই থাকতে। সে আর এক রহস্য—যথাসময়ে প্রকাশ করব।

হঠকারিতার ফল কখনও ভাল হয় না। তোমারও হলো না। জন্মজন্মান্তরের প্রেয়সী আমি—আমারও হবে না।

আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। কি বড় চাঁদ দেখা যাচ্ছে জানলা দিয়ে। মনে পড়ছে তোমার উদাত্ত গলার আবৃত্তি—"দূরে বহুদূরে... স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে... খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে...মোর পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়ারে।"

আমি টিটকিরি দিয়ে বলেছিলাম —"প্রিয়তম, দুঃখের বিষয়, এটা শিপ্রানদী নয়—গঙ্গানদী ; আরও দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্বজন্মে তাহলে অনেকগুলো প্রেম করেছিলে—আমি ছিলাম তোমার প্রথমা প্রিয়া!"

তুমি আমার গাল টিপে দিয়ে বলেছিলে—"দুষ্টু!"

আর আমি আঙুল তুলে বুদ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়ে বলেছিলাম—"সাক্ষী উনি। বিয়ে হয়ে গেল আমাদের।"

স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। নীতিশ, আবার আর একটা জন্মের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে আর আমাকে।

কোত্থেকে কোথায় চলে এলাম। রবীন চৌধুরীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্যে তুমি চোরাই টাকা দিয়ে মারুতি কিনলে—যেহেতু সেই ভদ্রলোক মারুতি চড়েন।

নীতিশ, আমি যদি তোমার বউ হওয়ার চান্স পেতাম এই জন্মে—তাহলে তোমাকে সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে চড়াতাম। তোমার বউ তাতেই সুখী থাকত। সে যে অনেক পেয়েছে—যা পায়নি, তা তোমার মধ্যে পেয়ে যেত বলে।

কিন্তু তা হবার নয় বলে তুমি টাকা চুরি করলে, মারুতি কিনলে, মল্লিকাকে দিয়ে চিঠি পাঠালে। সেই চিঠি পড়বি তো পড় রবীন চৌধুরীর হাতেই পড়ল।

সংযুক্তা হরণের প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল তক্ষুণি। রবীন চৌধুরীর সে কী চিৎকার বারান্দা থেকে—"লছমন সিং, গেট বন্ধ করো!"

ডাকাতে হুঙ্কারও ওই হুঙ্কারের তুলনায় অনেক ভদ্রস্থ।

এর জন্যে দায়ী আমি মানছি। আমার হাত যদি না কাঁপত, তোমার পাঠানো চিঠি আমি ব্লাউজের ফাঁকে ভালভাবেই গুঁজে রাখতাম। কিন্তু আমার অবস্থা তখন বিলক্ষণ কাহিল। তুমি তো লিখে খালাস—"দেশপ্রিয় পার্কের পাশে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব। বিকেল চারটের মধ্যে চলে এস। কলকাতা ছেড়ে আমরা বহুদূর চলে যাব। যেখানে তোমার বাবার হাত পৌঁছবে না। মনে কোনও দ্বিধা-সঙ্কোচ না রেখে বেরিয়ে পড়ো। বাড়ি থেকে বেরোনোর বন্দোবস্ত করে দেবে মল্লিকা। এক কাপড়ে চলে এসো। বাকি দায়িত্বটা আমার।"

খুবই রোম্যান্টিক পত্র। আচমকা সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। নার্ভাস হবো না? তোমারই বা দোষ কী। রবীন চৌধুরী আমার কলেজ যাওয়া বন্ধ করেছেন, কড়া পাহারায় দোতলায় রেখেছেন, টেলিফোন পর্যন্ত ধরতে দিচ্ছেন না। লন্ডনে পিসির কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় করছেন। আমার সঙ্গে কনট্যাক্ট না থাকায় চিঠির শরণ তোমাকে নিতেই হয়েছে। মল্লিকাও ডাকাবুকো মেয়ে। ওকে তো আমরা কলেজে ফুলন দেবী বলে খেপাই। ও ছাড়া ওই চিঠি আমার কাছে আনবার সাহস কারও ছিল না।

কিন্তু আমার নার্ভাসনেসের ফলেই দফারফা হয়ে গেল সংযুক্তা হরণের মডার্ন প্ল্যান। চিঠি পড়ে গেছে ব্লাউজের ফাঁক থেকে—আমি কি ছাই তা জানি।

বাবার চিৎকার শুনে তাই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল আমার। যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা—আমি তখন হুবহু তাই। যে বাড়ি বলতে গেলে আমারই বাড়ি, যে বাড়ির দারোয়ান কোলেপিঠে করে আমাকে মানুষ করেছে—সে কিনা গেট বন্ধ করছে দুমদাম আওয়াজ করে—বিলকুল ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে।

বাবার এ হেন রুদ্রমূর্তি সে তো কখনও দেখেনি। বিশেষ করে ওই হুঙ্কার—গেট বন্ধ করে মেয়েকে বাড়ি থেকে বেরতে না দেওয়ার হুঙ্কার।

তুমি তো দেখেছ আমাদের বাড়ির গেট। বারো ফুট উঁচু একখানা ইস্পাতের পাল্লা—চাকার ওপর গড়িয়ে আসে দেওয়ালের গা থেকে—টেনে টেনে বের করতে হয়। ভীষণ ভারী। একবার বন্ধ হয়ে গেলে হাতি ঢুঁ মারলেও ও গেট আর ভাঙবে না। ঠিক যেন কেল্লার ফটক।

লছমন সিং বাবার বাজখাঁই চিৎকার শুনে ঘাবড়ে গিয়ে যখন পেল্লায় গেটের পাল্লা ধরে শরীর বেঁকিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে টানছে, বাবা-ও দোতলার বারান্দা থেকে উধাও হয়েছেন—মানে, নিচে তেড়ে আসছেন—ঠিক সেই সময়ে মল্লিকা এফ-এম রেডিও-র মতন দেখতে একটা পাতলা কালো জিনিস আমার ব্লাউজের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে, তার ওপর শাড়ির আঁচল টেনে ঢাকা দিয়ে বললে—"এটা যেন কারও চোখে না পড়ে। আমি পালাচ্ছি।"

পাল্লা তখনও পুরো বন্ধ হয়নি। বাবা তখনও নিচে নামেননি। সুট করে উধাও হয়ে গেল মল্লিকা। ও এক মেয়ে বটে।

বাবা নিচে নামলেন তারপরেই। মল্লিকাকে হাতেনাতে পাকড়াও করতে না পেরে গেটের ফাঁক দিয়ে তেড়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

কিন্তু কোথায় মল্লিকা? সে কি এত বোকা মেয়ে? আমাকে নিয়ে দেশপ্রিয় পার্কের পাশে চারটে নাগাদ পৌঁছবে বলে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। সেই ট্যাক্সিতে উঠেই হু-উ-উ-স করে বেরিয়ে গেল বাবার নাকের ডগা দিয়ে।

ফুটন্ত লাভার মতন অবস্থায় ফিরে এলেন রবীন চৌধুরী দ্য গ্রেট। তেড়ে গেলেন লছমন সিং-এর দিকে—"ইউ ব্লাডি ব্লাইটার! তোকে গেট বন্ধ করতে বলেছিলাম মেয়ে দুটোকে আটকানোর জন্যে! তোর পেছন দিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেল—আর তুই গেট টেনেই চলেছিস!"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল লছমন সিং। রাশভারি মালিককে এভাবে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে সে কোনও দিন শোনেনি।

বাড়ির কেউ শোনেনি। ঠাকুর, ঝি, চাকর হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেছে একতলার উঠোনে। দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে মা। মুখ থমথমে। ওইখান থেকেই আস্তে জিজ্ঞেস করল—"কি হয়েছে?"

ব্যস, নিভে গেলেন রবীন চৌধুরী। মায়ের এই দাপট বরাবর লক্ষ্য করেছি। বাড়ির কাজের লোকেদের কাছে মা একেবারে মাটির মানুষ। এত বড় বাড়ির গোটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মায়ের হাতে। অথচ মা কখনও গলা চড়িয়ে কথা বলে না। কিন্তু সবই ঘড়ির কাঁটার মতন টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে। পাম্প খারাপ হলে মিস্ত্রি-কে কি করতে হবে, তা বুঝিয়ে দেবে মা। গাড়ি খারাপ হলে সে ব্যবস্থাও করে দেবে। বাবার তর্জন-গর্জন স্রেফ ওই অফিস ঘরে। সংসারে তিনি যেন

কেউ নন—মা-ই সব।

সেই মা তার দশভুজা রূপে বারান্দা আলো করে দাঁড়িয়ে যখন জিজ্ঞেস করল—"কি হয়েছে?" বাবার ভেতরে যেন লোডশেডিং ঘটে গেল তৎক্ষণাৎ।

লছমন সিং-ও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সেই সঙ্গে আমি।

আমি জানি, অন্যায় করতে যাচ্ছিলাম। বাড়ির নাম ডোবাতে যাচ্ছিলাম। গোটা সমাজে টি-টি পড়ে যেত আমার উধাও হওয়া নিয়ে। বাড়ি থেকে পালানো ছেলেদের এই ব্যাপারে সুনাম-ই হয়—হ্যাঁ, একখানা ডাকাবুকো ছেলে বটে—বাপ-মায়ের আঙুল-ধরা ছেলে নয়।

কিন্তু মেয়েদের কপালে থাকে অনেক দুর্গতি। অনেক দুর্নাম।

নীতিশ, তুমি নিশ্চয় আঁচ করে নিয়েছিলে, আমিও পড়ব এই দোটানায় তাই ভাববার সময় দাওনি। মল্লিকাকে দিয়ে ঝটিতি অ্যাকশন নিয়েছিলে।

নিভে গেলেও বাবা তোমার পাঠানো চিঠিখানা বারান্দার দিকে তুলে নাড়তে নাড়তে বললেন—"দ্যাট স্কাউন্ড্রেল...দ্যাট স্কাউন্ড্রেল!"

"ওপরে এস," আবার সেই ঠাণ্ডা গলায় বললে মা। বলে চলে গেল ঘরের মধ্যে।

বাবা আবার রক্তচোখে তাকালেন আমার দিকে। আমাকে আর কিছু বলতে হলো না। ঘাড় হেঁট করে পা বাড়ালাম সিঁড়ির দিকে।

দোতলায় আমাদের একটা বসবার ঘর আছে। আত্মীয়স্বজন এলে এই ঘরে বসে কথা বলা হয়। মা বসেছিল এই ঘরে। শান্ত চোখে তাকিয়েছিল মানুষ সমান বিশাল অয়েল পেন্টিংটার দিকে। মায়ের ছবি। বাইরের আলো থেকে যেন আঁধার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে আমার যুবতী মা—যৌবন যখন ফেটে পড়ছে সারা শরীরে—তখন। আঁধার ঘরে জ্বলছে লম্বা তেপায়ার ওপর দাঁড় করানো একটা প্রদীপ। নিশ্চয় ঠাকুরঘর। মা দু'হাতে দরজায় পর্দা দু'পাশে সরিয়ে চৌকাঠে দাঁড়িয়েছে। প্রদীপের আলো মায়ের মুখের একপাশে পড়েছে—আর একপাশে আলো-আঁধারে ঢাকা থাকলেও অস্পষ্ট মুখাকৃতি দেখা যাচ্ছে। দুই চোখে যেন দুটো প্রদীপ জ্বলছে। চোখের মণিতে প্রদীপশিখার প্রতিফলন অবশ্যই। কিন্তু শুধু ওই চোখ দুটোর জন্যেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে গোটা ছবিটা। ছবির মধ্যে থেকে সত্যিই যেন আমার অপরূপা মা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতে চায়। এই ঘরে। বসবার ঘরে। যদিও এ ঘরে আঁধার নেই। বাবার পেছনে আমি যখন এই ঘরে ঢুকলাম, মা তখন একদৃষ্টে ওই ছবির দিকে তাকিয়ে আছে।

এ ঘরে এই একখানা ছাড়া আর ছবি নেই। বাবা যে মা-কে কতখানি ভালবাসেন, এই ছবিই তার প্রমাণ। আর কোনও ছবি তিনি ভালবাসেন না। তাই ঘরে ঠাঁই দেননি।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা গিয়ে বসলেন মায়ের পাশে—লম্বা সোফায়।

মা ছবির দিকেই তাকিয়ে রইল।

বাবা বললেন—"দ্যাখো, দ্যাখো, তোমার মেয়ে কি করতে যাচ্ছিল দ্যাখো।"

বলছেন আর তোমার লেখা চিঠিখানা মায়ের চোখের সামনে নাড়ছেন—যাতে মা নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে না পারে।

মা যেন আত্মসমাহিত হয়ে ছিল। অন্য জগতে বিচরণ করছিল। চোখের সামনে চিঠির আন্দোলন দেখে সেই জগৎ থেকে ফিরে এল। চিঠির দিকে চেয়ে রইল। বাবা এবার চিঠিখানা মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—"পড়ো।"

মা পড়ল। আমার দিকে চোখ তুলল। বলল—"নীতিশ কে?"

আমি চোখ নামিয়ে ফেললাম। কারণ, মায়ের শান্ত চোখ কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছিল। চাপা আগুন বললে ভুল বলা হবে। যেন দ্যুতি ঠিকরে বেরচ্ছিল। প্রদীপের দ্যুতি। ওই ছবির মতন। মা যেন অনেকগুলো বছর নিমেষে পেরিয়ে গিয়ে যৌবনে ফিরে গেছে। চোখের মধ্যে যৌবনের কিরণ দেখতে পাচ্ছি।

বললাম একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে—"একটা পেটি ক্লার্ক।"

মা সেইরকম যৌবন-প্রদীপ্ত চোখে আমার চোখের ভেতর দিয়ে মনের মধ্যে পেরিস্কোপ চাহনি মেলে ধরে আস্তে বললে—"এতই ভালবাস যে বাবা আর মাকে না জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছ?"

একটু একটু করে সাহস ফিরে এল মনের মধ্যে—"জানিয়ে তো লাভ হয়নি।"

বাবার দিকে চোখ ফেরাল মা—"তোমাকে বলেছিল?"

মায়ের চোখের দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে গনগনে চোখে তাকিয়ে বাবা বললেন—"না। তোমার মেয়ে বলেনি। ওই ছোঁড়াটা এসেছিল। একটা ভিখিরি—"

"থামো।"

বাবা থেমে গেলেন।

মা বলল—"ফুল্লরা, আমার পাশে বসো।"

ছুটে এসে বসে পড়লাম মায়ের পাশে। যেন বাঁচলাম। মায়ের গা থেকে যেন অভয়-রশ্মি বেরচ্ছিল। গায়ে গা লাগিয়ে তা টের পেলাম।

মা আমার হাতে হাত রেখে শুধু বলল—"বোকা মেয়ে! যাও, ঘরে যাও।"

আমি দৌড়ে চলে গেলাম তিনতলায় আমার একটেরে ঘরে। যে-ঘরে আমার মা ছাড়া কেউ ঢোকে না। ঢোকবার হুকুম নেই। বাবার অত সময় নেই মেয়েকে দেখবার। ছাদে হাওয়া খেতে উঠলে তো মেয়ের ঘরে আসবেন।

নীতিশ, ঠিক এই সময়ে তোমার গলা শুনলাম।

কী ভীষণ যে চমকে উঠেছিলাম, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। তোমার পেটে পেটে যে এত বুদ্ধি, তাও জানা ছিল না। তুমি যে দাবার চালের আড়াই প্যাঁচে চলছ, তা কল্পনাও করতে পারিনি।

আচমকা পিঁ-পিঁ আওয়াজটা ব্লাউজের ভেতর থেকে ঠিকরে আসতেই চমকে উঠেছিলাম।

তারপরেই মনে পড়ল, মল্লিকা কালো রঙের একটা জিনিস ব্লাউজের ভেতরে গুঁজে দিয়ে শাড়ি টেনে চাপা দিয়েছিল।

পিঁ-পিঁ আওয়াজ আসছে সেই জিনিসটার ভেতর থেকে।

বের করলাম তৎক্ষণাৎ। তখন উত্তেজনার মাথায় খেয়াল করিনি। এখন দেখেই চিনলাম। আর ওই আওয়াজ তো ভোলবার নয়। বাবার পকেটেও এই জিনিস থাকে। যখন-তখন বাজে।

সেলুলার ফোন।

এ ফোনের ব্যবহার আমি জানি। তাই বাটন টিপে কানে লাগাতেই ভেসে এল তোমার গলা—"ফুল্লরা! ফুল্লরা!"

"নীতিশ!"

"কি চমৎকার প্ল্যানটা করেছিলাম—গেল কেঁচে তোমার জন্যে।"

"চিঠিটা—"

"আরও যত্ন করে রাখা উচিত ছিল। তুমি না—"

"তোমার সাহস তো কম নয়!"

"কেন সুন্দরী?"

"এখনও প্রেম?"

"নিকষিত হেম। যাবার নয়।"

"মল্লিকাকে দিয়ে সেলুলার পাঠালে কেন? আমি তো যাচ্ছিলাম।"

"বোকা মেয়ে। সব দিক ভাবতে হয়। তোমার ওই গণ্ডার বাবা, সরি ফর দ্য ল্যাংগুয়েজ—যদি আটকে দেন, সেই ভেবেই নেক্সট স্টেপ ভাবতে হয়েছে।"

"নেক্সট স্টেপ! সেটা কী?"

"ডার্লিং, তোমাকে তো টেলিফোন ধরতে দেওয়া হয় না।"

"বাবার ঘরে থাকে যে—আমাকে দোতলায় পড়বার ঘরে আটকে রেখেছেন—রাত্রে শুধু উঠি তিনতলায়—আমার ঘরে।"

"ফুলপ্রুফ প্ল্যান করেছিলাম, ফুল্লরা। প্রথম স্টেপ যদি কেঁচে যায়—টেলিফোনে কনট্যাক্ট রাখব তোমার সঙ্গে। সেলুলার যোগাড় করেছি সেই জন্যেই—মল্লিকাকে বলাই ছিল—যদি তোমাকে বের করতে না পারে—সেলুলার যেন গছিয়ে দেয়।"

"বুদ্ধির বেস্পতি! বাবা-মায়ের সামনে যদি সেলুলার বেজে উঠত—"

"অত বোকা আমি নই, ফুল্লরা। তুমি যে এখন ছাদের ঘরে—একা—সে খবর এসে গেছে আমার কাছে। তাই এই ফোন।"

"নীতিশ! কেউ আমাকে দেখছে?"

"তুমি তো আর আকাশে থাকো না—মর্ত্যের মানুষ। এই মর্ত্যেরই একটা বাড়ির ঘর থেকে নজর রাখা হয়েছে তোমার ঘরে।"

"আশপাশে তো অনেক উঁচু উঁচু বাড়ি—"

"সুতরাং গবেষণা থামাও। আমাকে পৃথ্বীরাজ বলে খেপিয়েছিলে মনে আছে?"

"আমি তোমার এ জন্মের সংযোগিতা—"

"শুধু ঘোড়ার বদলে মারুতি—এইটাই মর্ডান পৃথ্বীরাজ করতে চলেছিল। করবেও।"

"মারুতি! ভাড়া করেছ?"

"আরে না। কিনেছি।"

"তুমি মারুতি কিনেছো?"

"হ্যাঁগো।"

কি বড় চাঁদ দেখা যাচ্ছে জানলা দিয়ে।

"টাকা কে দিল?"

"কলকাতা এক আজব শহর। এখানে টাকা খুঁজলে টাকা পাওয়া যায়। এতদিন খুঁজিনি—পাইনি। অল্পেই সন্তুষ্ট ছিলাম। এখন খুঁজেছি—পেয়েছি। সংযুক্তা হরণ আমি করবই। রবীন চৌধুরীর দৌড় দেখব।"

"কতয় কিনলে?"

"মারুতি? এক লাখ সত্তর।"

"এত টাকা—"

"আরও চাই, আরও হবে। তবেই তো রবীন চৌধুরীর চোখ খুলবে। ফুল্লরা, দুনিয়াটা কার বশ?"

"টাকার বশ। কিন্তু তুমি কি করছ বুঝতে পারছি না।"

"মেয়েদের পেটে কথা থাকে না, সুতরাং এখন কিচ্ছু বলব না। আগে দোঁহে মিলি, অজানার উজানে পাড়ি দিই—তারপর..."

"অজানার উজানে!"

"ইয়েস মাই সুইটি! চাকরি আর করব না।"

"আমাকে খাওয়াবে কী?"

"হাওয়া।"

"ইয়ার্কি মেরো না। কথা বলছ কোত্থেকে?"

"মারুতির পেটে বসে।"

"বাড়ি যাবে না?"

"তোমার বাবা চলেন পাতায় পাতায়, আমি চলি শিরায় শিরায়। বাড়িতে উনি লোক পাঠাবেনই—আজ না হয় কাল। তাই আজই আমি কেটে পড়ছি।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"খুবই সিক্রেট ঠিকানা।"

"সিক্রেসির কাঁথায় আগুন। কোথায় যাচ্ছ না বললে আমিও যাব না তোমার কাছে।"

"তাই কি হয়, সখি! একই ভেলায় ভাসব দুজনে—অজানার উজানে।"

"ঠিকানাটা বলো।"

"দুর্গাপুরে।"

"দুর্গাপুর একটা বিরাট জায়গা।"

"কিন্তু এককালে ছিল জঙ্গল।"

"শুনেছি।"

"আজও সেই জঙ্গল আছে—টাউন দুর্গাপুরের দূরে দূরে।"

"সে তো থাকবেই।"

"জিটি রোড থেকে নেমে যেতে হয় এমনি একটা জায়গায়।"

"জঙ্গলে? শেষকালে জংলি হয়ে যাবে বাবার ভয়ে?"

"মন্দ কী? তুমি হবে আদিবাসী রমণী, গাঁথবে খোঁপায় ফুল—আমি হবো কৌপিনধারী মদ্দা মানুষ—টানবো ধনুর্গুণ।"

"ইচ্ছা করে...ইচ্ছা করে..."

"গামছা দিয়া পরাণডারে বান্ধি।"

"না, না, ইচ্ছা করে, সারা জীবন তোমার কথা শুনে যাই।"

"ও সব প্লেটোনিক লাভের যুগ এটা নয়, ফুল্লরা। এখন ঘর বাঁধবার সময়। ভয় নেই, সে ঘর গাছের তলায় হবে না। তবে আপাতত আমি যাব গাছের আড়ালে—থাকব গাছের ছায়ায়—তোমার পথ চেয়ে।"

"জায়গাটা কোথায়, এখনও কিন্তু বলোনি।"

"সে এক ভারি সুন্দর জায়গা, ফুল্লরা। দুর্গাপুর অত কাছে, অথচ দুর্গাপুরের হট্টগোল সেখানে নেই। সেখানে গাছপালার আড়ালে আছে একটা মোটেল।"

"মোটেল!"

"মোটর গাড়ির হোটেল তো—তাই মোটেল। জিটি রোডে গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত পথিক রাত কাটিয়ে যায় গাড়ি নিয়ে। আমাকে তো কোম্পানির গাড়ি নিয়ে প্রায় বেরতে হয়—জায়গাটার ঠিকানা তাই আমি জানি। অনেকেই জানে না।"

"নাম কি মোটেলের?"

"মুনলাইট।"

"বাব্বা! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন মনে হচ্ছে?"

"আরে না! ব্রিলিয়ান্ট পরিবেশ। মোটেলের পেছনে একটা মস্ত পুকুর—ছোটখাট দীঘি বলা যায়। গাছপালা দিয়ে ঘেরা। পূর্ণিমায় অপরূপ—অমাবস্যায় ভয়ঙ্কর।"

"আজ কিন্তু অমাবস্যা।"

"তাই তো আজকেই পৌঁছোবো সেখানে—আজ রাতেই। মুনলাইটের মুনমুনকে ফোনে জানিয়ে দিলাম।"

"মুনমুন! তিনি কিনি?"

"জেলাসি এসে গেল নাকি?"

"বলো না! মুনমুন কে?"

"একটি মেয়ে।"

"ধেৎ। সে কে?"

"মুনলাইট মোটেলের মালিক...আই মীন...মালকিন।"

"স্বামীটা ভেড়া মনে হচ্ছে?"

"ভেড়া হতে যাবে কেন? মানুষ-মেয়ে অবশ্য মানুষ-ভেড়া বিয়ে করতে চায় না। মুনমুনও চায়নি।"

"আই সী...আই সী...!"

"কি 'সী' করলে প্রাণেশ্বরী?"

"মুনমুন আইবুড়ি।"

"কারেক্ট।"

"মুনমুন একা মোটেল চালায়।"

"এগজ্যাক্টলি।"

"বনেবাদাড়ে থাকতে ভালবাসে?"

"বাপের স্বভাব পেয়েছে।"

"বাপ কোথায়?"

"স্বর্গে। মায়ের কাছে।"

"ভীষণ ডেয়ারিং, ভীষণ ডাকসাইটে মনে হচ্ছে?"

"নিখাদ সত্য। মুনমুনের লাইফ বড় স্ট্রেঞ্জ। শুনলে তোমার গায়ে কাঁটা দেবে।"

"বলো না।"

"বলা শুরু করলে আমার আর দুর্গাপুর যাওয়া হবে না। তুমি চলে এস ঝটপট। পেট্রল পাম্পে জিজ্ঞেস করলেই পথ বাৎলে দেবে। কবে আসবে?"

"খাঁচা থেকে বেরব কি করে ভেবে পাচ্ছি না।"

"ভাবো, ভাবো, সখি—যদ্দিন না আসছ, আমি থাকব মুনমুনের ছত্রছায়ায়।"

"তাহলে তাড়াতাড়িই যাব। একটা কথা মনে রেখ।"

"কি কথা?"

"মেয়েদের অধরে অমৃত, কিন্তু অন্তরে বিষ থাকে।"

"তোমার আছে নাকি?"

"মুনমুনের আছে মনে হচ্ছে। সাধু সাবধান।"

"টেলিফোন রাখলাম।"

নীতিশ, তোমার অমৃত-বচন শোনবার পর থেকেই আমার ভয়-ভয় ভাবটা একেবারেই কেটে গেছিল। এখন তো একেবারেই নেই। দুনিয়ার আর কাউকে আমি ডরাই না। বাড়ি থেকে বিনা প্রস্তুতিতে একবস্ত্রে চিরকালের মতন চলে যাচ্ছিলাম শ্যামের ডাক শুনে—ধরা পড়ে গিয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। মায়ের পাশে বসে একটু ভয় কেটেছিল। তারপর সেলুলারে শ্যামের বাঁশি বেজে ওঠার পর থেকেই তোমার রাধা বেপরোয়া হয়ে গেছিল। তুমি যে অন্য বাড়ি থেকে তিনতলার ঘরে আমার ওপর নজর রেখেছ এবং রাখবে—এইটা জানবার পর বেড়ে গেছিল আমার মনোবল।

মুনমুনের ব্যাপারটা আমার অবশ্য ভালো লাগেনি। তুমি বড় ভাল ছেলে। খারাপ মেয়েদের সঙ্গে মেশনি বলেই জানো না খারাপ মেয়েরা বাইরে ম্যাগনেটিক চার্ম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়—তারা শুধু চাহনি দিয়ে আর কথার বাঁধুনি দিয়ে যাকে খুশি তাকে হিপনোটাইজ করতে পারে, চরমতম খারাপ কাজ করেও বাইরে ধোয়া তুলসীপাতার মতন চেহারা নিয়ে থাকে—চলনে-বলনে তারা নিষ্পাপ—যেন সাক্ষাৎ দেবকন্যা। আসলে এক-একটি প্রচণ্ড সেক্স-ম্যানিয়াক। নীতিশ, মুনমুন সম্বন্ধে তোমার গদগদ প্রশংসা শুনে আমার নারীসত্তা কিন্তু এই সব কথাই আঁচ করেছিল। ভুলে যেও না, মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ছেলেদের চেয়ে প্রখর। মেয়েদের পেছন থেকে কেউ প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে থাকলে মেয়েরা পেছন না ফিরেই তা বুঝতে পারে। আমিও মুনমুনকে না দেখেই তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যেন দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছিলাম। তুমি তো জানো, এই ক্ষমতাটা আমার মধ্যে প্রবল মাত্রায় আছে। আমি মানুষ চিনতে পারি। যেমন, তোমাকে চিনেছি। মুনমুন আমাকে অকারণে ভাবিয়ে তোলেনি। নিজের জীবন দিয়ে তা বুঝতে পারছ।

তুমি সেলুলার ফোন কেটে দিয়ে যখন দুর্গাপুরের দিকে রওনা হলে—আমাকে না নিয়েই—কোন এক মুনমুনের ডেরায় অমাবস্যার রাত কাটাবে বলে, তখন আমার মনটা বেশ মুষড়ে পড়েছিল। নীতিশ, তুমি শুধু আমার, শুধু আমার, শুধু আমার—তোমার আর আমার মধ্যে অন্য কোনও কন্যা এসে যাক—এটা আমি চাই না। বলতে পার, এটা আমার জেলাসি। সব পুরুষকেই সব মেয়ে এইভাবে আঁকড়ে থাকতে চায়—যাদের তারা ভালবাসে। আমিও তাই চেয়েছিলাম। অন্যায় নিশ্চয় করিনি।

ফোনের কথাবার্তার পর একটু ঝিমিয়ে থাকার পরেই মাথাটা খেলা শুরু করে দিল। জানতে ইচ্ছে হলো, আমাকে আমার ঘরে মা পাঠিয়ে দেওয়ার পর মায়ের সঙ্গে বাবার

কথা হলো কি ধরনের? মায়ের হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, আমার এই বাড়ি ছেড়ে পালানোর ব্যাপারটায় মা খুব একটা রেগে যায়নি। বরং, বাবাই যেন ঘাবড়ে গেছিলেন। ব্যাপারটা কি জানা দরকার।

আমাকে যে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, খিদে পেলে খাইয়ে দিয়েছে, তার নামটাও তার কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তার বাবা-মা দিয়ে ফেলেছিলেন। সেবাদাসী। আমি শুধু সেবামাসি বলে ডাকতাম। দুটো অপোগণ্ড ছেলের বিয়ে দেওয়ার পর দুই বউয়ের লাথিঝাঁটা খেয়ে নিজের বাড়িতে আর থাকতে পারেনি। আমাদের বাড়িতেই থাকে। একতলায়—কোণের ঘরে। প্ল্যান করলাম, রাত্তির হোক, সেবামাসি যখন একা-একা শুতে যাবে—আমি গিয়ে ঢুকব ঘরে। বাড়ির বাইরে তো আজ বেরচ্ছি না। উঠোন আর বাগানের ডোবারম্যান আর অ্যালসেসিয়ানরা হাঁকডাক করবে না—নাইট গার্ডও মাথা ঘামাবে না।

এই সেবাদাসীই একটু পরে আমার খাবার নিয়ে এল তিনতলার ঘরে। মুখটা থমথমে।

সেবামাসির বয়স তিরিশের এদিকে অথবা ওদিকে। কিন্তু বেশ টানটান চেহারা। একটু খারাপভাবেই লিখি, ফাটাফাটি ফিগার বলতে যা বোঝায় —সেবামাসির তা আছে। গায়ের রঙও ফর্সা। বড়লোকদের বাড়ির কাজের লোকদের একটু সেজেগুজেই থাকতে হয়—সেবামাসীও সেইভাবেই থাকে —বরং একটু বেশিভাবেই থাকে। মাথায় সিঁদুর-টিঁদুরের বালাই ঘুচেছে অনেক আগেই—পাগলা বর মদ খেয়ে খেয়েই পটকেছে ছেলেদুটোর জন্ম দিয়েই। তেরোয় বিয়ে, ষোলয় বিধবা—তারপর থেকেই ধাই-মা হিসেবে মানুষ করে গেছে আমাকে।

সেবামাসির প্রসঙ্গটা যখন এসেই গেল, তখন আর একটু গুছিয়ে লিখে নিই সর্বসাধারণের অবগতির জন্যে। এ লেখা তো জানাজানি হবে আমার পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার পর। তাহলে আর লুকোছাপা কিসের?

নীতিশ, তুমি লক্ষ্য করছ নিশ্চয়, মা-কে আমি তুমি বলে ডাকি, বাবা-কে বলি আপনি। কেন বলো তো?

শিখিয়ে দিয়েছিল আমার মা। বাবা-কে বলতে হয় আপনি, মা-কে বলতে হয় তুমি। অনেক বাড়িতে রেওয়াজ দেখেছি, বাবা আর মা দুজনকেই আপনি বলে। যে বাড়ির যে রকম ঘরানা। আমার এক মুসলিম বান্ধবীও তার বাবা আর মা-কে আপনি বলে সম্বোধন করে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে অন্য সহবৎ বরাদ্দ করে দিয়েছিল আমার মা। মা যেন আমার কাছের লোক—বাবা অনেক দূরের।

ছেলেবেলায় অতশত বুঝিনি। যা শেখাবে মা, তাই তো শিখতে হবে। তবে হ্যাঁ, মা আমাকে খারাপ কিছু শেখায়নি। আজকের এই যে আমি-কে তুমি পরলোক থেকে ঠায় দেখে যাচ্ছ—এই আমি আমার মায়ের ছাঁচে গড়া। একটা ব্যাপার ছাড়া। সেটাও বলব যথাসময়। সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। সুতরাং লাজলজ্জা ভয় অপমান কিছুরই আর বালাই রাখি না আমি। এসেছি যখন দাগ রেখে যাব—সেই দাগ থাকুক আমার এই লেখার মধ্যে।

ব্যাপারটা কি হয়েছে শোনো, এসব কথা বলতেও লজ্জা হয়। মাথা কাটা যায়। সব বড় বাড়িতেই এই ধরনের ব্যাপার কিছু না কিছু থাকে—সবই গোপনে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কিছুই গোপনে থাকে না। আড়ালে-আবডালে তাই নিয়ে কানাকানি হয়। গুজবের কেন্দ্রবিন্দু যারা, তারা থাকে নির্বিকার।

যেমন আমার ধাই-মা এই সেবামাসি আর সো-কল্‌ড্ পিতৃদেব রবীন চৌধুরী—যিনি তোমার শুধু ঘাড় ধরতে বাকি রেখেছিলেন। আমার তো মনে হয়, বেশির ভাগ ধাই-মাদের হাল শেষ পর্যন্ত এই রকমই দাঁড়ায়—পিতৃদেবদের খপ্পরে যেতে হয়।

তা, আমার এই সেবামাসি শুধু গতর দিয়েই এ বাড়ির অন্যতম নায়িকা হয়ে উঠেছিল। এই কেচ্ছা কোনোদিনই তোমাকে বলতাম না—এখন বলছি শেষের ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছি বলে। জানলে তো বয়ে গেল—তুমি তো বেঁচে নেই। মরে গিয়ে বরং আরও বেশি করে দেখছ সেবামাসি আর পিতৃদেবের প্রতি রজনীর ব্যভিচার-দৃশ্য। কোণের ওই ঘরে রাত হলেই শুরু হয় মধুযামিনী যাপন। বাবার রুচির বলিহারি যাই। এমন মা-কে ছেড়ে...

আশ্চর্য মহিলা বটে আমার এই মা! এত জেনেও নির্বিকার। নীতিশ, আজ তুমি যদি বেঁচে থাকতে আর এই পথের পথিক হতে (আমার বর হয়ে), তাহলে তোমাকে নিংড়ে পরিষ্কার করে দিতাম।

আমার মা কিন্তু সে সবের ধার দিয়েও যায়নি। তবে বাবার সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়ার সম্পর্কটাও আর রাখেনি। যখন ছোট ছিলাম, তখন বুঝতাম না। বাবার শোবার ঘর দোতলার উত্তর দিকে—বারান্দার একপ্রান্তে; মায়ের শোবার ঘর দোতলার দক্ষিণ দিকে—বারান্দার আর এক প্রান্তে। দু'দিক থেকে দুটো সিঁড়ি নেমে গেছে একতলার টানা লম্বা বিশাল উঠোনে। বাবার একটা গাড়ি, মায়ের একটা গাড়ি। বাবার গাড়ির ড্রাইভার আছে—মায়ের গাড়ি মা নিজেই চালায়। বাবা সারাদিন অফিসে কাটিয়ে রাত বারোটার আগে কোনওদিন ফিরত না—মা বেরিয়ে যেত সন্ধ্যে নাগাদ—বাড়ি ফিরত দশটার মধ্যেই। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে, আমার খাওয়া-দাওয়া পড়াশুনো হয়েছে কিনা খোঁজখবর নিয়ে চলে যেত নিজের শোবার ঘরে।

বাবা আর মায়ের একসঙ্গে বসে খাওয়া আমি কোনওদিন দেখিনি—কোনওদিন নয়। বাবা বাড়ি ফিরতেন মদে চুর হয়ে। কোনওদিন খেতেন—কোনওদিন খেতেন না। জামাকাপড় পাল্টে নিয়ে চলে যেতেন একতলার কোণের ঘরে—যেখানে বাবার প্রতীক্ষায় দরজা ভেজিয়ে বসে থাকত সেবামাসি।

পরে যখন ব্যাপারটা বুঝলাম, আশ্চর্য হয়েছি শুধু মায়ের নির্বিকার ভাব দেখে। কুৎসিত এই ব্যাপার নিয়ে বাবার সঙ্গে কোনওদিন কথা কাটাকাটিও করেনি। অথচ পাথরপ্রতিমা হয়েও থাকেনি। পুজোআর্চা থেকে শুরু করে সংসারের সব কিছু নখদর্পণে রেখেছে। এমন কি বিষয়-আশয়, ব্যবসা আর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নিয়ে বাবার সঙ্গে বাবারই অফিস ঘরে বসে কথাবার্তাও বলেছে। কক্ষণো বাবার শোবার ঘরে ঢোকেনি—বাবাও মায়ের শোবার ঘরে ঢোকেনি।

এ এক বিচিত্র সহাবস্থান। একটা দিনের জন্যেও বাড়িতে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটেনি—অথচ সব চলছে ছন্দ মিলিয়ে—তাল কাটেনি কোত্থাও।

প্রথম কাটতে গেলাম আমি। আর সেইদিনই প্রথম দেখলাম বাবার দিকে মায়ের ঠাণ্ডা চোখের চাহনি। তার আগে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি নিজের বিশাল অয়েল পেন্টিং-এর দিকে। নিজের ফেলে

আসা যৌবনের দিকে—যেন ভোরের ফুল শিশিরে নিজেকে স্নান করিয়ে নিয়ে পুজো নিবেদন করতে ঢুকেছে ঠাকুরঘরে—যে ঘরে রয়েছে আঁধার—জ্বলছে একটা প্রদীপ—মায়ের মুখের একদিকে নরম আলোর পবিত্রতা—আর একদিকে অস্পষ্ট আঁধারের রহস্যময়তা—অনির্বাণ শুধু ওই দুটো চোখ।

তোমার চিঠি যখন মায়ের চোখের সামনে নাড়ছিলেন বাবা, তখন ছবির ওই চাহনি ফিরে আসতে দেখেছিলাম মায়ের দুই চোখে।

তারপর কি হলো জানবার জন্যে কৌতূহলে ফেটে পড়েছিলাম।

অনেক ভেবে যখন ঠিক করলাম, সেবামাসির পেট থেকেই কথা বের করতে হবে, ঠিক তখন সেবামাসি নিজেই আমার খাবার নিয়ে এল তিনতলার ঘরে।

তুমিই বলো, তখন খাওয়া যায়?

আমি বলেছিলাম—"খাব না।"

সেবামাসি বললে—"আমাদের মায়া কাটাতে মন কাঁদল না?"

ব্যস, বোঝা হয়ে গেল সেবামাসি সব শুনেছে। আরও নিশ্চয় শুনবে একটু পরে—বাবা যখন ঢুকবে তার ঘরে।

আমি বললাম—"আগে বলো, বাবার সঙ্গে মায়ের কি কথা হলো।"

সেবামাসি অন্যদিকে চেয়ে বললে—"আমি কি তা শুনেছি?"

"না শুনলে কি করে জানলে, আমি মায়া কাটাতে যাচ্ছিলাম!"

"বাড়ির কুকুরগুলো পর্যন্ত জেনে গেছে।"

"তুমি নিশ্চয় একটু বেশি জেনেছ।"

সেবামাসি একটু চুপ করে থেকে বললে—"ছাদ থেকে তোমার নামা বারণ। ছাদের দরজায় তালা পড়বে আজ থেকে—চাবি থাকবে তোমার মায়ের কাছে।"

"মা! মা আমাকে আটকে রেখে দেবে?"

"যা শুনেছি, তাই বলেছি। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। তোমার মা তোমার বাবার দশ কথার উত্তর এককথায় দিচ্ছিল—খুব আস্তে।"

"কি বলছিলেন বাবা?"

"তোমাকে কুলটা বলেছেন। বংশের নাম ডোবাবে তুমি।"

শক্ত হয়ে গেলাম—"আমি কুলটা!"

"তোমার বাবার কথায়। রাস্তার কলগার্ল হয়ে যাবে এখন থেকে ওঁরা শক্ত না হলে।"

শুনে নিশ্চয় মুখ লাল হয়ে গেছিল আমার। এমনিতেই আমি ফর্সা। একটুতেই মুখ হয় কালো, না হয় লাল হয়ে যায়—সে তুমি জানো, নীতিশ। ঢং জিনিসটা আমার চরিত্রে নেই। ছেনালিপনা আমাব ধাতে নেই। তাই বাবা আমাকে কুলটা আর কলগার্ল বলায় মুখের অবস্থা নিশ্চয় ভাল হয়ে ওঠেনি।

সেবামাসি তা লক্ষ্য করেছিল। মুখখানা কিন্তু গম্ভীর করেই রাখল। হাজার হোক, আমাকে মানুষ করেছে। তাকে পর্যন্ত না জানিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলাম—কষ্ট তো পাবেই।

আমি বললাম—"আর কি-কি বললেন, বাবা?"

"সে শুনে তোমার কাজ নেই।"

"মা কি বলল জানতে পারি?"

"দশ কথার একটা উত্তরই দিল।"

"কি উত্তর?"

"শুধু বলল—বংশ।"

"বংশ?"

"হ্যাঁ। খুব আস্তে বলল। তাতেই যেন নিভে গেলেন তোমার বাবা।"

"তারপর?"

"মা বললেন, ফুল্লরাকে আমি দেখছি। ছাদের ঘরে তালাচাবি দেওয়া থাকবে। সেবা চাবি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে—আমাকে দিয়ে যাবে।"

"বাবা? কিছু বললেন?"

"তোমার মায়ের ওপর কোনও কথা বাবা বলেছেন?—আমি আর দাঁড়াইনি। জানি তো ডাক পড়বে। যদি কিছু বলেও থাকেন, আমি শুনিনি।"

সেবামাসির মুখ দেখে মনে হলো, আরও কিছু শুনেছে সে। বলতে চাইল না।

চেপে ধরলাম। গোঁ ধরলাম। বাবা শেষকালে কি বলেছেন, না বললে খাব না...কিছুতেই খাব না...

ব্যস্ত হয় সেবামাসি—"কী জ্বালা! এখুনি তোমার মা ডাকবেন।"

"ডাকুক। আগে বলো, শেষকালে কী বলেছেন বাবা।"

"খুন করিয়ে দেবেন।"

"কাকে?"

"যার সঙ্গে তুমি পালাচ্ছিলে।"

থ হয়ে গেলাম আমি। সেবামাসি বললে—"এইজন্যেই বলতে চাইছিলাম না। অত সোজা? খুন করাবো বললেই করানো যায়?"

"যায়," বলেছিলাম আমি—"কারখানায় অনেক ঘাড়বেঁকাকে বাবা খুন করিয়েছেন। বাবা সব পারেন।—মা কি বলল?"

"বললেন, তারপর তোমার পছন্দসই ওই পায়ের জুতোটার সঙ্গে বিয়ে দেবে?"

এবার আমি অবাক হলাম—"পায়ের জুতো! বাবা পছন্দ করে রেখেছেন?"

"তুমি জানো না?" সেবামাসি তো অবাক।

"না!"

"সত্যি জানো না?"

"বলছি তো, না।"

"তোমাকে নিশ্চয় একা লন্ডন পাঠানো হচ্ছে না?"

"সঙ্গে কে যাচ্ছে?"

"পায়ের জুতো।"

"সে কে?"

"কারখানার একটা ছেলে। তোমার বাবার রাইটহ্যান্ড। উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। পয়লা নম্বর মস্তান। দরকার হলে তোমার মুখ অ্যাসিডে পুড়িয়ে দিয়ে তোমাকে বাগে রাখবে।"

"মা জানে?"

"জানতেন না। আজ প্রথম শুনলেন।"

"কি বললে?"

"বললেন, টাকাওলা পায়ের জুতো নাকি?"

"বাবার জবাব?"

"শুনলে অবাক হবে।"

"বলো না।"

"সে-ও একটা ভিখিরি।"

মুখ লাল হয়ে গেল। শিবের অপমান কি সতী সইতে পারে?

সেবামাসি তা বুঝল। বলল—"ভিখিরি হলেও সে তো পায়ের জুতো হয়ে থাকবে। তুমি যার সঙ্গে পালাচ্ছিলে—সে হতো না। তোমার বাবা দেখেই বুঝেছিলেন।"

আমি জবাব দিতে পারলাম না। গর্ব হচ্ছিল তোমার জন্যে, নীতিশ, কষ্ট হচ্ছিল তোমার জন্যে।

সেবামাসি বলে গেল—"তোমার মা যা বললেন, তার মানে বুঝলাম না। কিন্তু কথাটা মনে আছে। বোধহয়, সংস্কৃত।"

"কি কথা?"

"আত্মবৎ জগৎ।"

"ব্যস, আর কিছু না?"

"বললাম তো, দশ কথার উত্তর এক কথায় দিয়ে যাচ্ছিলেন তোমার মা।"

আমি ভাবতে লাগলাম, কি বলতে চেয়েছে মা। সেই ফাঁকে আমার মুখে গরাস তুলে খাইয়ে দিল সেবামাসি।

সেবামাসি ছাদের দরজায় তালাচাবি দিয়ে নেমে যেতেই আমি সেলুলারে ফোন করেছিলাম তোমাকে। তুমি তখন মারুতি হাঁকিয়ে উড়ে যাচ্ছিলে জিটি রোডের ওপর দিয়ে। তোমার বুকপকেটের সেলুলার পিঁ-পিঁ করে উঠতেই গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলে রাস্তার পাশে। জিজ্ঞেস করেছিলে—"কী সংবাদ?"

আমি তোমাকে লেটেস্ট সংবাদ দিয়েছিলাম। বাবার পৈশাচিক প্ল্যানের বৃত্তান্ত শুনিয়েছিলাম। পছন্দসই পায়ের জুতোটা যে নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল, তাতে সন্দেহ নেই। হাজার হাজার লোক কাজ করে যে কারখানায়, সে কারখানাকে কব্জায় রাখতে গেলে ক্রিমিন্যাল পুষতে হয়। লাশ ফেলতে হয়। সেকালের জমিদার আর একালের শিল্পপতির মধ্যে নেই কোনও ফারাক।

নীতিশ, তুমি শুনে যে অভয়-হাসি হেসেছিলে, তা আজও আমার কানে বাজছে। বলেছিলে—"ফুল্লরা, একটা কাজ করতে হবে।"

আমি বলেছিলাম—"কি কাজ?"

"ওই পায়ের জুতোটার নাম যোগাড় করতে হবে।"

"নাম জেনে তুমি কি করবে?"

"সেই প্ল্যানটা পরে ভাবব। যারা টাকা খেয়ে কাজ করে—তারা বেশি টাকা পেলে বেশি কাজ করে। কি বুঝলে?"

"বাবার পেছনে তাকে লাগাবে? খবরদার!"

"অত নীচ আমি নই, ফুল্লরা। আমি এমন প্ল্যান করব যাতে সে আর পিকচারে না থাকে—আমাদের জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়।"

"পারবে? পয়সাপিশাচ পায়ের জুতোদের এভাবে ঘোরানো যায়? বিশেষ করে যে আমাকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে?"

"ফুল্লরা, আইনে সব হয়। সবার ওপর আইন সত্য—তাহার উপর নাই।"

"তুমি কি বলছ বুঝতে পারছি না।"

"পায়ের জুতোকে নিয়ে মাথা খারাপ করো না—তুমি তার নাম যোগাড় করতে না পারলেও আমি যোগাড় করে নেব—সে চ্যানেল আমার আছে। তুমি শুধু চলে এস আমার কাছে—যত তাড়াতাড়ি পারো।"

এই বলে তুমি সেলুলার অফ করেছিলে। তারপরেই, ওই জিটি রোডে বসেই, তুমি সেলুলারে কনট্যাক্ট করেছিলে তোমার এক প্রাণের বন্ধুকে। তাঁর অনেক গল্প তুমি গঙ্গার পাড়ে বসে শুনিয়েছিলে। ল পাশ করবার পর তাঁকে একটা মিথ্যে ক্রাইম কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর আইনজ্ঞান আর মনোবল—এই দুটি জিনিসকে অস্ত্র করে ষড়যন্ত্রীদের ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। তারপর ক্রিমিন্যাল লইয়ার হয়ে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন হাইকোর্ট পাড়ায়। তাঁর জীবনের আদর্শই হচ্ছে—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন। আইনজীবীর জীবিকায় তিনি লড়ে গেছেন অন্যায়ের সঙ্গে, অব্যাহতি দিয়েছেন উৎপীড়িতকে—শুইয়ে দিয়েছেন অত্যাচারীকে। অথচ তাঁর পশার বেড়েই গেছে। মক্কেল ছুটে ছুটে এসেছে তাঁর কাছে। তিনি কাউকে ফেরাননি। পয়সাটা তাঁর দরকার বইকি—কিন্তু সেইটা তাঁর একমাত্র কাম্য নয়—আইনের অলিগলি দিয়ে যে সব দুর্বৃত্তরা সমাজ আর প্রশাসনকে অপশাসনের লাগাম পরিয়ে রাখছে—আইনের অলিগলি দিয়েই তাদের শক্তিহীন করে দেওয়াটাই তাঁর একমাত্র কামনা—একমাত্র ধর্ম।

নাম তাঁর শেখসাহেব। নীতিশ, তুমি সেলুলারে কনট্যাক্ট করেছিলে এই শেখসাহেবকে।

তিনি তখন বসেছিলেন তাঁর হাইকোর্ট পাড়ার চেম্বারে। অত রাতেও তিনি মক্কেলদের সারভিস দিয়ে যান—খিদে পেলে ওইখানে বসেই সামান্য খেয়ে নেন- মক্কেলদেরও না খাইয়ে ছাড়েন না। এক একজনের কেস এক একরকম। এক-এক অ্যাঙ্গল থেকে ভাবেন—রণনীতি স্থির করেন—কখনও বাঁধাধরা ছকে চলেন না। তোমার কেসটা শুনে উনি বলেছিলেন—"নীতিশ, তোমার ভাবী বউ এখন আন্ডার লক অ্যান্ড কী বাই হার ফাদার?"

"অ্যান্ড মাদার," বলেছিলে তুমি।

শেখসাহেব বলেছিলেন—"একসঙ্গে দুজনকে জড়াতে যেও না। তোমার কেসহিস্ট্রি শুনে মনে হচ্ছে, ফুল্লরার মা এখনও তোমার সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেননি—কিন্তু গ্রেট রবীন চৌধুরী করে ফেলেছেন। তোমাকে খতম করে দেওয়ার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করেছেন।"

তুমি বলেছিলে—"ও লোক সব পারে। আমি তো চুনোপুঁটি।"

শেখসাহেব তখন হো-হো করে হেসেছিলেন তাঁর এজলাস-কাঁপানো গলায়। বলেছিলেন—"নীতিশ, যার লাঠি তার মাটি। দেখা যাক, কার লাঠির জোর বেশি। তোমার, না আমার, না রবীন চৌধুরীর।"

"কি করতে চাও?"

"ট্রেড সিক্রেট—বলা যাবে না। তবে একটা জিনিস চাই—সেটা অবশ্য তোমার ট্রেড সিক্রেট—কিন্তু আমার জানা দরকার।"

"যথা?"

"ফুল্লরার সেলুলার ফোন নাম্বার।"

"ফোন করবে?"

"করব।"

"কি বলবে?"

"বলব না।"

"জ্বালালে! নাও—লিখে নাও।"

নাম্বারটা সাঁ-সাঁ করে লিখে নিয়েই শেখসাহেব বললেন—"বন্ধু নীতিশ, এবার একটা অপ্রিয় কথা বলব।"

"স্বচ্ছন্দে বলো।"

"একজন চোরের ব্রীফ শেখসাহেব নেয় না।"

"প্রেমে আর রণে কোনও অন্যায় নেই।"

"আমি কাব্য জানি না—কানুন জানি। শক্ত কেস নরম মাটিতে দাঁড় করানো যায় না।"

"কিন্তু আমি যে চুরি করে ফেলেছি।"

"ফেরৎ দিয়ে দাও।"

"অসম্ভব।"

"কোনটা অসম্ভব? টাকাটা হাতছাড়া করা, না, যেখানকার টাকা সেইখানে পৌঁছে দেওয়া?"

"দুটোই।"

"চার লাখ চুরি করে পরের মেয়েকে যে ফুসলে নিয়ে যেতে চায়—তার কেস নেওয়া যায় না।—নীতিশ, টেলিফোন রাখছি।"

"দাঁড়াও।"

"আমি বসে আছি, বসেই থাকব। শুধু

শক্ত হয়ে গেলাম—"আমি কুলটা!"

তোমার কেস—"

"শেখসাহেব মক্কেলকে রেসকিউ করে—মক্কেলের সুইসাইড চায় না। ঠিক বলেছি?"

"মনে হচ্ছে, তোমার অন্তর্দৃষ্টি জাগছে।"

"তোমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।"

"এসেছে।"

"তাই টাকা ফেরৎ দিতে বলছ—যদিও জানো, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।"

"না, সম্ভব নয়।"

"শেখসাহেব, আমার লেট হয়ে যাচ্ছে। কি করতে চাও, ঝটপট বলো।"

"যা বলব, তা করবে?"

"করব।"

"মুনলাইট মোটেলে পৌঁছবে আজ রাতে—কাল রোববারে গাড়ি বেচে দেবে।"

"বেচে দেবো!"

"দুর্গাপুরে পুরোনো গাড়ি কেনাবেচা হয় ভালো দরে। প্রচুর দালাল ঘুরছে। সেরকম গ্যারেজও আছে। এক লাখ সত্তরের গাড়ি এক লাখ সত্তরেই বেচবে—বেশি পেলেও নেবে না। ছিলে অনেস্ট, থাকবেও অনেস্ট। রাজী?"

নীতিশ, তুমি দ্বন্দ্বে পড়েছিলে। ভয়ানক দোটানা। ঝোঁকের মাথায় কুকর্ম করে ফেলেছো—আগে জানলে, আমিও তোমাকে তা করতে দিতাম না—তোমার প্রকৃত বন্ধু শেখসাহেবও করতে দিচ্ছেন না। অথচ, ওই চার লাখের ওপরেই তোমার ফিউচার অ্যাকশন প্ল্যান করেছিলে। শেখসাহেবের কনক্রিট, ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্ড বোল্ড অ্যাডভাইস তুমি রাখবে না, ফেলবে—ঠিক করে উঠতে পারছিলে না।

শেখসাহেব নিশ্চয় টেলিপ্যাথি জানেন। হাইকোর্টের চেম্বারে বসে অমাবস্যার রাতের দিকে চেয়ে, তোমার মনের লড়াইয়ের চেহারা দেখতে পেয়েছিলেন।

বলেছিলেন—"ঝড় উঠেছে?"

তুমি চমকে উঠেছিলে—"হ্যাঁ, ঝড় উঠেছে। কিন্তু দেখছ কি করে?"

"নীতিশ, আমি প্রাকৃতিক ঝড়ের কথা বলছি না। তবে প্রকৃতিও তোমার মতলব মঞ্জুর করছেন না। তাই ঝড় হয়ে ক্ষোভ জানাচ্ছেন। গাছপালা খুব দুলছে?"

"দুলছে।"

"বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে?"

"চমকাচ্ছে।"

"তোমার মনের ঝড়-বিদ্যুৎ তাহলে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি।"

"অ্যান্ড ইওর ডিসিশন?"

"অ্যাবাউট সেলিং দ্য মারুতি?"

"হোয়াট এল্‌স্‌?"

"এগ্রিড।"

"গুড। গুড। ভেরি গুড। দ্য সেম ওল্ড ডায়মন্ড নীতিশ—মাই গুড ফ্রেন্ড নীতিশ। নাউ আই উইল গিভ মাই লাইফ ফর ইউ।"

"রক্ষে করো, তোমার জীবন অনেক দামী।"

"আরে ব্রাদার, মানি ইজ লাইফ, লাইফ ইজ মানি। কিছু লোকের কাছে। আমি অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণর বাণীটাই ফলো করি।"

"টাকা মাটি—মাটি টাকা?"

"ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস।—এবার বলো, চার লাখ কোন ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার কথা ছিল?"

"স্টেট ব্যাঙ্কে।"

"কোন ব্রাঞ্চ?"

"গড়িয়াহাট।"

"পরশু সোমবার...সকাল ঠিক দশটায় ব্যাঙ্ক খুললেই চার লাখ ক্যাশ জমা পড়বে।"

"এত টাকা কোথায় পাবে? আজ শনিবার—কাল রোববার।"

"নিজের চরকায় তেল দাও। মানি ম্যাটারের বোঝ কী? কত লাখ দরকার ছিল তোমার? আমাকে বললেই তো পারতে?"

"তোমাকে...তোমাকে..."

"ননসেন্স...ইডিয়ট...ফুল! কত টাকার নোটে ক'খানা বান্ডিল দেওয়া হয়েছিল তোমাকে?"

"পাঁচশ টাকার নোটে আটখানা বান্ডিল।"

"মাত্র! পাঁচশ টাকার নোটের আটখানা বান্ডিল সোমবার জমা পড়বে। অ্যাকাউন্ট নাম্বার? কোম্পানির নাম?"

"লিখে নাও।"

"লিখে নিলাম। দোস্ত নীতিশ, এবার রওনা হও মুনলাইট মোটেলের দিকে। খবরদার! ওই জায়গা ছেড়ে নড়বে না।"

"ইয়ে..যদি রবীন চৌধুরী হায়ার্ড কীলার পাঠায়?"

"তোমার ঠিকানা জানলে তো পাঠাবে?"

"রবীন চৌধুরীকে চেনো না—"

"আরে রাখো।...প্রসিড...টুওয়ার্ডস মুনলাইট মোটেল...গুডনাইট।"

নীতিশ, তোমার সঙ্গে যখন তোমার প্রাণের বন্ধুর কথা চলছে, তখন মা এসেছিল আমার ঘরে। ছাদের দরজার তালাচাবি খোলার আওয়াজ শুনেই দৌড়ে গিয়ে উঁকি

মেরে দেখেছিলাম—মা নিজের হাতে তালা খুলছে।

দৌড়ে ফিরে এসেছিলাম ঘরে। আগে সেলুলারের ব্যাটারি অফ করেছিলাম। ঝাঁ করে লুকিয়ে ফেলেছিলাম। তোমাকে বিশ্বাস নেই। কখন প্রেম উথলে উঠবে—ফোন করে বসবে—পিঁপিঁ আওয়াজ শুনলেই তোমার সঙ্গে আমার শেষ যোগসূত্রটাও ছিন্ন হয়ে যাবে।

মা এল প্রায় পা টিপে টিপে—ছাদের দরজা এদিক থেকে বন্ধ না করেই।

ঘরে যখন ঢুকল, আমি তখন ভালো-মানুষের মতন মুখ করে খাটে বসে পা দোলাচ্ছি।

মা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল। সে চোখে রাগ নেই—শুধু কষ্ট আছে। দেখে, আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। পা দোলানি বন্ধ হয়ে গেল।

মা ঘরে এল। আমার চোখে চোখে চেয়ে বলে উঠল—"আগাথা ক্রিস্টির আত্মজীবনী তুই পড়েছিলি? ঢাউস ইংলিশ পেপার-ব্যাক?"

আমি বললাম—"তোমাকে তো সে গল্প শুনিয়েছি।"

"তোর মুখেই শুনেছি, আগাথা ক্রিস্টির মা সব টের পেতেন—তাঁর কাছে কিছু লুকোনো যেত না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—"

"আমার কাছে কি লুকোলি?"

ধরা পড়ে গিয়ে মুখ-টুখ লাল করে ফেললাম। কিন্তু পণ করলাম, সেলুলার দেখাব না—ওটা তোমার আর আমার মধ্যে খবর দেওয়া-নেওয়ার কবুতর হয়েই থাকুক। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক সিক্রেট ব্যাপার থাকে—বুদ্ধপূর্ণিমায় চাঁদকে সাক্ষী রেখে যখন আমাদের বিয়েই হয়ে গেছে—তখন থাকুক এই সিক্রেট—মাকেও বলা চলবে না।

মায়েরা কিন্তু অনেক বোঝে—আমিও মা হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম নীতিশ—সব গুবলেট হয়ে গেল—পরজন্মে মনের সুখে সাধ মিটিয়ে নেব'খন।

যা বলছিলাম, মা আমার দু'চোখের দিকে চেয়ে রইল—সন্ধানী চাহনি। তারপর বলল—"ঠোঁট যে শক্ত হয়ে গেল।"

আমি ঠোঁট টিপেই রইলাম। মা হাসল। অনেক দুঃখে, অনেক কষ্টে মায়েরা এমনি হাসি হাসে। অথচ, তোমাকে আগেই বলেছি, মায়ের নির্বিকার মুখ ছাড়া অন্য কোনোরকম মুখ কখনও দেখিনি। না রাগ, না বিদ্বেষ, না অভিমান, না কষ্ট। জীবন্ত পাথরপ্রতিমা।

সেই মা কষ্টের হাসি হাসল। আমার পাশে বসল। বলল—"এই খামটা নে।"

বলে, মোটা ব্রাউন পেপারের ছোট্ট একটা খাম আমার হাতে তুলে দিল। সাইজে দু'ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি। ওপরে ছাপা রয়েছে ইংরেজিতে Locker No. Code No. Key No.

তিনটে নম্বর হাতে লেখা রয়েছে তিনটে ছাপানো শব্দসমষ্টির পাশে।

বললাম—"এটা কী?"

মা বলল—"আগে লুকিয়ে রাখ।"

মায়ের সামনে ব্লাউজের ভেতরে ব্রায়ের মধ্যে গুঁজে রাখতে লজ্জা নেই। তাই করলাম।

মা বলল—"কোন ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চের লকার, তা খামের পেছনেই লেখা আছে। তোর মনে পড়ছে? একদিন তোকে নিয়ে গেছিলাম?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো অনেক বছর আগে। জয়েন্ট নামে কি সব যেন করলে, আমি সই করলাম।"

"তারপর থেকে আমি একা সই করে ওই লকার বহুবার খুলেছি, অনেক জিনিস রেখেছি। তুই-ও একা গিয়ে যেদিন খুশি খুলতে পারবি। একটা চাবি ব্যাঙ্কে আছে—আর একটা চাবি রইল তোর কাছে। বুঝলি?"

"না।"

"বোকা মেয়ে। এই যে চাবিকাঠি তোকে দিলাম—এটা টাকাপয়সা সোনাদানার নয়।"

"তবে?"

"অনেক বড় একটা রহস্য জানবার চাবিকাঠি।"

"রহস্য!"

"আর বেশি বলব না। কোড নাম্বারের জায়গায় কি লেখা দেখলি?"

"আমার নাম।"

"রহস্যটা তোকে নিয়েই।"

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম মায়ের মুখের দিকে। নীতিশ, তুমি আমার চোখ দেখে বলতে—ঠিক যেন মা দুর্গার চোখ। আমার মায়ের চোখ দেখলে বিশেষণ খুঁজে পেতে না। আমি আমার মায়ের চোখের সামান্যই পেয়েছি। সেই চোখের দিকে আমি যখন চেয়ে রইলাম, তখন আমি যেন কি রকম হয়ে গেলাম।

মায়ের চোখে জল দেখলাম। সেই প্রথম। ছলছল করছে দুটো চোখ। যেন দুটো পদ্মদীঘি।

নরম গলায় মা বললে—"তুই কক্ষণো খারাপ কাজ করিসনি—করতে পারবি না—তোর সেই সাহস নেই।"

আমি চুপ।

মা বলে গেল—"তুই বাড়ির ছাঁচে পড়িস না। তোর চলে যাওয়াই উচিত।"

মুখ দিয়ে কথাটা ফস্ করে বেরিয়ে গেল—"তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে?"

ভিজে চোখে আবার সেই কষ্টের হাসি হাসল মা—"হ্যাঁ, দেব।"

আমি কথা বলতে পারলাম না।

মা বলে গেল—"কিন্তু আমাকে বলে যেতে হবে, তাড়িয়ে দিলে তুই কোথায় গিয়ে উঠবি।"

এমনভাবে কথাটা বলল মা, যে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারলাম না। বলে ফেললাম—"দুর্গাপুরে। মুনলাইট মোটেলে।"

"সেখানে সে থাকবে?"

সে মানে নীতিশ। তোমার নামটা মুখে আনল না মা। নিঃশব্দ সম্মতি তাইতেই প্রকাশ পেল। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, Words unspoken, sometimes are more powerful than words spoken; না বলা কথার শক্তি কখনও-কখনও বলা কথার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি রাখে।

সেই রাতে মা তোমার নাম মুখে না এনে অনেক কথাই আমাকে জানিয়ে দিল—নিঃশব্দে।

এমনি আমার মা—দশ কথার উত্তরে একটা কথা বলবে—অথবা, বলবেই না। তাতেই কাজ হয় বেশি।

কিন্তু এটাও ঠিক সেই রাতে একসঙ্গে এত কথা মা আমার সঙ্গে বলেনি।

নীতিশ, মায়ের সঙ্গে সেই আমার শেষ কথা।

অন্তর্যামী মা। নিশ্চয় টের পেয়েছিল কি ঘটবে।

যা বলছিলাম, মা যখন খুব আস্তে জিজ্ঞেস করল আমার পদ্ম-পলাশ চোখে

(তোমার ভাষায়) চোখ রেখে, 'সেখানে সে থাকবে?' তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল এক অক্ষরের ছোট্ট জবাবটা—"হ্যাঁ।"

ঠিক এই সময়ে শুনলাম আওয়াজটা। ছাদের দরজার পাল্লা নড়ে উঠল।

ছিটকে গেল মা। পেছনে আমি। একটা পাল্লা ফাঁক হয়ে রয়েছে।

আমাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল মা। মুখ এখন থমথমে।

সেকেন্ড কয়েক মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে ভেবে নিল। তারপর চোখ তুলল আমার দিকে—"স্পাই লেগেছে পেছনে।"

আমার বুক দুড়দুড় করছিল।

আমার চোখ-মুখ দেখে মা তা টের পেল। বলল—"ড্রাইভিং ভুলে যাসনি তো?"

ঢোক গিলে বললাম—"সাঁতার আর ড্রাইভিং কেউ ভোলে না।"

"প্র্যাকটিস নেই। আমি প্র্যাকটিস করিয়ে দেব—দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত।"

"জিটি রোড ধরিয়ে দেবে?"

"হ্যাঁ।"

"কখন, মা?"

"কাল কাকভোরে—আজ রাতে ঝুঁকি নিসনি।"

"মা—"

"যাবার সময়ে ব্যাগে টাকা দিয়ে দেব।"

আমি মা-কে জড়িয়ে ধরলাম। বুকে মুখ লুকিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম। মা শুধু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে গেল।

মা চলে যেতেই ছাদের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ঘরে এসে বসলাম। নাইট ল্যাম্প জ্বালালাম। ঘরে আর কোনও আলো রাখলাম না।

সেলুলার অন করলাম। জানি তো তুমি ছটফট করছ।

কিন্তু সেলুলার নীরব। খুব রাগ হলো। নিশ্চয় মুনমুন মেয়েটার সঙ্গে গল্প করছ। পুরুষ জাতকে কখনও আলগা দিতে নেই।

আমার চোখেও ঘুম নেই। ছাদে দাঁড়িয়ে আছি। আকাশ মেঘলা। একে তো অমাবস্যার রাত। হাওয়ার জোর বেড়েছে। হয়তো কোথাও ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে—সেই ঝড়বৃষ্টি যে দুর্গাপুরের দিকে তোমার মাথার ওপর হচ্ছে, তখন তা জানতাম না।

আমাদের এই বাড়িটা ফাঁকা জায়গায় তৈরি করা হয়েছিল। চারদিকে বাগান আর উঁচু পাঁচিল। কেল্লা বললেই চলে। এখন কিন্তু প্রোমোটারদের দৌলতে দূরে দূরে অনেক উঁচু বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং। এমনি একটা বিল্ডিং-এর অনেক উঁচুতে একটা আলো জ্বলছিল আর নিভছিল। টর্চের আলো নিশ্চয়। অনেকক্ষণ চেয়েছিলাম। তারপর মনে হলো, অকারণে কেউ টর্চের ব্যাটারি পোড়াচ্ছে না। উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য একটাই—আলোর সঙ্কেতে খবর পাঠানো। মনে পড়ে গেল তোমার অভয়বাণী। আমার ছাদের ঘরে নজর রাখছে তোমার লোক।

তাই এবার আলোর সঙ্কেতের মানে বোঝবার জন্যে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। বুঝতেও পারলাম। মর্স কোড আমি জানি। এটা সেই জাতীয়। ক্ষণেকের জন্যে জ্বলেই নিভে যাচ্ছে—আবার হয়তো একটু বেশি জ্বলেই নিভছে।

দেখেও ভাল লাগল। ভাল নজরদার লাগিয়েছো আমার পেছনে। গহন রাতে আলো নিয়ে খেলছে।

একটু পরেই একটা ইংরেজি হরফ ধরতে পারলাম। আলোটা একটু বেশি জ্বলেই নিভে গেল; পরক্ষণেই টুক করে জ্বলেই নিভল। এই সঙ্কেতের মানে N।

একটু পরে পর-পর তিনবার টানা জ্বলে নিভল আলো। এই সঙ্কেতের মানে O; বেশ উত্তেজিত হলাম। মজাও লাগল। এইভাবে কোডমাস্টার লিখল FEAR। তারপর আর টর্চ মারল না—ব্যাটারি ফুরিয়েছে নিশ্চয়।

কিন্তু মেসেজটা আমি পেয়ে গেলাম। NO FEAR। ভয় নেই, ভয় নেই, আমরা আছি!

রীতিমতো রোমাঞ্চকর ব্যাপার তো। তখন কি ছাই আমি জানি, প্রতীশকে তুমি ডিউটি দিয়ে গেছো—অন্য বাড়ির বন্ধুর ঘর থেকে তার বৌদির ওপর নজর রাখতে বলে নিজে পালাচ্ছ দুর্গাপুরে।

প্রতীশ ছেলেটা বড় ভাল গো। অমন দেওর নিয়ে সংসার করার সুখ আর পেলাম না।

আলো যখন আর জ্বলছে না, কাঁহাতক আর ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা যায়। এদিকে ঝড়ের আভাস জাগছে। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে। শাড়ির আঁচল উড়ছে, চুল উড়ছে, আর তোমার জন্যে মন হু-হু করছে। মুনমুন মেয়েটার ওপর রাগও হচ্ছে। নিশ্চয় কথায় কথায় তোমাকে আটকে রেখেছে—ফোন করতে দিচ্ছে না। অথবা এতখানি গাড়ি চালানোর ধকলের পর মড়ার মতন ঘুমোচ্ছো।

আরও একটা আতঙ্ক উঁকি দিচ্ছিল মনের মধ্যে। আমার গুণধর বাবা হায়ার্ড কীলার দিয়ে তোমাকে শেষ করে দিলেন না তো!

ছাদের দরজায় আওয়াজ শুনে ইস্তক আমার মনে এই ভয় ঢুকেছিল। ঠিক যখন 'দুর্গাপুরে। মুনলাইট মোটেলে' বলেছি, আওয়াজটা হয়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। দৌড়ে ছাদ থেকে নেমে গেছে যে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে তোমার ঠিকানা শুনেছে, তারপর পালিয়েছে। অবশ্যই, খবর চলে গেছে বাবার কাছে। বাবা কি বসে থাকবার পাত্র? পয়লা নম্বর অ্যাকশন মাস্টার তিনি—যা করেন, ঝটিতি করেন। তোমার ওপর যখন খেপেছেন, তখন আর তোমার রেহাই নেই।

কিন্তু নীতিশ, মাথার ওপর ভগবান আছেন। তিনি সব দেখছেন, সব বিচার করছেন, সুরাহা করে দিচ্ছেন সব সমস্যার।

তা নাহলে মন যখন আমার ভারাক্রান্ত তোমার জীবনহানির আশঙ্কায়, ঠিক তখনি তোমার বন্ধু শেখসাহেবের টেলিফোনটা আসবে কেন?

ওই ফোনটা আসবার পরে বুঝেছিলাম, কেন তুমি ফোন করছিলে না। ফোন এনগেজ করে রাখতে চাওনি। শেখসাহেব যাতে ফোনে আমাকে পেয়ে যান, সেই সময়টা তুমি তাঁকে দিয়ে, তুমি নিজে গল্পের আসর জমিয়েছিলে মুনমুন মেয়েটার সঙ্গে।

ফোনটা বেজে উঠল আমি যখন ছাদের ঘরে ফিরে এসেছি। নাইট ল্যাম্প জ্বলছে। ভোর হওয়ার প্রতীক্ষা করছি। এমন সময়ে ফোন পিঁ পিঁ করে উঠল। শেখসাহেবের গলা ভেসে এল।

উনি বললেন—"আমি আপনাদের কেস টেক্-আপ করেছি। প্রথমেই আপনার ওই উজবুক ভবিষ্যৎ-স্বামীটার চোর বদনাম ঘোচানোর ব্যবস্থা করেছি। ওইটা করতে গিয়েই একটু দেরি হয়ে গেল। নইলে আগেই ফোন করতাম।"

আমি তো হাঁ। উনি বললেন—"কথা বলছেন না কেন? নীতিশকে উজবুক বলেছি বলে রাগ করলেন?"

তখন আমি বললাম—"রাগ তো করিইনি—উল্টে খুব খুশি হয়েছি। পুরুষ

জাতটাই এই রকম। একটা মেয়েকে ভালবেসে ফেললে, তার জন্যে সব করতে পারে।"

সেকি হাসি শেখসাহেবের। হাসতে হাসতেই বললেন—"আপনি তো দেখছি দারুণ পুরুষ-বিদ্বেষী।"

ওই হাসি শুনেই আমার উৎকণ্ঠা অনেকটা কমে গেল। বললাম—"আগে বলুন উজবুকটার বদনাম ঘোচানোর কি ব্যবস্থা করলেন।"

"সোমবার ফার্স্ট আওয়ারে ক্যাশ চার লাখ ব্যাঙ্কে জমা পড়ছে।"

"আপনার টাকা?"

"আমি ফকির মানুষ। তবে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। নীতিশ পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার আপনাকে উড়িয়ে দিতে হবে—খাঁচা থেকে।"

"পারবেন?"

"আমি টিপ্‌স্ দিচ্ছি, আপনি অ্যাক্ট করবেন।"

"টিপ্‌স্?"

"একটা টেলিফোন নাম্বার বলছি, লিখে নিন...নিয়েছেন? এই টেলিফোন যাঁর, তাঁর নাম মণিবেগম। লালবাজারের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ শাখার অফিসার-ইন-চার্জ।"

"উওমেন্স গ্রীভ্যান্স সেল?"

"নাম শুনেছেন?"

"নিশ্চয়। বদমাশ স্বামীদের জব্দ করার পুলিশ ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু আমি কেন সেখানে ফোন করব? প্রথম কথা, আমি এখনও নীতিশের লিগ্যাল বউ নই। দ্বিতীয় কথা, নীতিশ বদমাশ নয়, সে কোনওদিন আমাকে পিটোবে না—পুড়িয়েও মারবে না।"

"আরে, আমার কথাটা আগে শুনুন।"

"বলুন না।"

"মেয়েদের ওপর নিগ্রহ বন্ধ করার জন্যেই ইন্দিরা গান্ধী 498A আইন চালু করেন—বিয়ে করা মেয়েদের জন্যে ঠিকই। সত্যি-সত্যিই যেসব নারী নির্যাতিতা হচ্ছে—তাদের জন্যে বুক দিয়ে পড়ছে এই ডিপার্টমেন্ট। আবার, এই আইনের সুযোগ নিয়ে কিছু মতলববাজ নারী যখন স্বামীদোহন করতে যাচ্ছে মিথ্যে মামলা সাজিয়ে—তাও ধরে দিচ্ছে এই ডিপার্টমেন্ট। পার পাচ্ছে না অন্যায় যে করছে—সে। ফুল্লরা, আপনার ক্ষেত্রেও অন্যায় হয়ে চলেছে।"

"কিন্তু সে অন্যায় তো করছেন আমার বাবা?"

"এবং তিনি একজন পুরুষ। আপনার বিয়ে আটকাতে চান—খাঁচায় আটকে রেখেছেন—আপনি তো প্রাপ্তবয়স্কা?"

"তা ঠিক। কিন্তু—"

"ও.সি মণিবেগম তাঁর ডিসক্রিশন অ্যাপ্লাই করবেন, ফোর্স পাঠিয়ে আপনাকে রেসকিউ করবেন—যে ভাবেই হোক। তারপর টুক করে লিগ্যাল ম্যারেজটা সেরে নিলেই আর আপনাদের ধরে কে।"

"আপনি কি বলে রেখেছেন?"

"ওসি-কে? হ্যাঁ। এটা তাঁর বাড়ির নাম্বার। আপনি ফোন করুন—বিরক্ত হবেন না। অবলা মেয়েদের জন্যে সত্যিই ওঁর প্রাণ কাঁদে।"

"নীতিশের খবর কী?"

"সেটা আর একটা ইস্যু। আমি দেখছি। ভয় নেই। আপনি শুধু মণিবেগমকে ফোনটা করে রাখুন। গুড নাইট।"

উওমেন্স গ্রীভ্যান্স সেল-এর নাম কেন শুনব না? কাগজ খুললেই রোজই তো একটা না একটা বধূ নির্যাতন আর বধূহত্যার খবর বেরচ্ছে। পুলিশ যখন শুনছে, বউ পোড়ানো হয়ে গেছে, অথবা আত্মহত্যা করতে গিয়ে বউ বেঁচে গেছে, তখন স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি-দেওর-ননদকে ধরে জেলে পুরে দিচ্ছে। বউ নির্যাতন করলে নাকি জামিন পাওয়া যায় না—জেলে ঢুকতেই হয়। আর, মেয়ে যা বলবে, তাই সত্যি। সে মিথ্যে বললেও সত্যি।

তারপরেই পাঁচটা কাগজে এই আইনটা নিয়ে লেখালেখি হয়েছিল। যেহেতু আমি একজন নারী এবং আমারও একদিন বিয়ে হবে—তাই এই জাতীয় সব খবর খুঁটিয়ে পড়তাম। সেই সময়ে জেনেছিলাম, চুটিয়ে এই আইনটার সুযোগ নিয়ে চলেছে একদল ধান্দাবাজ নারী। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের আইনকে লাঠি বানিয়ে পুরুষ নির্যাতন করে চলেছে। পয়সা রোজগার করছে পতিদের ওপর নিগ্রহ চালিয়ে।

পীড়িত পুরুষ পতি পরিষদ নামে একটা সংস্থা রুখে দাঁড়িয়েছে এই আইনের বিরুদ্ধে। এ-আইন নাকি ভাল করছে অনেক মেয়ের—কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশি কেসে এই আইনের সুযোগ নিয়ে মিথ্যে মামলায় শোষণ করা হচ্ছে স্বামী আর শ্বশুরদের। রীতিমতো একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পণপ্রথার ঠিক উল্টো নিগ্রহ চলছে পতিদের ওপর। মুখরোচক খবরগুলো পড়তাম আর বন্ধু-টন্ধুর সঙ্গে গল্প করতাম। পুলিশ আর উকিল নাকি এই আইনের সুযোগ নিয়ে দু'হাতে পকেট ভরে নিয়েছে—আবার এই পুলিশ আর উকিলই দু'হাত তুলে রুখে দাঁড়িয়েছে যখন দেখেছে—স্রেফ অর্থলিপ্সায় বিবাহিতা নারীর বাড়ির লোকজন এই আইনের লগুড় ঘোরাচ্ছে—মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে জেনেও। ব্রেনওয়াশ করে মেয়েটাকে রোবট বানিয়ে, তাকে দিয়ে কাঁচা মিথ্যে বলিয়ে, নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিয়েছে।

হতভাগিনী নারী! তোমরা যেখানে ছিলে, সেইখানেই আছ। নারীবাদ আর নারীমুক্তির নামে অবলা নারীদের ভুল পথে চালিয়ে সবলা নারীরা নিজেদের আখের তৈরি করে নিচ্ছে।

দুটো সংস্থার নাম বেশি করে চোখে পড়েছে। রাজ্য মহিলা কমিশন আর উওমেন্স গ্রীভ্যান্স সেল। শেষেরটা যেন বেশি অ্যাকটিভ বলে মনে হয়েছিল। এখানে গেলে সুবিচার হবেই। বদমাশ বর-রা যেমন চিতিয়ে যাবে, রণরঙ্গিনী বউরাও তেমনি কল্কে পাবে না।

এই সেল-এর কর্ণধার যে একজন মহিলা এবং তাঁর নাম মণিবেগম, সেটা আমার জানা ছিল না।

শেখসাহেব এলেমবাজ মানুষ বটে। ঝট করে প্রবলেম সলিউশনের গোড়ায় চলে গেছেন। নীতিশ, তুমি আর আমি কেউই কিন্তু আগে ভাবিনি এই সব সংস্থার কথা। ভাবলে, তুমি টাকা চুরি করতে যেতে না।

তোমার বন্ধুভাগ্য ভাল।

এইবার আমি পড়লাম ফাঁপরে। পীড়িত পুরুষ পতি পরিষদ-এর একটা ফাংশনে আমি গেছিলাম। তাদের কিছু কিছু বুলেটিন আর প্যামফ্লেট আমার হাতে এসেছিল। বন্ধুবান্ধবরা বলত, উওমেন্স গ্রীভ্যান্স সেল নাকি ভয়ানক কড়া ডিপার্টমেন্ট।

শেখসাহেব বললেন, এই দাপুটে ডিপার্টমেন্টের খোদ অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে কথা বলতে—এই গভীর রাতে।

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার।

নীতিশ, ঠিক এই সময়ে ফোন এল তোমার। আমি এখনও মণিবেগমকে ফোন

করিনি শুনে সেকি চিৎকার তোমার। আমি বলেছিলাম—"নীতিশ, বিয়ের আগে এইভাবে যদি তুমি ভাবী বধূ নির্যাতন করো, তাহলে ভেবো না বিয়ের পরে তোমাকে ছেড়ে দেব।"

তুমি বলেছিলে—"হে সখি, তাই করবে—সম্মতি দিলাম এখুনি। তবে আগে বউ হবার ব্যবস্থাটা করো। মণিবেগমের মন নরম—একটা কথা মনে রেখো, যা নরম, তা আসলে ইস্পাতের চেয়েও শক্ত। সংস্কৃত শ্লোকটা এক্ষুণি মনে করতে পারছি না—বিয়েটা হয়ে গেলে মনে পড়বে। কিন্তু দোহাই তোমার, আর দেরি কোরো না।"

আমি আমতা-আমতা করছি দেখে তুমি আবার চেঁচিয়ে উঠেছিলে। বলেছিলে—"তুমি তো নারী বটে।"

আমি বলেছিলাম—"বার্থ সার্টিফিকেটে তাই লেখা আছে বটে।"

"তবে এত দ্বিধা কেন, প্রাণেশ্বরী? তুমি নারী। বিয়ের আগে নারী। বিয়ের পরেও নারী। ডিপার্টমেন্টটার নামই তো—"

"নারী নির্যাতন প্রতিরোধ শাখা," বলেছিলাম আমি।

"তাহলে তো হয়েই গেল। তুমি ওই 'নারী' লাইনেই চলে যাবে। তোমার বিয়ে আটকে দিচ্ছেন তোমার বাবা। খাঁচায় পুরে নির্যাতন করছেন। সভ্য শিক্ষিত দুনিয়ায় এর চাইতে বড় নির্যাতন আর হয় নাকি? ফুল্লরা, রাত গড়িয়ে যাচ্ছে। ফোনটা করে নাও।"

তখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, মা আমার জন্যে কি করতে যাচ্ছে। কাল সকালেই আমাকে নিজে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবে। সুতরাং মণিবেগম-কে উত্যক্ত করার দরকার আছে কী?

তুমি যেমন খুশি হলে, তেমনি রেগে গেলে। তোমার ভাবী শাশুড়ি নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে মেয়েকে গাড়ি সমেত পাঠিয়ে দিচ্ছে ভাবী জামাইয়ের কাছে—এই খবর শুনে তুমি বলেছিলে—"ফুল্লরা, আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।" তারপরেই মাথাগরম করে ফেললে—"তারপরেই তোমার বাবা-কে টেনে ধরা দরকার। সেটা পারবেন মণি-বেগম। তিনি তোমার মতন ভীতু নন।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বুঝি?" বলেছিলাম আমি।

"শেখসাহেবের কাছে শুনলাম। ভেলভেট আউটসাইড, স্টীল ইনসাইড। ফুল্লরা, প্লীজ তোমার ড্যাডি-কে চেক করো।"

তাই করলাম।

তখন রাত দুটো। অপর প্রান্তে অনেকক্ষণ টেলিফোন বেজে যাবে—এই ভয় করেছিলাম। এটা ঘুমের সময়।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে নেওয়ায়। একটা রিঙ-ও কমপ্লিট হলো না। অপরপ্রান্তে ধ্বনিত হলো মার্জিত নারীকণ্ঠ—"হ্যালো।"

সুস্পষ্ট উচ্চারণ। ঠিক আমার মায়ের মতন।

ব্যস, ওই যে ধারণাটা মাথার মধ্যে এসে গেল—ঠিক আমার মায়ের মতন—ওষুধ ধরল ওইতেই।

ভয় কেটে গেল আমার।

আমি বললাম আমার কথা, শেখসাহেবের কথা, মায়ের কথা এবং আমার বাবার কথা।

উনি একটা কথাও না বলে সব শুনলেন। তারপর আস্তে বললেন—"সব টেপ-রেকর্ডেড হয়ে গেল। এইবার তোমার কমপ্লেন্ট ইন রাইটিং চাই।"

"কিন্তু আমি তো—"

"এখুনি লিখে ফেলো। অ্যাড্রেস করবে ডিসিডিডি (ওয়ান), লালবাজার। অ্যাটেন-শনে লিখবে আমার ডেসিগনেশন আর ডিপার্টমেন্টের নাম। বুঝেছো?"

"হ্যাঁ।"

"চিঠিখানা লিখে সঙ্গে নিয়ে বেরবে। তোমার মা যখন গাড়ি নিয়ে বেরবেন গেট পেরিয়ে, দেখবে নীল শাড়ি আর নীল ব্লাউজ পরা একটি মেয়েকে। তোমাদের গাড়ির দিকে আসবে—কি রঙের কি গাড়ি?"

"সাদারঙের মারুতি এইট হান্ড্রেড।"

"জানলা দিয়ে চিঠিখানা তার হাতে ধরিয়ে দেবে। লিখিত অভিযোগ হাতে এলেই আমার অ্যাকশন শুরু হবে।"

"বাবাকে জেলে ঢুকিয়ে দেবেন নাকি?"

"না। তবে পুলিশে ছুঁলে যে আঠারো ঘা হয়, এটা বুঝে যাবেন।"

"আমার মা?"

"তাঁর ওপর আমাদের নজর থাকবে। তাঁর গায়ে আঁচ লাগবে না।"

"আপনাকে দিদি বলব, না, মাসি বলব?"

"মাসি। মণিমাসি। লিগ্যাল ম্যারেজটা সোমবারেই করে নেবে—তারপর শুনব বারমাস্যা।"

"ফুল্লরার বারমাস্যা?"

"আরে না, সেতো দরিদ্রের বারমাসের দুঃখবর্ণনা। কবি কঙ্কণের বারমাস্যা। তোমার নামটা ফুল্লরা কে দিয়েছিলেন?"

"মা।"

"কেন এ নাম দিতে গেলেন! তুমি তো কোটিপতির কন্যা।"

"ছাই কন্যা। খাঁচার বন্দিনী কন্যা।"

"খাঁচার দ্বার যাবে খুলে—বিহঙ্গমা তুমি যাবে উড়ে—হয়ে যাবে উপকথার ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী—তখন তোমাদের বারমাসের আমোদ-আহ্লাদ আর সুখ-বিলাসের বারমাস্যা ভারতচন্দ্রের 'বারমাস-বর্ণন'কেও ছাড়িয়ে যাবে।"

"মাসি—"

"মণিমাসি।"

"মণিমাসি, এত সুন্দর কথা আপনি বলেন। তবে যে শুনেছিলাম, আপনার ডিপার্টমেন্টের মতনই আপনি খুব কড়া।"

হাসলেন মণিমাসি—"নরমে নরম, গরমে গরম।—ছাড়লাম।"

রাত তখন আড়াইটে।

আর ঘন্টা দুয়েক পরে কাক ডাকবে। মা আসবে। আমি চলে যাব চিরদিনের জন্যে।

কী ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলাম! আর পাঁচটা মেয়ের মতন আমার বিয়ে হবে না। ফুলে ঢাকা গাড়িতে বর আসবে না। শাঁখ বাজবে না। উলু দেওয়া হবে না। মন্তর পড়া হবে না। নীতিশ, তুমি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে কুনকের ওপর সিঁদুর নিয়ে আমার মাথায় ঢেলে দেবে না। তবুও আমি তোমার বউ হয়ে যাবো—একটা কাগজে সই করে।

নীতিশ, তুমি তো জানো, এই সব প্রথাগুলোকে আমি কত ভালবাসি। আমি কেন, আমার তো মনে হয়, দুনিয়ার সব মেয়েই নিজের নিজের ধর্মীয় প্রথাগুলোকে বিলক্ষণ সেন্টিমেন্টের চোখে দেখে। আজ আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি, আমি তো মুসলমান হয়েও জন্মাতে পারতাম, অথবা খ্রিস্টান হয়ে। বিয়ের সময়ে মেয়েরা যা চায়, তা কি হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানে আলাদা থাকে? ধর্মীয় প্রথাগুলোকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মনময়ূর আর মনময়ূরী যাতে পেখম তুলে

এত লিখতে তো কোনওদিন পারতাম না।

নেচে ওঠে। এসব বাদ দিয়ে একখানা কাগজে সই মেরে দিয়ে ঘরকন্না করতে বসে যাওয়ার নাম বিয়ে নয়।

কিন্তু কি কপাল আমার! সে আশা আমার মিটল না—আমার মায়েরও মিটল না। খুব ছোট্টবেলায়, আমার মনে পড়ে, যখন দুষ্টুমি করতাম, সেবামাসি আমাকে থামাতে পারত না—আমার মা আমাকে কোলে নিয়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে গানের সুরে বলত—"দুষ্টু মেয়ে! দুষ্টু মেয়ে! কাল না তোর বিয়ে? বর আসবে টোপর নিয়ে—তখন হবে ইয়ে!" ওই গান শুনলেই আমি শান্ত হয়ে যেতাম।

সেই মা আর দু'ঘণ্টা পরে মেয়েকে না সাজিয়ে বাড়ির ফটক পার করিয়ে দেবে নিজে নিজে বরের কাছে চলে যাওয়ার জন্যে। বর আর এল না টোপর মাথায় দিয়ে। মায়ের সাধও মিটল না।

কেন জানি না, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, মা যেন এই সবকিছুর জন্যেই তৈরি হয়ে ছিল। মায়ের মুখেই শুনেছি, জন্মেছি আমি কোটিপতির কন্যা হয়ে। তা সত্ত্বেও আমার নাম রাখল ফুল্লরা। কেন?

মণিমাসিও অবাক হয়েছেন।

ফুল্লরার বারমাস্যা বলে ফেলেই তাই বারমাসের বর্ণনায় চলে গেলেন। কবি-কঙ্কণের ফুল্লরার বারমাস্যা যে বারমাসের দুঃখভোগের বর্ণনা—তা বুঝিয়ে দিয়ে চলে এলেন ভারতচন্দ্রের বারমাসের বর্ণনায় যেখানে আছে শুধু সুখ-বিলাস, আমোদ-আহ্লাদ।

দূরদর্শিনী মা কি জানতে পেরেছিল, কোটিপতির কন্যা হয়ে জন্মেও আমার হাল হবে এই? বর পেয়েও পাব না—পা বাড়াব জন্মান্তরের পথে?

নীতিশ, মিলন কি আমাদের ললাটে লেখা নেই? অশরীরী নীতিশ, হাসছ মনে হচ্ছে? ভাবছ মরবার আগে আমার মাথা বিগড়েছে?

বিগড়েছিল সেইদিনই যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছিলাম। তোমার মাথাও বিগড়েছিল যেদিন প্রথম আমাকে দেখেছিলে। অথচ কেউ কাউকে আগে দেখিনি। তা সত্ত্বেও তোমার মনে হয়েছিল, তুমি যেন আগে কোথায় আমাকে দেখেছ। আর আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন আগে কোথায় তোমায় দেখেছি।

ক্ষণেকের জন্যে আমরা দু'জনেই জাতিস্মর হয়ে গেছিলাম। পূর্বজন্মের পরিচয় ক্ষণেকের জন্যে উদ্ভাসিত হয়েছিল—চিনিয়ে দিয়েছিল পরস্পরকে। তারপর থেকে ঝড়ের সঙ্গে যেন উড়ে চলেছি দু'জনে—ছিটকে গেলাম দু'জনে দু'দিকে—তুমি চলে গেলে বিদেহীদের লোকে—যেখানে আমি যাব এখুনি—লেখাটা শেষ করে নিয়েই।

একসঙ্গে এত লিখতে তো কোনওদিন পারতাম না। এ শক্তি আসছে কোত্থেকে? জোগানদার নিশ্চয় তুমি—দাঁড়িয়ে আছ পাশে—আমার পথ চেয়ে।

প্রিয়তম, একটু সবুর করো। আমি আসছি। ও পারের ডাক শুনতে যখন পেয়েছি, এ পার আমাকে আর আটকে রাখতে পারবে না।

ঘটনাবহুল সেই রাতটার কথা শেষ করে

নিই। মণিমাসি তো টেলিফোন রাখলেন। আমিও কাগজকলম নিয়ে ওঁর নির্দেশ মতন ডিসিডিডি (ওয়ান), লালবাজারকে সব লিখে জানালাম—অ্যাটেনশনের জায়গায় লিখে দিলাম, অফিসার ইন-চার্জ, উত্তমেল গ্রীভ্যান্স লেন।

লিখে-টিখে ছাদে এসে দাঁড়ালাম। মাথা টিপ-টিপ করছিল। রাত তখন সাড়ে তিনটে। আর এক ঘণ্টা পরে মা আমাকে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে জিটি রোডে—পাঠিয়ে দেবে আমার বরের কাছে, যে বরকে সে দেখেনিও না—বরের টোপর দেখা তো দূরের কথা।

সেই উঁচু বাড়িটার দিকে নজর গেছিল জানালা থেকেই। নজর টানছিল সেই আলোর সঙ্কেতটা। ফের ব্যাটারি পোড়াচ্ছে আমার হবু-দেওর।

চেয়ে রইলাম। আলোর সঙ্কেতে মর্সকোড। প্রতীশের গুণ অনেক। এমন একটা দেওরের সঙ্গে খুনসুটি করে সংসার করতে পারলাম না—এই দুঃখ নিয়েই আমি চলে যাচ্ছি। দেখেশুনে বিয়েও দিতাম—জোর করে টোপর পরাতাম। কত সাধ ছিল এই প্রাণে। কিছু হলো না।

আলোর সঙ্কেত দেখে মনে মনে হরফগুলো সাজালাম। এবার কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। আর মাত্র এক ঘণ্টা বাকি, এ বাড়ি থেকে উড়ে গিয়ে তোমার খাঁচায় ঢুকব। সারাজীবনের জন্যে। কিন্তু এ কী বার্তা পাঠাচ্ছে তোমার ভাই!

DANGER!

ঘেমে গেলাম। আলোর সঙ্কেত বন্ধ হয়েছে। আমি ছাদের পাঁচিল বরাবর হেঁটে গেলাম। বাগান দেখলাম। বাগানের পাঁচিলের ওদিকে দেখলাম। ডেঞ্জারাস তো কিছু দেখতে পেলাম না।

ডোবারম্যান আর অ্যালসেসিয়ানগুলো অবশ্য টহল দিয়ে যাচ্ছে। নাইট গার্ড-ও কিছুক্ষণ অন্তর বাড়ি প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে। এছাড়া কোনও জীবিত অথবা মৃত প্রাণী তো কোথাও দেখছি না।

ডেঞ্জার-টা তাহলে কিসের?

জানলাম, ভোরের কাক ডাকবার পরেও যখন মা এল না।

এল সেবামাসি। মুখ গম্ভীর। চোখের কোণে কালি।

আমাকে কিন্তু বলল—"ঘুমোসনি?"

আমি বলেছিলাম—"জানলে কি করে?"

"তোর চোখের তলায় কালি দেখে। বিছানার চাদর যেমন তেমনি রয়েছে দেখে। বালিশেও মাথা রাখার গর্ত নেই। সর্বনাশী! একি করলি তুই!"

আমি কথা বলতে পারলাম না। এখনও তো কিছু করিনি আমি। কিন্তু মা আসছে না কেন?

বলেও ফেললাম—"মা কোথায়?"

সেবামাসির মুখখানা কেমন [illegible] হয়ে গেল। জবাব দিল না।

ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলাম প্রতীশের 'ডেঞ্জার' আলোর সিগন্যাল দেখবার পর থেকেই। এবার কেঁদে ফেললাম।

সেবামাসি বললে—"মা আর আসবে না।"

"কেন আসবে না? কি করেছি আমি?"

"মা ছবি হয়ে গেল।"

থ হয়ে চেয়ে রইলাম। একথার কি মানে হয়, তা বুঝতে অন্য সময়ে অনেকটা সময় লাগত। সেই ভোররাতে একটুও সময় লাগেনি। দৌড়ে বেরিয়ে গেছিলাম ঘর থেকে। ছুটতে ছুটতে নেমে এসেছিলাম দোতলায় মায়ের শোবার ঘরে। পেছন পেছন আসছে সেবামাসি।

শোবার ঘরে মা নেই। কিন্তু শুয়েছিল বিছানায়। বালিশে রয়েছে খোঁদল। চাদর লাটঘাট।

"মা কোথায়?" হাহাকারের মতন নিশ্চয় শুনিয়েছিল ভোরবেলা আমার সেই প্রশ্ন।

সেবামাসি শুকনো চোখে চেয়ে রইল।

বাড়িতে কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। আমি যে অত জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম, তা শুনেও বাবা দৌড়ে আসেননি—কেউ আসেনি।

"মা কোথায়? মা কোথায়? মা কোথায়?" তিন-তিনবার কান্নাজড়ানো গলায় চেঁচিয়েছিলাম। সেই চেঁচানির মধ্যে ছিল আকুতি, ছিল ব্যাকুলতা, ছিল অসহায়তা।

যে আমাকে বরের কাছে পৌঁছে দেবে, সে নেই ঘরে।

সেবামাসি আস্তে বললে—"আয়।"

হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল মাঝের ঘরে—যে ঘরে আত্মীয়স্বজনরা এলে বসে, যে ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে মায়ের রহস্যমাখা মুখ আর অবয়বের আলো-আঁধারি ভরা অয়েলপেন্টিং।

এই অয়েলপেন্টিংয়ের নিচে, রঙিন পাথরের মেঝের ওপর শুয়ে আছে আমার মা। দুই চোখ বন্ধ। দু'হাত বুকের ওপর রাখা। পাশে একটা খালি শিশি।

মা বেঁচে নেই। দেখেই বুঝলাম।

মাথার কাছে গুম হয়ে বসে আমার বাবা। আমি ঘরে ঢুকতেই শুধু চোখ তুলে চাইলেন। সে চোখে শোকের ছায়াও দেখলাম না।

বললেন—"কনট্রোল ইওরসেল্ফ। ইওর মাদার হ্যাজ কমিটেড সুইসাইড। এই ঘরে।"

ওই অবস্থায় কে যেন আমাকে আচমকা চাবুকের মতন শক্ত করে দিল—সে তুমি, সে তুমি, সে তুমি, নীতিশ। তখনও জানতাম না, তুমিও নেই।

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা—"সুইসাইড করবার জন্যে এ ঘরে এল কেন?"

মুখ শক্ত হয়ে গেল বাবার—"সুইসাইড নয় বলে মনে করছ?"

"হ্যাঁ, করছি। সুইসাইড নোট কোথায়?"

"নেই। মোমেনটারি ইনস্যানিটি। এই ছবি বড় ভালবাসত—ছবির নিচে শুয়ে ছবি হয়ে গেল।"

ছবি হয়ে গেল! ঠিক এই কথাটাই সেবামাসির কাছে একটু আগে শুনেছিলাম। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরালাম সেবামাসির চোখের দিকে।

চোখে চোখ রাখতে পারল না সেবামাসি। চোখ নামিয়ে নিল।

এতদিন যে সব কথা মুখ দিয়ে বেরয়নি—সেই ভোররাতে সেইসব কথা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। দাঁতে দাঁত পিষে বললাম—"বেশ্যা! মায়ের জীবন ধ্বংস করেছ। এখন বিষ খাইয়ে মারলে।"

"বিষ যে খাওয়ানো হয়েছে তার প্রমাণ?" কড়া গলায় বললেন আমার বাবা।

প্রমাণ! প্রমাণ কই? কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? কাকে বলব যে ঠিক যে সময়ে মা আমাকে নিয়ে এই খাঁচার বাইরে বেরিয়ে যেত, ঠিক সেই সময়ে মা তার নিজের শরীরের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে?

স্বইচ্ছায়, না, অনিচ্ছায়? প্রমাণটা করব কি করে?

টেলিফোন বাজল ঠিক এই সময়ে। সেলুলার ফোন। বেরিয়ে যাব বলে তৈরি হয়েই ব্লাউজের ভেতরে রেখে দিয়েছিলাম।

সেই সেলুলার বাজল। বাবা চমকে উঠলেন।

আমি আর পরোয়া করলাম না। ঝটকান মেরে সেলুলার বের করে বাটন টিপে কানে লাগালাম। ভেসে এল শেখসাহেবের কাটছাঁট কথার ঢেউ—"ফুল্লরা? শক্ত হও। বাবা কোথায়?"

আমি বললাম—"সামনে।"

"মা?"

"সুইসাইড করেছে বলা হচ্ছে—আমার মনে হয় মার্ডার।"

বাবা ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠলেন। আমি দৌড়োলাম। সেলুলার নিয়ে দৌড়োলাম। সোজা তিনতলার ছাদে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করলাম বাবা আর সেবামাসির মুখের ওপরেই। তারপর বন্ধ করলাম নিজের ঘরের দরজা। কানে লাগালাম সেলুলার—"বাবা আর সেবামাসির তাড়া খেয়ে তিনতলায় এসে দরজা বন্ধ করে কথা বলছি। বাবার চোখে খুন দেখেছি। দরজা ভাঙছে।"

ঠাণ্ডা গলায় শেখসাহেব বলেন—"খবরটা অনেক আগেই আমাদের কাছে এসেছে। প্রতীশ দেখেছে তোমার মা-কে চ্যাংদোলা করে তোমার বাবা আর সেবামাসি নিয়ে যাচ্ছে মাঝের ঘরের দিকে। তোমার মা হয় তখন জ্ঞান হারিয়েছিলেন অথবা মারা গেছিলেন। তুমি বলে কথা বলছি। খেয়াল ছিল না। দরজা ভাঙার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। দরজার এদিক থেকে বাবাকে বলে দাও—পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। দরজা ভাঙলে অ্যারেস্ট আটকানো যাবে না। যাও।"

আমি দৌড়ে গেলাম। একটা কব্জা উপড়ে এসেছিল—ছাদের দরজার। আমি ফাঁক দিয়ে বাবার জ্বলন্ত চোখ দেখলাম। আমিও জ্বলন্ত চোখে তাকালাম। চিৎকার করে বললাম শেখসাহেব যা বলতে বলেছেন।

দরজায় ধাক্কা বন্ধ হলো। কানে সেলুলার লাগালাম—"দরজা ভাঙা আর হচ্ছে না।"

"বাবা কোথায়?"

"সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। ছাদ থেকে দেখতে পাচ্ছি পুলিশ কর্ডন করেছে গোটা বাড়ি। গেটের সামনে এসে গেছে পুলিশজীপ।"

"গুড। তোমার বাবার টেলিফোন নাম্বারটা কী?"

নাম্বার বললাম।

শেখসাহেব বললেন—"ওঁকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, মার্ডার চার্জে ধরা পড়েছে পায়ের জুতো।"

"পায়ের জুতো!"

"যার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবার প্ল্যান করেছিলেন তোমার বাবা। আজ ভোররাতে সে নিজে দুর্গাপুরে গাড়ি হাঁকিয়ে এসে গুলি চালিয়েছিল নীতিশের দিকে—"

"নীতিশ!"

"ডেডবডি একটা পড়েছে। পায়ের জুতোর জন্যে আমরা ওয়েট করেছিলাম। তার নাম বিশ্বজিৎ। আর গুলি চালাতে দিইনি। তাকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছি।—যাও, ফুল্লরা, যাও—ঘরে যাও। রবীন চৌধুরীকে যা বলবার বলে দিচ্ছি।"

টেলিফোন কেটে দিলেন শেখসাহেব। মনে হলো, আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। দেওয়াল ধরে ধরে ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

জ্ঞান হারিয়েই ফেলতাম—যদি না সেলুলার ফের বেজে উঠত।

কিন্তু কথা ফুটল না সেলুলারে। পরিষ্কার বুঝলাম, ফোন যে করছে, সে শুধু আমার কথা শুনছে—কথা বলছে না ইচ্ছে করেই।

নাকি, কথা বলার শক্তি সে হারিয়েছে। রক্তমাংসের শরীরে সে আর নেই।

মনে পড়ল, শেখসাহেবের প্রথম কথা—'ফুল্লরা, শক্ত হও।' খুব ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলেন। কেন বলেছিলেন, কেন? নীতিশ, তুমি আর নেই বলে?

মনে পড়ল শেখসাহেবের আর একটা কথা—আজ ভোররাতে বিশ্বজিৎ দুর্গাপুরে

গিয়ে গুলি চালিয়েছিল নীতিশের দিকে...ডেডবডি একটা পড়েছে...

নীতিশ, তুমি বেঁচে গেছ কিনা—তা কেন বললেন না শেখসাহেব?

কারণ, তুমি বেঁচে নেই। ভৌতিক টেলিফোনে তাই কথা বলতে পারছ না—শুধু আমার কথা শুনে যাচ্ছ।

আমি বুঝতে পারছি। শেখসাহেব বিশ্বজিৎকে আনছেন—সেইসঙ্গে আনছেন ডেডবডি—তোমার।

সে দৃশ্য দেখবার আগেই আমি চলে যাব—তোমার কাছে।

নিচের তলায় খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে লিখছি। শেখসাহেব নিশ্চয় এসেছেন।

'ফুল্লরা, ফুল্লরা' বলে কে চেঁচাচ্ছে? ও গলা তো আমি চিনি। ও যে তোমার গলা।

আমি পাগল হয়ে গেছি। সিজোফ্রেনিয়া রোগে এমনি হয়। মাথার মধ্যে কথা শোনা যায়। আর নয়, একেবারে পাগল হয়ে গেলে বিষ খেতেও ভুলে যাব। শিশি হাতের কাছেই।

নীতিশ, আমি আসছি।

আবার তোমার ডাক শুনছি মাথার মধ্যে। ছাদের দরজা ভেঙে ঠিকরে গেল। আমার ঘরের দিকে কারা ছুটে—

"ফুল্লরা!"

জানলায় দাঁড়িয়ে নীতিশ। হাঁফাচ্ছে।

ঘরের মধ্যে কলম হাতে আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠছে ফুল্লরা। তার চোখ বিস্ফারিত। কাঁপছে। থরথর করে কাঁপছে।

"ফুল্লরা!" নীতিশ বলছে জানলার গ্রীল আঁকড়ে ধরে—"সেলুলার বিগড়েছিল—তাই তোমার কথার জবাব দিতে পারিনি। আমি বেঁচে আছি।"

ফুল্লরা লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

লাথি মেরে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল নীতিশ।

ব্যাঙ্কের পাতাল ঘর। সারি সারি লকার। ফুল্লরার একপাশে নীতিশ, আর একপাশে শেখসাহেব। পেছনে প্রতীশ।

লকারের মধ্যে সোনার গয়না, হীরে জহরৎ ঠাসা। একদম সামনে রয়েছে একটা লম্বা সাদা খাম। খামের ওপর লেখাঃ **ফুল্লরার জন্মরহস্য।**

খামটা হাতে নিল ফুল্লরা। কাঁপছে। নীতিশ বন্ধ করে দিল লকার, প্রতীশ আর শেখসাহেব দু'দিক থেকে ফুল্লরাকে ধরে এগোল বাইরের দরজার দিকে।

দেওয়ালে ঝুলছে ফুল্লরার মায়ের সেই অসাধারণ তৈলচিত্র।

ঘরের মেঝেজোড়া কার্পেট। গোল হয়ে সেখানে বসে আছে রবীন চৌধুরী, সেবাদাসী, ফুল্লরা, নীতিশ, প্রতীশ, শেখসাহেব, মণিবেগম, বিশ্বজিৎ, ডিসিডিডি (ওয়ান) এবং এক প্রবীণ, অত্যন্ত সম্ভ্রান্তদর্শন ভদ্রলোক। ইনি পরে আছেন পাঞ্জাবি আর পায়জামা, পাঞ্জাবিতে দ্যুতি বিকিরণ করছে হীরের বোতাম। মাথার কাঁচাপাকা লম্বা চুল পেছনে টেনে আঁচড়ানো, দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো। ইনি বসে আছেন ফুল্লরার মায়ের ছবির ঠিক সামনে। তাঁর একপাশে ফুল্লরা, আর একপাশে নীতিশ।

খানদানি গলায় অত্যন্ত অভিজাত চেহারার এই ভদ্রলোক বলছেন—"হ্যাঁ, ফুল্লরা আমার মেয়ে। রবীন চৌধুরী মনে করেছিলেন, ফুল্লরার মা বন্ধ্যা—দোষটা যে নিজের, তা জানতেন না। এখন অবশ্য জেনেছেন। নইলে সেবাদাসী মা হয়ে যেত অনেক আগেই।"

মাথা হেঁট করে রইল সেবাদাসী।

ভদ্রলোক বলে গেলেন—"রবীন চৌধুরী যে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ওই কোম্পানির ম্যাক্সিমাম শেয়ার হোল্ড করছি আমি—বোর্ড অফ চেয়ারম্যানও আমি। কোম্পানিটা আমারই—কিন্তু চালিয়েছি রবীনকে দিয়ে। সে আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিল।"

রবীন চৌধুরী মাথা হেঁট করলেন।

ভদ্রলোক বলে গেলেন—"আমি চিরকুমার। ফুল্লরার মা-কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমার কাছে। সে বলেছিল, আমাকে সে খুশি করতে পারলে তবেই তার স্বামী তাকে ভালবাসবে। এরপর যা ঘটবার তা ঘটেছে। আমি জানতাম, ফুল্লরার মা বন্ধ্যা। ফুল্লরা এসে সে ভুল ভেঙে দিয়েছে।"

মাথা নত করে রয়েছে ফুল্লরা।

"ফুল্লরার মাকে দেবী বললে কম বলা হবে। সে আমাকে ভালবেসে ফেলেছিল। আমাকে খুশি করেও সে রবীনের ভালবাসা পায়নি। রবীন চেয়েছিল ঐশ্বর্য। ওই জিনিসটাই ওকে আমি দেব না ঠিক করেছি।"

চকিতে মুখ তুললেন রবীন চৌধুরী।

তাঁর চোখে চোখ রেখে বললেন অভিজাত ভদ্রলোক—"আমার সব কিছু দিয়েছি ফুল্লরাকে—তোমাকে নয়, তোমার স্ত্রীকেও নয়। সে আমার মেয়ে কিনা, এই নিয়ে যদি পরে নষ্টামি করতে যাও—সে পথও মেরে রেখেছি," বলে, চাইলেন ডিসিডিডি (ওয়ান)-এর দিকে—"ফুল্লরা যে খামটা লকারে পেয়েছে, ওই খামের মধ্যে আছে পেটারনিটি টেস্ট রিপোর্ট—হায়দ্রাবাদের ফোরেনসিক সায়ান্স ল্যাবোরেটরি থেকে DNA টেস্ট করিয়ে রেখে দিয়েছি, ফুল্লরার জন্ম আমার ঔরসে।"

বলে, চাইলেন রবীন চৌধুরীর দিকে—"তুমি জানতে আমার সব কিছু ফুল্লরাকে দিয়ে যাচ্ছি। তাই বিশ্বজিতের মতন একটা পায়ের জুতোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে ফুল্লরাকে কব্জায় রাখতে চেয়েছিলে।"

এবার চাইলেন বিশ্বজিতের দিকে—"তুমি রবীন চৌধুরীর হুকুমে নীতিশকে খুন করতে গেছিলে। তোমার গুলিতে মারা গেছে মুনমুন—নিরীহ মেয়ে—নিজের বুক পেতে দিয়ে সে বাঁচিয়ে দিয়েছে নীতিশকে—ফুল্লরার ভবিষ্যৎ ভেবে।"

বলে, হাত রাখলেন ফুল্লরার কোলে—"মা, তোমার মা বিষ খায়নি। তাকে আগে খুন করা হয়েছে। করেছেন তোমার বাবা। কি করে, তা উনি বলবেন।" চাইলেন ডিসিডিডি (ওয়ান)-এর দিকে।

তিনি কেশে গলা সাফ করলেন। বললেন—"পোস্টমর্টেমে ধরা গেল। মারা গেছেন আগে, পাকস্থলিতে বিষ গেছে তার পরে। খুন করা হয়েছে পেরেক ঠুকে।"

ঘর নিস্তব্ধ।

বললেন মণিবেগম খুব শান্ত গলায়—"ব্রহ্মতালুতে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে পেরেক মেরে দিয়েছিলেন রবীন চৌধুরী। চুলের মধ্যে পেরেক ঠুকে বের করে নিয়েছিলেন প্লাস দিয়ে। ধরা গেছে অনেক কষ্টে। কসাই।"

শেষ শব্দটা থেমে থেমে বললেন রবীন চৌধুরীর দিকে চেয়ে।

**ছবি : সৌমিত্র চক্রবর্তী**

অলঙ্করণ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

পুষ্পাঞ্জলি—৩

# ডক্টর ডেথ

অদ্রীশ বর্ধন

“গজমুক্তো দেখেছেন ?”
“যত্তোসব অলীক কল্পনা,” হাসলেন রণ চৌধুরী।

“তবে যে লোকে বলে—” কবিতা নাছোড়বান্দা। গল্প শোনার নম্বর ওয়ান পোকা ও। এতদিন জানতাম, গোয়েন্দা গল্প শুনতেই ভালবাসে। এখন দেখছি শিকারের গল্প পেলেও নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়।

গল্প জমিয়েছেন বটে রণ চৌধুরী, পুরোনাম রণজিৎ কুমার রায়চৌধুরী। নিজে ছোটখাটো মানুষ— বাপমায়ের দেওয়া পেল্লায় নামটাকেও কেটেছেঁটে ছোট্ট করে নিয়েছেন।

মাথায় তিনি মোটে পাঁচফুট। খসখসে কালো মুখ। মাথার সামনের দিকের সব চুল উঠে গেছে। কানের উপর থেকে লম্বা চুল টেনে আঁচড়ে রেখেছেন পিছনের লম্বা চুলের সঙ্গে। দাড়ি কামান বটে, কিন্তু হিটলারি গোঁফের মায়া ত্যাগ করতে পারেননি।

বয়স চল্লিশ। নিজেই তা বললেন। না বললে তিরিশের বেশি মনে হয় না। টাইট ফিগার। নিরেট। পেশি বা চর্বি যেখানে যেটুকু দরকার, ঠিক ততটুকুই আছে। বিলক্ষণ চটপটে। নড়াচড়া মসৃণ। টেপা ঠোঁট, চৌকো চোয়াল আর থ্যাবড়া নাক দেখে প্রথমটা গুরুগম্ভীর মনে হয় বটে, কিন্তু ভুল ভেঙে দেন নিজেই— জমাটি আড্ডায় বসলেই।

অথচ ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ জমে উঠেছে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে। ভদ্রলোক ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনে দায়িত্বপূর্ণ পদে আছেন। বাড়িতে বেশি অ্যামপিয়রের মিটারের দরকার হয়েছিল। বিদ্যুতের চাহিদা তো বেড়েই চলেছে। চকিতে রান্নার যন্ত্র, কাপড়কাচার যন্ত্র, ডিশ ধোওয়ার যন্ত্র, টিভি, ভিসিআর, ফ্রিজ— যন্ত্রে যন্ত্রে বাড়ি ভরে উঠেছে। বিরক্ত হয়ে গজগজ করেছি নিজের মনেই— এ কী যন্ত্রণা শুরু করলে হে প্রিয়তমা !

আমার রূপসী প্রেয়সী শুধু ফিক করে হেসেছে। ওর যুক্তি তো একটাই : ছেলেপুলে থাকলেও তো যন্ত্রণা বাড়ত।

যাচ্চলে ! কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা ! পাঁচ অ্যাম্পিয়রে এত কাণ্ড কি চলে ?

শেষকালে কিনা একটা দেড়টন এয়ারকন্ডিশনার এনে বসিয়ে দিল আমার লেখবার ঘরে। এবার শুনলাম নতুন যুক্তি : মাথা ঠাণ্ডা না থাকলে লিখবে কী করে ? আর না লিখলে খাবে কী ?

শোনো কথা ! লিখে কারও পেট চলে ? নেহাত বউয়ের বোম্বাইবাসী পিতৃদেবের টাকা কিছুতেই ফুরোচ্ছে না...

যাক গে সে কথা। নতুন মিটারের জন্য দরখাস্ত করতে হয়েছিল। শুনেছিলাম, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, অনেক সময় নষ্ট করতে হয়...

কিন্তু সেসব কিচ্ছু হয়নি। একমাসের মধ্যেই ইন্সপেকশন হয়ে গেল, মিটার বসে গেল, তারপরেই এল একটা টেলিফোন—

"মৃগাঙ্ক রায় বলছেন ?"

"বলছি।"

"আপনার নামছাপা বাংলা লেটারহেড আমার সামনেই রয়েছে। ভাগ্যিস বাংলায় দরখাস্ত করেছিলেন।"

"দরখাস্ত ! আমি করেছি ?"

"সি ই এস সি-তে দরখাস্ত করেননি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—"

"মিটার তো পেয়ে গেলেন, তাই—"

"আপনি ?"

"সি ই এস সি থেকেই বলছি। আপনার লেখা অ্যাদ্দিন পড়েছি— কিন্তু হাতের লেখা কোনওদিন দেখিনি। আপনাকে দেখতেও ইচ্ছে করছে। মিটারটা না দেওয়া পর্যন্ত সাহস পাচ্ছিলাম না।"

"কী যে বলেন। চলে আসুন। আপনার নামটা কিন্তু জিজ্ঞেস করাই হয়নি।"

"রণ চৌধুরী।"

অফিস থেকে সোজা চলে এসেছিলেন রণ চৌধুরী। এক ঘণ্টাও হয়নি এখনও— আসর জমিয়ে দিয়েছেন। শিষ্টাচার বিনিময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেপে কথা বলেছিলেন, ওজন করে হেসেছিলেন। তারপর কবিতা এসে বসল আমার পাশে। সন্দেশ-টন্দেশ বাড়িয়ে দিয়ে এক্কেবারে ঘরোয়া স্টাইলে বলে বসল— "এত গোয়েন্দা গল্প পড়েন কেন ?"

মুচকি হেসে রণ চৌধুরী বলেছিলেন— "অ্যাডভেঞ্চার ভালবাসি বলে।"

"শুধু পাতায় পাতায় ?" অতিথির পেটাই কালো চেহারাটার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিরীহ গলায় বলেছিল কবিতা।

আঁচ করেছিল ঠিকই। রণ চৌধুরীর খসখসে কালো রঙ আর শক্ত চওড়া চোয়ালের কোথায় যেন একটা বুনো ব্যাপার লুকিয়েছিল। বেজায় বেপরোয়া, ভয়ানক দুর্ধর্ষ লোকদের চোয়ালের কোণ এইভাবে তেউড়ে থাকে, চোখের মধ্যে এইরকম কৃপাণ-চাহনি দেখা যায়।

কবিতার এক খোঁচাতেই তাই কাজ হয়েছিল। ভারিক্কি মুখোশটাকে টান মেরে ফেলে দিয়েছিলেন রণ চৌধুরী। এতক্ষণ টিপে হাসছিলেন, এবার দাঁত দেখিয়ে হাসলেন। চোখে দেখালেন রোশনাই— যেন মনের জানলা খুলে গেল।

বললেন— "পাতায় পাতায় বিচরণ করি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর জন্যে। ফাঁক পেলেই বেরিয়ে পড়ি অ্যাডভেঞ্চারে।"

"দেশভ্রমণ ?"

"শুধু বনে জঙ্গলে।"

এবার সিধে হয়ে বসল কবিতা। আমিও। রণ চৌধুরী প্রসন্ন চাহনি মেলে ধরে বলে গেলেন— "শিকার করি। বুনো জন্তু।"

সেই যে শুরু হল শিকারের গল্প— গড়িয়ে এল একটি ঘণ্টা— ইচ্ছে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি ভাবেই শুনে যাই ওঁর গল্প। এইমাত্র শেষ করলেন শঙ্খচূড়ের ছোবল খেয়েও বেঁচে যাওয়ার আশ্চর্য কাহিনী। পনেরো ফুট লম্বা মাপ— ফণা তুলে ধরেছিল পাঁচ ফুট উপরে— একটা হরিণের দিকে। প্রথমে উনি দেখতে পাননি— ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এসেছিলেন হরিণ বধ করবেন বলে। কিন্তু হরিণ কেন তাঁর দিকে ঘুরে তাকাচ্ছে না— কেন অন্যদিকে চেয়েই রয়েছে— দেখতে গিয়ে দেখলেন ভয়ঙ্কর সরীসৃপকে। বিশাল ফণা লক্ষ করে বন্দুক চালালেন বটে— কিন্তু তার আগেই শঙ্খচূড়ের ছোবল নেমে এল তাঁর দিকে— শিকারি বুটের শুকতলা ভেদ করে বিষদাঁত ঢুকে গেল ভিতরে—

রাখে হরি মারে কে ! বুড়ো আঙুলের ঠিক পাশ দিয়ে গেছিল বিষদাঁত। ছোবল মারার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে গেছিল বলে ফাঁপা বিষ-নল থেকে বিষ বেরিয়ে গেছিল বাইরে। ছুরি দিয়ে ফণা কেটে ফেলেছিলেন রণ চৌধুরী। স্ট্রেচারে শুয়ে হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন। ডাক্তার এসে বুট খুলেছিলেন— হতভম্ব হয়ে গেছিলেন করাল বিষদাঁতের নিষ্ফল প্রয়াস দেখে।

এই পর্যন্ত শুনেছিলাম দম বন্ধ করে। হাতে চিবুক রেখে চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিল কবিতা, শঙ্খচূড়ের কাহিনী শেষ হতেই মস্ত নিশ্বাস ফেলে বলেন — "এরপরেও শিকারের সাধ আছে ?"

রণ চৌধুরী এবার বুক পকেট থেকে চুরুটের বাক্স বের করলেন। চেককাটা ডবল বুক-পকেট শার্টের জন্যে ওঁকে এত অল্পবয়সী মনে হচ্ছিল। একটা বুক পকেটে ঠাসা ছিল চামড়ার লম্বাটে বাক্স। ভিতরে চারটে লম্বা চুরুট।

ঢাকনি খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। বললেন— "আপনার জিনিয়াস ফ্রেন্ড যখন এ জিনিস ভালবাসেন— আপনিও নিশ্চয় ?"

টেনে নিলাম একবেগদা লম্বা একটা চুরুট। গ্যাসলাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিলেন রণ চৌধুরী। ধরালেন নিজেরটাও।

ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন পরিতৃপ্ত গলায়— "ম্যাডাম, শিকার করা বড় পাজি নেশা। যেমন আপনার প্রতিভাবান ঠাকুরপো— গ্রেট ইন্দ্রনাথ রুদ্র— উনি কি ছেড়ে দিতে পারবেন অপরাধী শিকার করা ?"

"মরে গেলেও পারবে না," বললে কবিতা।

"আমিও শিকার করা ছাড়িনি— ছাড়বও না। এই তো হাতির জঙ্গল ঘুরে এলাম। গভর্নমেন্ট থেকে পাঠিয়েছিল। ইলেকট্রিক কাঁটাতারের বেড়া দিয়েও গুণ্ডা হাতি রোখা যাচ্ছে না।"

"মেরে এসেছেন ?"

"নিশ্চয়। হাতিদের রোম্যান্সও দেখেছি।"

"হাতিদের প্রেম ?"

"এবং ফুলশয্যার রাত— সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। বলছি, বলছি—"

ঠিক এই সময়ে বাচ্চা মেয়ের মতো জিজ্ঞেস করেছিল কবিতা— "গজমুক্তো দেখেছেন ?"

রণ চৌধুরী বলেছিলেন— "যত্তো সব অলীক কল্পনা।" বলে, একটু হেসেছিলেন। তারপর আমার চোখে চোখে তাকিয়ে বলে উঠলেন, —"গজমুক্তোর চেয়েও অদ্ভুত একটা ব্যাপার এবার দেখে এলাম। মৃগাঙ্কবাবু, ব্যাপারটায় রহস্য আছে। আপনার গল্পের খোরাক হতে পারে। আপনার জিনিয়াস ফ্রেন্ড তো শুনলেই নেচে উঠবেন।"

কাজের মানুষ রণ চৌধুরী তাহলে অকারণে আসেনি— রহস্য তাঁর মাথায় কামড়াচ্ছে বলেই দৌড়ে এসেছেন।

বললাম— "ব্যাপারটা কী ?"

"শঙ্খচূড়ের ছোবল খাওয়ার আগে ঝোপের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিলাম বলেছি ?"

"পিছনে ছিল আপনার গাইড।"

"লোকাল গাইড। যে ঝোপটার মধ্যে দিয়ে প্রায় বুকে হেঁটে গেছিলাম, সে জায়গাটায় সাদা উইপোকার আড্ডা— ভীষণ স্যাঁৎসেঁতে, অস্বাভাবিক নির্জন, পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছে না। জঙ্গলে বিকেল হলেই অন্ধকার ঘনায়। চারদিকে পলাশ, বড় বড় এলিফ্যান্ট ঘাস জাতীয় ঘাস আর শালগাছের স্যাপলিং। দোনলা বন্দুক বাগিয়ে ধরলাম ঝোপের বাইরে, উঁকি দিয়েই দেখলাম চিতল হরিণের বাচ্চাটাকে। এত সেন্সিটিভ জন্তু আমার উপস্থিতি টের পেয়েও পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল দেখেই ধোঁকা লেগেছিল। তারপরেই দেখলাম শঙ্খচূড়ের কুলোর মতো ফণা— ইন্ডিয়ার বিভীষিকা— তারপর কী হয়েছে, আগেই বলেছি। হাসপাতালের, এমারজেন্সিতে যখন ঘোরের মধ্যে শুয়েছিলাম— মরে আছি কি বেঁচে আছি বুঝতেই পারছি না— তখন নজর যায়নি নিজের জামাপ্যান্টের দিকে। অপারেশন থিয়েটার থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক লাগল। আমার মুখ, হান্টিং ক্যাপ, শার্ট, প্যান্ট— সব জায়গাই হড় হড় করছে। চটচটে আর

তেলতেলে গ্রিজ লেগেছে যেন। অথচ যখন ঝোপের মধ্যে ঢুকেছিলাম— ছিলাম ফিটফাট। শঙ্খচূড়ের ছোবল তো হান্টিং বুট ফুঁড়ে গেছে— গোটা গায়ের অবস্থা এরকম হল কেন ? আঙুল দিয়ে একটু গ্রিজ তুলে নাকের কাছে নিয়ে এলাম— দুর্গন্ধ।"

"বিষ ছিটিয়ে লাগেনি তো ?"

"আরে না...ভয়ানক সেই নিউরোটক্সিক পয়জন মুখের চামড়ায় লাগলে কী হত ভগবান জানেন। তাছাড়া, বিষদাঁত কি পিচকিরি যে বিষ ছেটাবে ?"

কবিতা বললে— "জায়গাটায় উইপোকার আড্ডা ছিল বলছিলেন— খুব স্যাঁৎসেঁতে— ওদের গায়ের গ্রিজ নয়তো ?"

হাসলেন রণ চৌধুরী। এতক্ষণে খেয়াল হল। ভদ্রলোককে কেন অত বুনো মনে হচ্ছিল। বুলডগের মুখের সঙ্গে ওঁর মুখের বেশ মিল আছে— হিটলারি গোঁফটা বাদে। ভীষণ জেদের প্রতীক ওই গোঁফ — সেইসঙ্গে ওই মুখ।

হেসে বললেন— "উই কখনও গ্রিজ ছড়ায় ?"

"তাহলে আপনার কী মনে হয় ?" বললে কবিতা।

"ম্যাডাম, সেটাই বুঝতে পারিনি। বছরবছর জঙ্গল দাপিয়ে বেড়াচ্ছি। অনেক পোকামাকড়ের কামড় খেয়েছি— কিন্তু সারা গা এরকম চটচটে দুর্গন্ধে ভরে যায়নি। তাই একটু সামলে নিয়েই ফের গেলাম সেই ঝোপে।"

আঁতকে উঠল কবিতা— "মরা শঙ্খচূড় দেখলেন ?"

"সে কি আর থাকে। নেকড়ে টেনে নিয়ে গেছে নির্ঘাত। এবার গেছিলাম বেলাবেলি। ঢুকেছিলাম ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে। দিনের আলোয় দেখলাম গ্রিজ। কীভাবে গায়ে লাগছে, তাও দেখলাম।"

চেয়ে রইল কবিতা। আমি চুরুটে টান মারতেও ভুলে গেলাম।

"গাছের পাতা থেকে," বললেন রণ চৌধুরী।

"গাছের পাতায় গ্রিজ !" চিবুক থেকে হাত নামিয়ে নিল কবিতা। "তাও কি হয় ! কীরকম গাছ ?"

"এলিফান্ট ঘাস জাতীয় ঘাস, শালগাছের স্যাপলিং লেপটানো ঝোপ— যাদের ধর্ম তেল বা গ্রিজ উৎপাদন করা নয়।"

"বিশেষ জাত নয় তো ?"

"না। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সব ঝোপের উপর দিকে বেশি করে চটচটে হয়ে রয়েছে। সেইসঙ্গে ভুষো-ও জমেছে। মাটিতেও তাই। বড় গাছের পাতাতেও তাই। তাহলেই বুঝছেন— গাছের পাতা এই গ্রিজ বানায়নি—"

"উড়ে এসে পড়েছে ?"

"ঠিক তাই। তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। পৃথিবীতে এরকম আশ্চর্য ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। হাজার হাজার ব্যাঙ বৃষ্টি হয়েছে, জ্যান্ত সাপ আকাশ থেকে নেমে এসেছে, সমুদ্রের শামুক ডাঙায় এসেছে মেঘলোক থেকে। পৃথিবীটা বড় আশ্চর্যের জায়গা, ম্যাডাম— গ্রিজ নিয়ে তাই আর মাথা ঘামাইনি। তবে খটকা লাগল ওইরকম এক নিরিবিলি জায়গায় আমার পিছনে লোক লাগায়।"

চুরুট নিভে গেছিল। ধরিয়ে নিলেন রণ চৌধুরী। আমরা দুজনে একদৃষ্টে চেয়ে আছি ওঁর দিকে। এখন উনি আর হাসছেন না। বললেন— "দিনের আলো যখন ফুরিয়ে আসছে, তখন ফিরে চললাম জিপের দিকে। প্রায় তিন কিলোমিটার জঙ্গল ভেঙে গেলে তবে রাস্তা পাব। রাইফেল বাগিয়েই চলেছি। চারদিকের গভীর জঙ্গলে চোখ ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। এমন সময়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনলাম।

"প্রথমে ভেবেছিলাম বনের জন্তু। আওয়াজটা এসেছিল আমি যেদিকে যাচ্ছি— সেইদিক থেকে। বনে জঙ্গলে ঘুরে কান আর হাত এমন তৈরি হয়ে গেছে যে, শব্দ লক্ষ করে বন্দুক চালিয়ে দিতে পারি। সেফটি ক্যাচ অন করতেই খড়মড় আওয়াজটা খুব জোরে মিলিয়ে গেল সামনের দিকে।

"স্পষ্ট মনে হল, কে যেন ছুটে পালিয়ে গেল। বনের জন্তু তাহলে আমার দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছিল ? সেফটি ক্যাচ অন করতে দেখেই ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে গেল ? এত বুদ্ধি থাকে বনের জন্তুর ? পালাবার হলে আগেই পালাত,চোখে চোখে রেখে আড়ালে আড়ালে যাবে কেন ?

"ম্যাডাম, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জিনিসটা আমার মতো জংলিদের মধ্যে বেশি করে থাকে। আবার মনে হল— যে পালালে, সে জানোয়ার নয়— মানুষ। তাই আমি ছুটলাম শব্দ লক্ষ করে। সামনের আওয়াজ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু সে ছুটছে ঠিক হরিণের মতো— দেখতে দেখতে আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে।"

কবিতা বললে— "তাহলে হরিণই দেখছিল আপনাকে— সেই চিতল হরিণের বাচ্চাটা— যাকে মারতে গিয়ে শঙ্খচূড়ের ছোবল খেয়েছিলেন।"

বুলডগ মুখে সাদা দাঁত দেখিয়ে এতক্ষণে এক চিলতে হাসি হাসলেন রণ চৌধুরী।

বললেন— "তাহলে গাড়িটা চালাল কে ?"

"গাড়ি ! কার গাড়ি ? আপনার ?"

"না। ইঞ্জিনের আওয়াজ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এক কিলোমিটার দূরেও কানে পৌঁছেছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম— আমারই জিপ নিয়ে বুঝি লম্বা দিল কেউ। তারপরেই বুঝলাম— জিপের আওয়াজ নয়— অন্য গাড়ির। পাঁই পাঁই করে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম জঙ্গল থেকে। দূরে দাঁড়িয়ে আছে আমার জিপ। কাঁচা রাস্তায় তখনও ধুলো উড়ছে— একটু আগেই যেন একটা গাড়ি চলে গেছে সদর শহরের দিকে।

"ভাগ্যিস জিপ নিয়ে পালায়নি। সদর শহর থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। জিপটাও আমার নয়— ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসের।

"ফিরে গিয়ে তাই জিপ আগে ফেরত দিলাম। ডি. এফ. ও. কে জিজ্ঞেস করলাম ঠাট্টার সুরে— 'কাকে পাঠিয়েছিলেন আমার পিছনেই ?'

"ভদ্রলোক হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন— 'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

"সব বললাম। উনি বললেন—'এই ব্যাপার ! পোচার-টোচার হবে। আপনার জন্য তার আর শিকার করা হল না। জঙ্গলের পাস তো আজ কাউকে দিইনি।'

"ব্যাপারটা ওইখানেই মিটে গেলে ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু রাতে ফরেস্ট বাংলোয় শুয়ে কিছুতেই ঘুমতে পারলাম না। মাথার মধ্যে ঘুরপাক দিচ্ছিল পুরো ব্যাপারটা। লোকটা আমাকে ফলো করেই এসেছিল। আমার জিপের সামনেই তার গাড়ি রেখেছিল— তেল পড়ে থাকতে দেখেছি কাঁচা রাস্তায়। কেন ? পোচার-ই যদি হবে— গাড়ি লুকিয়ে রাখবে তো অন্য জায়গায়। আমার গাড়ির সামনে রাখতে যাবে কেন ? ছুটে পালিয়ে গেল কেন ? আমাকে নজরে রাখাটাই তাহলে আসল উদ্দেশ্য। আমি কী করতে গেছি জঙ্গলে— সেটাই দেখতে গেছিল।

"সেই যে মাথার পোকা নড়ে উঠল বাকি রাতটা প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিলাম। ভোর রাতের দিকে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে ছুটলাম ডি. এফ. ও.র অফিসে।

"বললাম— 'জিপটা আবার ধার দিন।'

"উনি বললেন— 'আবার কী হল ?'

"আমি বললাম— 'গ্রিজ লাগানো পাতা আনতে যাব।'

"উনি আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। জঙ্গলের পাতায় গ্রিজ লেগে থাকার ব্যাপারটা ওঁকে আগেই বলেছিলাম।

"বললেন—'আপনার মাথা কি খারাপ হয়েছে ? যাকগে যান— ড্রাইভার নিয়ে যান। গাইড সঙ্গে থাকুক।'

"আমি বললাম,'কাউকে দরকার নেই। একাই যাব।'

"ডি. এফ. ও বললেন— 'মিঃ চৌধুরী, পোচাররা বড় ডেঞ্জারাস হয়।'

'হোক।'

"চলে গেলাম একাই। কান খাড়া করে রইলাম। পিছনে গাড়ি এলে যাতে ধরতে পারি, তাই জঙ্গলের ভিতরে একটু ঢুকেই গুঁড়ির আড়ালে ঘাপটি মেরে রইলাম।

"কোনও গাড়িকেই আসতে দেখলাম না। নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলাম তিন কিলোমিটার পথ মাড়িয়ে শঙ্খচূড়ের খতম-স্থলে। চারদিকে বড় বড় ঘাস। কেউ লুকিয়ে থাকলে তার

মাথা দেখা যায় না।
"এমন সময়ে শুনলাম খুব অস্পষ্ট একটা শব্দ।
"হাতি ইনফ্রাসোনিক সাউন্ড শুনতে পায়— জানেন নিশ্চয়। দশ বিশ মাইল দূরের দলবলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। অতবড় কান বলেই বোধহয় পারে। আমি কিন্তু এই ছোট কান দিয়েই জঙ্গলের পাতার শব্দের নানারকম মানে বের করতে পারি। সেই মুহূর্তে যে শব্দটা শুনলাম, তা সন্দেহজনক। তাই টুপ করে শুয়ে পড়লাম মাটির উপর।
"সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল বন্দুক। শন শন করে গুলি চলে গেল মাথার উপরকার ঘাসের মধ্যে দিয়ে। আর একটু দেরি হলেই খুন হয়ে যেতাম।
"শুয়ে শুয়ে শুটিং পজিশন নিলাম— গুলি চালালাম শব্দ লক্ষ করে। একবার নয়— বারবার। ছুটে যে পালিয়ে গেল— তার গায়ে লাগাতে পারলাম না।
"ছুটেছিলাম আমিও। কিন্তু নাগাল ধরতে পারলাম না। জঙ্গল থেকে বেরনোর আগে এবারও শুনলাম গাড়ির আওয়াজ। ফুলস্পিডে চলে গেল শহরের দিকে।
"বুঝলাম। আমার আগেই সে এসেছিল। লুকিয়ে রেখেছিল গাড়ি। আগেভাগেই এসে ওৎ পেতেছিল শঙ্খচূড়ের জায়গায়।
"কিন্তু সে জানল কী করে যে, আমি জঙ্গলে যাচ্ছি ?..."
"ডি. এফ. ও বলেছেন ?" আস্তে বললাম আমি।
চুরুট নামিয়ে চেয়ে রইলেন রণ চৌধুরী।
"গ্রেট ইন্দ্রনাথ রুদ্রর সঙ্গে কনসাল্ট করা যাবে কি ?"
প্রস্তাবটা আমার মাথার মধ্যেও ঘুরপাক খাচ্ছিল কিছুক্ষণ ধরে। কবিতাও নিশ্চয় ভাবছিল একই লাইনে। রণ চৌধুরী আলগোছে দীর্ঘ কাহিনীর শেষে শেষ মোচড়টি মারতেই আমি হাত বাড়িয়েছিলাম যন্ত্রণার যন্ত্রটার দিকে। রিসিভার আমার হাত থেকে কেড়ে নিল কবিতা। বললে— "তোমার কম্মো নয় ওই হদ্দকুঁড়েকে ডেকে আনা। দ্যাখো গিয়ে এখন হয়তো ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুলে বই পড়ছে।"
এই বলে ফটাফট বোতাম টিপে লাইন জুড়ে নিল ইন্দ্রনাথের বেলেঘাটার বাড়িতে। বললে শক্ত গলায়— "মহারাজের এখন কী করা হচ্ছে ? বই পড়া হচ্ছে ? ...এদিকে যে এক কাঁড়ি রেঁধে বসে রইলাম, গিলবে কে ? ...কী রেঁধেছি ? আর্মানি খিচুড়ি আর পমফ্রেট মাছ ভাজা ? ফ্রিজে রেখে দাও... এখানে রয়েছে ইংলিশ আর চাইনিজ রান্না, ইটালিয়ান আর জার্মান রান্না, ডাচ আর পার্শি রান্না, বর্মি আর সিন্ধি রান্না... হ্যাঁ, হ্যাঁ হজমের ওষুধ আছে... সাংঘাতিক রহস্য-বটিকা... বুঝেছ ? তাহলে আর ল্যাজ নেড়ো না... একা আসবে... গার্ল ফ্রেন্ড-টার্ল ফ্রেন্ড থাকলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দাও... কেউ নেই ? গুল মারবার জায়গা পাওনি ? ক্যারেকটারলেস ব্যাচেলর কোথাকার।"
রিসিভার নামিয়ে রাখল কবিতা। এখন আর মুখ শক্ত নয়। মজা নাচছে দুই চোখে। রণ চৌধুরী বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছেন দেখে ঠোঁট কামড়ে হাসি গোপন করতে করতে বললে— "ঠাকুরপোর সঙ্গে একটু ফষ্টিনষ্টি না করলে আবার পেটের ভাত হজম হয় না। ওর মনটা বড় সুন্দর— সুন্দর চেহারার মতোই।"
ঢোক গিলে বললেন রণ চৌধুরী। — "কিন্তু ম্যাডাম, আমিও যে ব্যাচেলর ?"
এইবার আমার ছাদ কাঁপানো অট্টহাসিটা না হেসে আর পারলাম না। বিরাগপূর্ণ চোখে চেয়ে কবিতা বললে— "মরণ।"

কিমা আলু আর টিকিয়া কাবাবের দিকে তাকিয়ে বিরসবদনে বললে ইন্দ্রনাথ— "শুধু এই ?"
কবিতা বললে— "এটা দিয়ে স্টার্ট করো পেটুক দামোদর, তারপর হবে খানা আর পিনা।"
চোখ সরু করে ইন্দ্রনাথ বললে— "পিনা ! রিয়্যালি ?"
"ছোট্ট একটু ব্র্যান্ডি। —মিঃ চৌধুরী, আপত্তি নেই তো ?"
"কী যে বলেন ম্যাডাম—জংলি মানুষ, হাড়িয়া পর্যন্ত চালাই।"
"এখানে পাবেন স্রেফ টিসি— কর্তার ইচ্ছায় কর্ম," বলে আমার দিকে ঝলক দৃষ্টি হেনে টি সি ব্র্যান্ডি আনতে উঠে গেল কবিতা।
অমনি বললে ইন্দ্রনাথ— "আপনার প্রব্লেমটা এবার বলুন।"
রণ চৌধুরী বললেন। যখন শেষ করলেন, তখন টিকিয়া শেষ, টি সি আসছে।
ইন্দ্র বললে— "গাছের পাতা এনেছেন ?"
নিরুত্তরে ব্রিফকেস খুললেন রণ চৌধুরী। বেরলো আর একটা চামড়ার সিগার কেস। ঢাকনি খুলে বাড়িয়ে ধরলেন ইন্দ্রনাথের সামনে।
ভিতরে ঠাসা রয়েছে পাতা আর ঘাস। শুকিয়ে এলেও গায়ে যেন কালচে কাদা লেগে রয়েছে।
নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকে ইন্দ্র বললে— "বল হরি হরিবোল। —মিঃ চৌধুরী, গাছের পাতার গন্ধ আর গ্রিজ, চোরাগোপ্তা বুলেট আর পোচারের রহস্যভেদ করার জন্য পুলিশ ডিটেকটিভের স্মরণ নিলেন না কেন ?"
"ইন্দ্রবাবু,গত দু'বছরে কলকাতায় কোনও বিস্ফোরক দ্রব্য পরীক্ষা করা যায়নি কেন ? কেন আজও জাল ক্যাসেট পরীক্ষা করার গবেষণাগার বসেনি। পুলিশ ডিটেকটিভদের দরকার আরও পেশাগত প্রশিক্ষণ, দরকার ফোরেনসিক সায়েন্সের জ্ঞান—"
"পুলিশে ছুঁলে আঠারো দু'গুণে ছত্রিশ ঘা হয় মশায়। অত প্লেন স্পিকিং আর করবেন না। গাছের পাতা কেন এনেছেন, তা বোঝা গেল। থাক আমার কাছে। এখন জানতে চান কোন রাস্কেল খতম করতে চেয়েছিল আপনাকে ?"
"এবং কেন ?"
"তাহলে তো যেতে হয় অকুস্থলে।"
টিসি নিয়ে ঘরে ঢুকল কবিতা— "আমিও যাব। হাতির রোম্যান্স দেখব।"

জায়গাটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে— বিহার বর্ডারের গা ঘেঁষে। মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। শেষ নেই, শেষ নেই। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। গঙ্গার পাড়ের মানুষ আমি,এত পাহাড় একসঙ্গে দেখলে মন মোহিত তো হবেই।
আমরা উঠেছি রেঞ্জ অফিসারের গেস্ট হাউসে— টানা লম্বা একটা পর্বতশ্রেণীর ঠিক নীচে। উটের কুঁজের মতো সারি সারি পাহাড় চলে গেছে বিহারের মধ্যে— সাঁওতাল পরগণা ছেয়ে রয়েছে পুরো পাহাড়ি অঞ্চলে।
ব্রিটিশদের তৈরি এই গেস্ট হাউসের ঘরগুলোর সিলিং উঁচু, লম্বায় চওড়ায় বেশ বড়। পরপর তিনখানা ঘর, সামনে চওড়া বারান্দা— এত চওড়া যে কলকাতায় তাকে রাজপথ বলা হয়। বারান্দার সামনে বিরাট বাগান। ওই বাগানের পর পাঁচ কিলোমিটার জঙ্গল ঠেঙিয়ে গেলে বিহারের বর্ডার।
রেঞ্জ অফিসার প্রকাশ ঘটক সস্ত্রীক থাকেন পাশের কোয়ার্টারে। ফুটফুটে মেয়েটির বয়স মোটে তিন। সে এখন কবিতার ন্যাওটা হয়ে গেছে।
বেচারা ! পাণ্ডববর্জিত এই অঞ্চলে কেউ তো আসে না। সঙ্গী পায় না। সদর শহর এখান থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে।
ইন্দ্রনাথ সেখানে থাকতে চায়নি। গোঁয়ার গোবিন্দ রণ চৌধুরীও চান না। অতদূর থেকে জিপ নিয়ে যাতায়াতে বিলক্ষণ অসুবিধে।
তবে একটা দিন ওখানেই ছিলাম। বাজারে ভাল মাছ এলে গন্ধে গন্ধে যেমন খদ্দের চলে আসে, ইন্দ্রনাথ আসছে খবর পেয়েই শহরের গণ্যমান্য কিছু মানুষ আমাদের আটকে দিয়েছিলেন। আড্ডাটা বসেছিল ডি. এফ. ও প্রদীপ কাঞ্জিলালের কোয়ার্টারেই। তাঁকে দেখলে কাজিরঙ্গার এক-শিংওলা গণ্ডারের কথা মনে পড়ে যায়। এ রকম ঢিবি কপাল আর বিরাট নিরেট বপু চট করে চোখে পড়ে না। ভগবান শুধু একটা প্রাণীকেই হাসতে শিখিয়েছেন— সে প্রাণীটার নাম, মানুষ। শেখাননি শুধু প্রদীপ কাঞ্জিলালকে।
অথচ তাঁর আপ্যায়নে ত্রুটি নেই। যাকে বলে জামাই-আদর— ওই একটা দিন আর একটা রাতে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যায় বসিয়েছেন আড্ডা। সেখানে এসেছিলেন

শহরের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার— অচেতন বরাট আর মনোহর আচার্য। এঁরা নাকি কেউ কাউকে দেখতে পারেন না, দুজনেই একই সঙ্গে রুগিও দেখেন আবার জঙ্গল থেকে হার্বস এনে তা থেকে ওষুধ বানিয়ে বিক্রিও করেন।
দু'জনের দু'রকম চেহারা। অচেতন বরাট মোটেই বিরাট পুরুষ নন— বরং খ্যাংরাকাঠির মাসতুতো ভাই বলা যায় তাঁকে। যেমন লম্বা, তেমনই রোগা। তবে খুব ফর্সা। চোখে মুখে একটা বনেদিয়ানার ছাপ আছে। বয়স চল্লিশের কোঠায় বলেই মনে হয়েছিল প্রথমে— তারপর, শুনলাম, তাঁর মুখেই শুনলাম, পঞ্চাশ ছুঁয়েছেন এই সেদিন। চোখে সোনালি চশমা। নাকটা একটু ভোঁতা। চোখ সামান্য কুটিল। দেখলে খুব সরল লোক বলে মনে হয় না। কথা বলেন মুরগির লড়াইয়ে মুরগির মতো বুক চিতিয়ে।
বিশেষ করে এটা দেখা যায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে কথা বলার সময়ে। মনোহর আচার্য লোকটা দারুণ বেঁটে, তবে গাঁট্টাগোট্টা, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ এবং তাঁকে গুলবাঘের ভায়রাভাই বলা যায়। কিন্তু অতিশয় অমায়িক, কথায় ঝরছে মধু, চোখে বর্ষণ করছে অভয়। তাঁর এই অভয় চাহনি দেখেই নাকি পনেরো আনা রুগির রোগ সেরে যায়। বয়সে অচেতন বরাটের চেয়ে দশ বছরের ছোট, এই শহরের বনেদি ডাক্তারও তিনি নন— এসেছেন বছর দশেক আগে— কিন্তু পসার জমিয়েছেন বেশি।
অচেতন বরাট তো বলেই ফেললেন আমাদের সামনে— "এই যে উড়ে এসে জুড়ে বসা খই! আছেন কেমন?"
মনোহর আচার্য তাঁর আবলুসকান্তি উজ্জ্বলতর করে মধুর হেসে বললেন— "আপনার দয়ায় দু' পয়সা করে তো খাচ্ছি। রুগিদের আপনি ছেড়ে না দিলে আমার চেম্বার ফাঁকা যেত।"
কটমট করে চেয়ে রইলেন অচেতন বরাট। স্পষ্ট বুঝলাম, জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন কিন্তু মনোহর আচার্যেরই বোন— সন্ধ্যা।
সন্ধ্যা একটা রিয়াল বিউটি।
তিলোত্তমা-ফিলোত্তমার বর্ণনা গল্পে পড়েছি। বিউটি কনটেস্টে নামলে সবাইকে টেক্কা মেরে যেতে পারে এই মেয়েটা। মনোহরের বিপরীত আকৃতি তার। ভাইয়ের চেয়ে ফর্সা, ভাইয়ের চেয়ে লম্বা। চোখ যখন ঠাণ্ডা— তখন পূর্ণিমা চলছে; আর যখন গরম— তখন যেন সাহারার সূর্য। গায়ে স্রেফ একটা সাদা টি-শার্ট আর ব্লু জিনস— আর কিচ্ছু নেই।
এই সন্ধ্যাই এগিয়ে এসে মুরগি লড়াই থেকে বঞ্চিত করেছিল আমাদের। ধমকে উঠল অচেতন বরাটকেই— "কেন পিছনে লাগতে আসেন?"
ধমক খেয়ে যেন নেতিয়ে পড়লেন অচেতন বরাট।
পুলিশকর্তাও এসেছিলেন আসরে। নতুন আই. পি. এস। সদাহামবড়া ভাব। ফিটফাট ফুলবাবু। ইনি আবার অষ্টপ্রহর পাইপ কামড়ান আর চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন। সন্ধ্যার প্রতি ছুঁক ছুঁক মনোভাব দেখেই বুঝে নিলাম তাঁর ওভারস্মার্ট হওয়ার কারণ। এঁর নাম সঞ্জয় ভঞ্জ। পড়াশুনো যে বিলক্ষণ, তা কথায় কথায় জানাতে চান। হাক্সলি বলেছিলেন, প্রাচীন সভ্যতার মানুষগুলো ছিলেন Wise fool, আর আধুনিক যুগের মানুষগুলো Intelligent fool, সঞ্জয় ভঞ্জকে দেখে আমার তাই মনে হয়েছে।
আসরে সবচেয়ে নিপাট নিরীহ মানুষ বলতে হাজির ছিলেন ওসমান সাহেব। সাতপুরুষের ব্যবসাদার। পূর্বপুরুষরা ঘোড়ায় করে জঙ্গল আর পাহাড় থেকে লাক্ষা এনে বেচতেন শহরে। এখান থেকে চাল,ডাল,তেল,নুন নিয়ে গিয়ে বেচতেন জঙ্গল আর পাহাড়ে। এখন তা নেই— কিন্তু বড় বড় দোকানের মালিক হয়ে বসে আছেন ওসমান সাহেব। দুনিয়ার সব জিনিসই পাওয়া যায় শহরময় ছড়ানো তাঁরই দোকানে। থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের রোগে ভুগছেন বলেই জলহস্তীর আকার ধারণ করেছেন, চলতে-ফিরতে হাঁপান, কথা বলতেও কষ্ট হয়। আয়ু যে সীমিত, তা বুঝতে পারা যায় তাঁর স্তিমিত চক্ষুপ্রভা দেখে। ঘণ্টা বেজেছে, উনি তা শুনেছেন।
এঁর মুখেই শুনলাম এই শহরের একটা অস্বস্তিকর ঘটনা-পরম্পরার কাহিনী। ঘোড়া দেখলেই যেমন ঘোড়ায় চড়ার শখ হয়, সিনেমার লোককে দেখলেই যেমন সিনেমার কথা জানতে ইচ্ছে যায়, ঠিক তেমনই একটা জীবন্ত গোয়েন্দা (গল্পের গোয়েন্দা নয়) দেখলেই খুব সামান্য সামান্য ব্যাপারগুলোকেই অসামান্য রহস্যময় মনে হয়। আর সবিস্তারে তা গোয়েন্দার কানে তুলতে সাধ জাগে। এই সাধ জেগেছিল সবারই প্রাণে। আসরের আয়োজনটাই হয়েছে সেই কারণে। ছিপিটা খুলে দিলেন ওসমান সাহেব।
বছর কয়েক ধরে কেউ না কেউ আত্মহত্যা করছে এই শহরে। তারা যে সকলেই শহরের বাসিন্দা, তা নয়, শহরের বাইরে থেকে লোক আসছে আত্মহত্যা করে শহরের রাস্তায় পড়ে থাকার জন্যে। লোকে আত্মহত্যা করার জন্যে সাধারণত বিছানাকে বেছে নেয়— ঠাণ্ডা মাথায় যারা আত্মহত্যা করতে চায়, তাদের কথা আমি বলছি— কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে কেন মরছে পটাপট করে এবং পকেটে রেখে দিচ্ছে আত্মহত্যার চিঠি— এইটাই ভাবিয়ে তুলেছে শহরের লোকদের।
ব্যাপারটা নিয়ে লম্বা লেকচার দিয়ে গেলেন দুর্যোধন মাহাতো। এই অঞ্চলের পয়লা সারির রাজনৈতিক নেতা। জন্মসূত্রে সাঁওতাল— কিন্তু নিরক্ষর অথবা নিষ্প্রভ নন মোটেই। সাঁওতালি ওষুধ নিয়ে ইংরেজিতে একটা মোটা বই লিখে সাড়া ফেলেছেন— দুই ডাক্তারই দেখলাম তাঁকে খুব খোসামোদ করে চলেছেন— মূলে যে তাঁর ওষধি বিদ্যার ভাঁড়ার, তা বুঝলাম।
সন্ধ্যার সঙ্গে খুব জমিয়েছিল কবিতা। আমি মানুষকে বুঝি উপর উপর— আমার বউটি মানুষকে বোঝে তলায় তলায়। তাই আসর ভেঙে যাওয়ার পর মুখ মুচকে বলেছিল ইন্দ্রনাথকে — "ক্যারেকটারলেস ব্যাচেলর, মেয়েটা সম্পর্কে সাবধান। নামটাই খারাপ। সন্ধ্যা! ব্রহ্মার মন থেকে যার আবির্ভাব— অথচ ব্রহ্মাই যাকে দেখে কামমোহিত হয়েছিলেন। চৌষট্টি কলার জন্ম দিয়েছে এই সন্ধ্যা— ছলাকলার অভাব নেই ভাঁড়ারে। সাধু ইন্দ্রনাথ রুদ্র, তুমি সাবধান!"
মুখ শুকনো রণ চৌধুরী বলেছিলেন—"আমিও সাবধান হলাম।"
আমি বললাম— "সন্ধ্যার মধ্যে দোষের কী দেখলে?"
খরখরে চোখে তাকাল কবিতা— "যে মেয়ে হিট-সেন্সিটিভ টি-শার্ট পরে, বুকে প্রজাপতির লেবেল লাগায় শরীরের গরম দিয়ে প্রজাপতির রঙ পালটানোর জন্যে, তাকে কি পুজো করব?"
"সন্ধ্যাকেই তো সন্ধের সময়ে পুজো করে মেয়েরা।"
নাক সিটকিয়ে উঠে গেছিল কবিতা।

রেঞ্জ অফিসারের বউ চিত্রা এই কথাটারই জের টেনে নিয়ে বললে পরের দিন রাতের আসরে— "যাই বলুন আর তাই বলুন, এতগুলো ব্যাচেলর এক জায়গায় কখনও দেখিনি— একা সন্ধ্যা কত সামলাবে!"
ফ্যাশন ম্যাগাজিনে যেসব মেয়েদের ছবি দেখা যায়, তাদের তুলনায় চিত্রা মেয়েটাকে গাঁইয়া বলা চলে। নইলে এত মোটা সিঁদুর টানে? আধুলি সাইজের টিপ পরে? তবে কথা বলে চোখা চোখা— বঁটির দিকে না তাকিয়েই ঘচাঘচ করে আনাজ কাটতে কাটতে বলে গেল কথাগুলো। মনের আনন্দে রান্নাঘর ছেড়ে বঁটি নিয়ে চলে এসেছে আড্ডার ঘরে— বসেছে মেঝেতে।
কবিতা ফোড়ন দিল তক্ষুনি— "দেখলে তো? পুলিশ সাহেব, এক ডাক্তার, শিকারি আর এই গোয়েন্দা— চার-চারটে ব্যাচেলর। আসকারা তো পাবেই সন্ধ্যা। বেহায়া কোথাকার! নাগর খুঁজছে, প্রজাপতি লেবেল লাগিয়ে।"
ইন্দ্রনাথ উদাসচোখে কড়িকাঠের মস্ত টিকটিকি দেখতে লাগল।
রণ চৌধুরী কোলের উপর রাখা ম্যানলিকার কোম্পানির রাইফেলটায় আরও বেশি মনোনিবেশ করলে। আমি মুখ খুলতে যাচ্ছি, এমন সময় রেঞ্জ অফিসার প্রকাশ ঘটক বলে উঠলেন— "বৌদির সিক্সথসেন্স ঠিকই

ধরেছে। সন্ধ্যা মেয়েটা সুবিধের নয়।"
বঁটিতে হাত থেমে গেল চিত্রার— "তুমি কী করে জানলে ?"
"একইসঙ্গে পড়েছি যে কলেজে।"
"অ্যাঁ !"
"আঙুল কেটে ঝুলবে এবারে— মাছ ভাজাও জুটবে না শেষকালে।"
বঁটি নিয়ে উঠে দাঁড়াল চিত্রা। বললে কবিতাকে— "চলুন দিদি, আমরা রান্নাঘরে বসি।" চৌকাঠ পেরনোর সময়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে গেল স্বামী দেবতাকে— "খেদিয়ে দিয়েছিল বলেই তো আমাকে পাকড়েছ।"
টিকটিকিটা এই সময়ে 'ঠিক, ঠিক' বলে পালিয়ে যেতেই চোখ নামিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ— "সত্যি ?"
"কোনটা সত্যি ?" প্রকাশ ঘটক হাসিমুখে বললেন— "আমার পত্নীর কুসন্দেহ, না, সন্ধ্যার কুকথা ?"
উগ্র জার্মান গোঁফ নাচিয়ে টিপ্পনী কাটলেন রণ চৌধুরী— "খনার বচন আর টিকটিকির ভাষণ নাকি সত্যি হয় ?"
প্রকাশের বয়স তিরিশের কোঠায়। মুখচোখ দেখেই বোঝা যায় ভাল ছেলে।
পরিচয় জমে ওঠার প্রারম্ভেই জানিয়েছিলেন, বিদ্যার পরিমণ্ডলই তাঁর কাছে অধিকপ্রিয়—জঙ্গলের চেয়ে। পেটের দায়ে চলে এসেছেন এই কাজে— মন সায় দেয়নি। মূল্যবোধের বালাই কেউ রাখছে না এ যুগে— প্রকাশ সেই মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে রাখতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে শেষ হয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে এই সরকারি চাকরিতে।
সংক্ষেপে, ছেলেটি সৎ, সজ্জন, শ্রমনিষ্ঠ।
হেসেই বললেন— "আমি যখন বম্বের এলফিনস্টোন কলেজে বি-এসসি পড়ছি, এই সন্ধ্যা ছিল আমার সহপাঠিনী। শুধু একটা ঘটনা বলছি— ওর চরিত্র কীরকম আঁচ করতে পারবে— এর বেশি বলতে পারব না। করিডরে একদিন গলা ফাটিয়ে হাহুতাশ করতে শুনলাম। প্রফেসর আর স্টুডেন্টরা গিজগিজ করছে— তাদের মধ্যেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে সন্ধ্যা— হায় ভগবান ! কী হবে এখন ? জন্মনিরোধক বড়ি খেতে যে ভুলে গেছিলাম !"
রণ চৌধুরীর উগ্র জার্মান গোঁফ খাড়া হয়ে গেল।
প্রকাশ বললেন— "এই হল সন্ধ্যা। তারপর ছিটকে গেছিলাম। এখানে চাকরিতে এসে ফের দেখলাম। ও যে ডাক্তারের বোন, তা জানতাম না। শহরে গিয়ে ডি. এফ. ও-র ঘরে দূর থেকে দেখেই চিনেছি— আমাকে দেখেনি— দেখলেই ছুটে আসবে— দাম্পত্য-দাঙ্গা লাগাবে। ও সব পারে।"
নির্নিমেষ চেয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ। ওর মনে যে একটা বিশেষ চিন্তা খেলছে, তা চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। এমন সময়ে নিশীথ নৈঃশব্দ্য ভেঙে গেল। বাংলোর বাইরে গাড়ির আওয়াজ শুনলাম।
প্রকাশ উঠে গেল— "এত রাতে আবার কে ?" ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। পিছন পিছন ঘরে ঢুকলেন দুর্যোধন মাহাতো— পলিটিকাল লিডার।
হাত জোড় করে সবাইকে নমস্তে জানিয়ে বসে পড়লেন নেতামশাই।
প্রবীণ মোটেই নন। যৌবন যেতে গিয়েও যেন আটকে গেছে— করিৎকর্মা মুখচ্ছবিতে বন্দি হয়ে আছে। ঘাগু লিডার। অতিশয় অমায়িক। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বময়। যেন বাঘ আর গরুকে একঘাটে জল খাওয়াতে পারেন।
আলগোছে কথা বলছিলাম এতক্ষণ আয়েশ করে বসে। লিডারের আবির্ভাবে শিরদাঁড়া শক্ত করতে হল। পলিটিক্সে 'টাইম ইজ মানি'।
সত্যিই হাতঘড়ি দেখলেন দুর্যোধন মাহাতো। বললেন— "রাত হয়েছে। মাছভাজার গন্ধ পাচ্ছি। বেশি সময় নেব না।"
প্রকাশ বললেন— "খেয়ে যাবেন— আজ আপনাকে ছাড়ছি না।"
দুর্যোধন বললেন— "আমি তো আছি, দেখাও হবে। কিন্তু এঁদের কর্তব্য শুরু হওয়ার আগে আমার কর্তব্যটা সেরে যাই।"
ইন্দ্রনাথ বললে— "আমাদের কর্তব্য জঙ্গল ভ্রমণ আর হাতির ফুলশয্যা দেখা।"
কষ্টিপাথর মুখে সাদা ঝিনুক-দাঁত ঝলসিয়ে হাসলেন দুর্যোধন— "সেইসঙ্গে রহস্যভেদ।" রণ চৌধুরীর দিকে আঙুল তুলে— "এঁর রহস্য। গাছের পাতায় কেন গ্রিজ !"
"আর কেনই বা খুন করার চেষ্টা হয় তাঁকে জঙ্গলের মধ্যে," বললেন ইন্দ্রনাথ।
"ওঁর সঙ্গে তখন যদি আমার আলাপ হত— রহস্যভেদ করে দিতাম তক্ষুনি। উনি যখন শঙ্খচূড় মারছেন, তার দিন সাতেক আগেই গেছে বুদ্ধপূর্ণিমা। এই তল্লাটের সমস্ত আদিবাসীরা তিনদিন ধরে উৎসব করে ওই সময়ে। চারদিক থেকে দলে দলে আসে শিকার করতে। শুয়োর, হরিণ, খরগোশ, শজারু— কিছুই বাদ দেয় না। শিকারের নিষেধ তখন থাকে না। পাহাড়ের উপর তিনদিন, তিনরাত ধরে জ্বলে আগুন— ঝলসানো হয় মাংস— জালাভর্তি হাড়িয়া থাকে সঙ্গে।
"মিঃ চৌধুরী, বাতাসে সেই মাংস পোড়ার কিছু ভুষো আর চর্বি আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে— গাছের পাতায় লেগে থাকে। এটা বৃষ্টির সময় নয়। তাই আপনার গায়ে আর জামায় লেগে গেছিল। এর মধ্যে রহস্য কোথায় ? আমি তখন পঞ্চায়েতি মিটিং করতে বেরিয়েছিলাম— ফিরে এসে সব শুনলাম— তখন আপনি চলে গেছেন।
"এখন যখন এসেছেন ইন্দ্রনাথ রুদ্রকে নিয়ে— তখন নিশ্চয় ওই ব্যাপারটাই আপনাদের মাথায় ঘুরছে— তাই আপনাদের অযথা সময়ের অপব্যয় বন্ধ করতে এলাম।"
রণ চৌধুরীর হিংস্র গোঁফ নেচে উঠল— "তাহলে আমাকে টিপ করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল কেন ?"
"পোচার-টোচার কেউ হবে। ওরা বড় নিষ্ঠুর। যাকে তাকে মেরে দেয়— প্রমাণ রাখতে চায় না। আপনাকে দেখে নিশ্চয় ভয় পেয়েছিল।"
"ভয় পেলে আমার গাড়ির পাশে তার গাড়ি রাখতে যাবে কেন ?"
"স্রেফ কৌতূহল হতে পারে। তার এলাকায় হঠাৎ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জিপ দেখে ভয় পেয়েছিল মনে হয়।"
"দুর্যোধনবাবু, রাজনীতি করার সুবাদে সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ থাকে ?"
"তা থাকে।"
"এই পোচার কে হতে পারে, আপনি জানেন না ?"
আস্তে মাথা দুলিয়ে দুর্যোধন বললেন— "সেইটাই জানবার চেষ্টা করছি— আর সেই কথাটা বলতেই আপনার কাছে এলাম। বিহারের বর্ডার, এখান থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে। ইলেকট্রিক কাঁটা তার কেটে ফেলে এদিকের বনের সম্পদ লুঠ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে ওদিকে। এসব অনাচার বন্ধ করা দরকার। তার উপর শুরু হয়েছে সুইসাইডের হিড়িক। সঞ্জয় ভঞ্জ এইজন্যেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে। শান্তি যাতে থাকে— আমাকে তা দেখতে হবে। পুলিশ একা পারবে না।"
"সঞ্জয় ভঞ্জর টনক তাহলে নড়েছে সুইসাইড হিড়িক নিয়ে ?" বললে ইন্দ্রনাথ— থেমে থেমে।
"ওঁর আগমনই তো এই মিস্ট্রি সলভ করার জন্যে।"
"স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট ?"
"হ্যাঁ। সবাই তা জানে না, কিন্তু আপনাকে জানাতে বাধা নেই। বড় তুখোড় অফিসার। নজর চারিদিকে।" উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে এলেন দুর্যোধন— "উনি একটা হিটলিস্ট বানিয়েছেন— সন্দেহ করছেন যাদের, তাদের লিস্ট— আমার সাহায্য দরকার হতে পারে বলে আমাকে জানিয়ে রেখেছেন। নামগুলো পাঁচ কান না হয়।"
"নির্ভয়ে বলুন।"
"মাত্র দুটো নাম। এদের একজন ডক্টর ডেথ।"
"ড-ক্ট-র ডে-থ ?"
"ইয়েস স্যর। সঞ্জয় ভঞ্জ অপরাধ বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ— শখের রহস্যসন্ধানীদের অনুকম্পা করেন। ইন্দ্রনাথবাবু, আপনাকে উনি ভাল চোখে দেখেননি। সে কথাও আমাকে বলেছেন। আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম— কারণ আপনার কীর্তিকাহিনী,

মৃগাঙ্কবাবুর কলমের দৌলতে এই বনজঙ্গল পাহাড়েও পৌঁছোয়। আমি আপনার প্রতিভার পূজারী।"
"ধন্যবাদ। সঞ্জয় ভঞ্জর কথা বলুন।"
"ওঁর উপর রুষ্ট হবেন না। অল্প বয়স। বিলেত আমেরিকায় অনেকদিন কাটিয়েছেন। বাংলা ভাষায় জ্ঞান নেই বললেই চলে— পড়াশুনো দূরের কথা। দেশের কুলাঙ্গার। যাক গে, এসব কথা এই চার দেওয়ালেই আটকে থাকুক। ডক্টর ডেথের নাম শুনেছেন উনি আমেরিকায়।"
"কোন ডক্টর ডেথের নাম শুনেছেন ?"
চমকে উঠল দুর্যোধনের সদা সজাগ চোখ—
"কটা ডক্টর ডেথ আছে আমেরিকায় ?"
"দুটো।"
"আপনি মনে হচ্ছে সঞ্জয় ভঞ্জর চেয়ে বেশি জানেন ?"
"এতক্ষণে সেটা মনে করতে পারলেন ? মিঃ চৌধুরী, আপনার আখাম্বা চুরুট একটা বের করুন। —হ্যাঁ, দুজন ডক্টর ডেথ। একজনের মুন্ডু ধড় থেকে আলাদা হয়েছে গিলোটিনের ছুরিতে— ফরাসি ডক্টর ডেথ— কিন্তু কাহিনীটা অমর হয়ে রয়েছে আমেরিকান কেতাবে। আর একজন খাঁটি আমেরিকান-প্যাথলজিস্ট ডাক্তার— এখনও চলছে তাঁর বিচারের প্রহসন।"
দুর্যোধনের সাদা চোখদুটো ঈষৎ বিস্ফারিত হয়েছে এতক্ষণে। দুঁদে পলিটিশিয়ানদের চোখ কিন্তু সব সময়ে ঠাণ্ডা থাকে— অবাক হয়েছেন বোঝা যায় না। দুর্যোধন তাহলে তেমন পোড় খাওয়া নন ?
বললেন— "সঞ্জয় ভঞ্জ এই প্যাথলজিস্টের কথাই বলছিলেন। যারা আত্মহত্যা করতে চায়, তাদের উনি মরার সুযোগ করে দেন।"
"এক কথায় তাকে কী বলে ?"
"ইউথানেসিয়া," আস্তে বললেন দুর্যোধন।
"হ্যাঁ। করাল রোগ যাদের হতাশ করে তোলে— ডক্টর ডেথ-কে খুঁজে বের করে তারাই। স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের পন্থা বাতলে দেন। ফাইন ! সঞ্জয় ভঞ্জর হিসেবে তাহলে এখানকার ডক্টর ডেথ দু'জন—" বলে থেমে গেল ইন্দ্রনাথ।
পাদপূরণ করে দিলেন দুর্যোধন— "অচেতন বরাট আর মনোহর আচার্য।" কথা না বলে চুরুটে সুখটান দিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। চোখ রয়েছে কিন্তু দুর্যোধনের চোখের উপর। এই সেই চোখ যার মধ্যে কমলহিরের দ্যুতি দেখা যায় মাহেন্দ্র মুহূর্তে।
এখনও তাই দেখা যাচ্ছে।
চুরুট নামাল ইন্দ্র— "হিট লিস্টে আর কার নাম আছে দুর্যোধনবাবু ?"
চোখ নামিয়ে নিলেন দুর্যোধন। তারপর চোখে চোখে চেয়ে বললেন— "সঞ্জয় ভঞ্জ একটু অযথা সন্দেহ করেন। তৃতীয় আর শেষ নামটায় বাড়াবাড়ি করেছেন।"
"গোয়েন্দাদের কাজ তাই। প্রথমে সবাইকেই সন্দেহ করতে হয়। তৃতীয় নামটা কার ?"
"সন্ধ্যা আচার্য।"
আমি নিশ্চয় চমকে উঠেছিলাম। কেননা, কাঠখোট্টা রণ চৌধুরী যেন সোফা ছেড়ে ইঞ্চিখানেক উপরে উঠে গেলেন নামটা শুনেই।
নিথর রইলেন কেবল প্রকাশ ঘটক।
তরল হল ইন্দ্রর মুখের শক্তভাব। হাসল। বলল— "খুবই খারাপ মেয়ে ছিল।"
সচমকে বললেন দুর্যোধন— "আপনি জানেন ?"
"শখের রহস্যসন্ধানী বলেই জানি।"
"অভিমান আপনার এখনও গেল না ? সত্যিই রক্তমাংসের গোয়েন্দা আপনি— অতিমানুষ নন। আপনাকেই শুনিয়ে রাখি আর একটা খবর— যা সঞ্জয় ভঞ্জকেও বলিনি। — সন্ধ্যা আর মনোহরকে দেখে আপনার কী মনে হয়েছে ?"
"আমি যেটা অনুমানে বলব, সেটাই আপনার জানা খবর, এই তো ?"
"যা বলেন।"
"সন্ধ্যা মনোহরের মায়ের পেটের বোন নয়।"
নড়ে বসলেন দুর্যোধন— "আশ্চর্য ! চোখ বটে আপনার। একজন কালো, আর একজন ফর্সা। একজন বেঁটে, আর একজন লম্বা।"
"জীন বিজ্ঞানের হিসেবে কোনও সাদৃশ্য পাওয়া যায় না চুলচেরা বিচারে।"
"অবৈধ সহাবস্থান নয় তো ?"
"আপনার খবর কী বলে ?"
"স্যাংগুইন হতে পারছি না। তবে অচেতনকে পকেটে পুরে রেখেছে।"
"সঞ্জয় ভঞ্জর অনুমান ?"
ঝুঁকে পড়লেন দুর্যোধন— "ভয়ানক। —সন্ধ্যা পার্টি পাকড়ে আনে— দুই ডক্টর ডেথ পার্টি সাবাড় করে।"
এই বলেই ঘড়ি দেখলেন এবং উঠে পড়লেন— "আজ আর নয়। দিনকয়েক আছি এখানেই— আসুন একদিন— প্রকাশবাবু বাড়ি চেনেন।"
উঠে দাঁড়ালাম আমরাও। এগিয়ে দিলাম বারান্দায়। প্রকাশ এগিয়ে দিলেন বাগানের ফটক পর্যন্ত। কালো গাড়িটা অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়েছিল। দুর্যোধন নিজেই ড্রাইভ করে চলে গেলেন।
প্রকাশ বারান্দায় ফিরে আসতেই বললে ইন্দ্রনাথ— "ওটা কী গাড়ি ? অদ্ভুত দেখতে।"
হেসে বললেন প্রকাশ— "দেবতাদের মাহাত্ম্যের চেয়ে তাঁদের বাহনদের মাহাত্ম্য কম যায় না। দুর্যোধন মাহাতোর এই বাহনটি আদতে একটা জিপ। উনি তাঁকে ভ্যান বানিয়েছেন। একাধারে মালগাড়ি আর পার্টির গাড়ি—বনেজঙ্গলে, পাহাড়ি রাস্তায় এমন গাড়িই দরকার।"
"চালচলন তো জমিদারের মতো।"
"জমিদারই তো—এ যুগের", বক্র হাসলেন প্রকাশ—"ভিতরে আসুন, একটা জিনিস দেখাচ্ছি।"
গেলাম প্রকাশের সঙ্গে ওঁর কোয়ার্টারে। শোবার ঘরের পিছনে ছোট একটা ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে বললে—"দেখুন।"
ছোট্ট ঘরটার তিনদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি বল্লম। গোছাগোছা বল্লম। ঘর ভর্তি। মেঝে পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। ঘরে পা দেওয়ার জায়গা নেই। সবই নতুন। ঝকঝক করছে ফলা।
দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বললে প্রকাশ—"ওঁর স্টক এখানে থাকে। এখান থেকে বিলি হয় জঙ্গল রক্ষীদের দেওয়া হয়। জঙ্গলের হার্বস ইত্যাদি তারা রক্ষে করে সরকারের রোজগার বাড়ায়—সেইসঙ্গে বাড়ায় নিজেদের—"
"আর বাহিনী বাড়ে দুর্যোধনের", ইন্দ্রনাথের সহাস্য মন্তব্য।
"রাজ্য রাখতে গেলে এ সবই দরকার। আমরা হুকুমের চাকর।"
"উনি এখানেই থাকেন ?"
"হ্যাঁ। যাবেন ? কাল সকালে প্রোগ্রাম করা যাবে।"
পরের দিন সকালে ভেঙে পড়ল রণ চৌধুরীর মজবুত শরীর। ঘন ঘন টয়লেটে দৌড়তে লাগলেন। দশ ফোঁটা ক্লোরোডাইন গিলিয়ে দিয়ে, ওঁকে ফেলেই আমরা গেলাম পাহাড়ের গায়ে দুর্যোধনের বাড়িতে। মাটির বাড়ি—অনেকগুলো। বাগান দিয়ে ঘেরা। গ্যারেজটাও মাটি আর টিন দিয়ে তৈরি। অদ্ভুত জিপটা মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে—পিছনটা ঢুকে রয়েছে ভিতরে। প্রথম আটচালায় বৈঠকে বসেছিলেন দুর্যোধন। তাঁকে ঘিরে বসে আছে কালোমানুষের দল। আমাদের দেখেই হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। পাশের একটা ঘরে নিয়ে বসালেন। চা আনতে হুকুম দিলেন।
ইন্দ্র বললে—"আজ দেখছি খুব ব্যস্ত।"
"আর বলেন কেন—অনেক দিন পর এলাম তো।"
"আর একদিন আসা যাবে। বেশ জায়গা।"
"লেখক মানুষ, খোরাক পাবেন অনেক।"
আমি বললাম—"লেখক তো আপনিও।"
"সে তো ওষুধের বই। ইংরেজি।"
"দুর্লভ বিষয়। সাঁওতালি মেডিসিনের খবর ক'জন রাখে ? আছে আপনার কাছে ?"
"এনে দিচ্ছি।"
ইন্দ্রনাথ চিমটি কেটে বললে—"মৃগ, তোমার এই এক ব্যারাম। এসেছ বেড়াতে— বই নিয়ে মেতো না।"
মোটা একটা বই নিয়ে ঘরে ঢুকলেন দুর্যোধন। বিশ্বকোষ সাইজের বিরাট বই। বইটা আমার

হাতে দিতেই এক চ্যালা এসে ডাকল পিছন থেকে। বেরিয়ে গেলেন উনি।
বই-পাগল ইন্দ্র নিজেও। প্রকাশ ঘটকও কম যান না। তিন জনে ঝুঁকে পড়লাম স্থূলকায় গ্রন্থের উপর। খুললাম মাঝখান থেকে। টুপ করে একটা কাগজ পড়ে গেল মেঝেতে, কুড়িয়ে নিল ইন্দ্রনাথ। এক পলক চাইতেই চোখমুখের চেহারা পালটে গেল।
দ্রুত হ্রস্বকণ্ঠে বললে— "কুইক, মৃগ, ক্যামেরা রেডি কর। ফটোকপি চাই—এই কাগজটার।"
ফুলস্কেপ সাইজের একটা কাগজ। ইংরেজিতে সাইক্লোস্টাইল করা—দু'পাতাজুড়ে। হুড়ো খেয়ে পড়বার সময় পেলাম না। ক্লিকক্লিক করে শাটার টিপে ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। কাগজখানাকে যথাস্থানে রেখে বই মুড়ে রাখল ইন্দ্রনাথ। নিজে তো খুললই না—আমাদেরও খুলতে দিল না।
চা নিয়ে এল দুর্যোধনের লোক— সঙ্গে তিনি নিজে। বড় বড় রসগোল্লা আর ক্ষীরের নাড়ু। নিমেষে প্লেট সাফ করে দিয়ে ইন্দ্র বললে—"বইটা বড্ড ভারী। আর একদিন নিয়ে যাব—আজ শুধু জঙ্গল ভ্রমণ।"
চলে এলাম। বাস ধরে সোজা রেঞ্জ অফিসে। দেখলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে একধামা মুড়ি নিয়ে চিবোচ্ছেন রণ চৌধুরী। এক গাল হেসে বললেন—"পেটে রাক্ষস ঢুকে গেল আপনার ওষুধ খেয়ে। প্রকাশবাবু, আমি রেডি।"
প্রকাশ ঘটকের স্কুটার বের করাই ছিল। রণ চৌধুরীও জঙ্গুলে পোশাক পরেছিলেন। মুড়ির ধামা আমার হাতে গছিয়ে দিয়ে স্কুটারের পিছনে বসলেন। প্রকাশ চালিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।
ইন্দ্রনাথ পিছন থেকে বলল —"দুর্গা! দুর্গা!"
আমি বললাম —"তুমি জানতে ওঁরা এখন বেরবেন? রণ চৌধুরীর পেট খারাপ হওয়াটা মিছে কথা? কোথায় গেলেন, তাও জানো মনে হচ্ছে?"
"জানি, কিন্তু বলব না," বলে ক্যামেরাটা টেনে নিল আমার কাঁধ থেকে—"চললাম আমিও।"
"কোথায়?"
"শহরে।"
সারাদিন ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিলাম। ঘুমের ঘোরে শুনলাম প্রকাশের মেয়েটার দাপাদাপি আর কবিতার সঙ্গে চিত্রার বকবকানি। এত বকতেও পারে মেয়েরা। শেষকালে ঘুম ছুটে গেল ঝাঁকুনি খেয়ে। চা নিয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা।
আড়মোড়া ভেঙে বললাম —"হে প্রেয়সী, এতদিন মুগ্ধ ছিলাম তোমার ওই মণিকর্ণিকার মতো যৌবনের জন্যে, ওই মারাঠি বুকের জন্যে, ওই মিশরীয় চোখের জন্যে, ওই গ্রিক চিবুকের জন্যে, ওই ইরানি নাক আর কাশ্মীরি ভুরুর জন্যে—আজ থেকে মুগ্ধতর হলাম তোমার ওই হাতির শুঁড়ের মতো পেশিবহুল জিভখানার জন্যে। উফ। এত বকতেও পারো।"
খিল খিল হাসি শুনলাম দোরগোড়ায়।
মুখ লাল হয়ে গেছিল কবিতার। কিন্তু দাম্পত্য দাঙ্গা বাঁচিয়ে দিল স্বয়ং ইন্দ্রনাথ। পিছনে ঝোড়ো চেহারা নিয়ে রণ চৌধুরী আর প্রকাশ ঘটক। একসঙ্গেই ফিরল তিনজনে—তাহলে মিটিং পয়েন্টও ছিল এক জায়গায়।
ইন্দ্রনাথ কবিতার লাল মুখ আর আমার হাসি মুখ তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ে শুধু বললে, "নারদ! নারদ!"
রেগে প্রস্থান করল কবিতা— পিছনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে চিত্রা।
সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলাম—"কী কাজ করে এলে?"
"টপ সিক্রেট"বলে দরজা ভেজিয়ে দিল ইন্দ্রনাথ।
তারপর সব শুনলাম।
রাতের আড্ডায় চুরুট নিয়ে লেকচার ঝেড়ে গেলেন রণ চৌধুরী। ইন্দ্রনাথ মৌনী হয়ে রয়েছে। মনের শক্তি বাড়ানোর দরকার হলেই ওর মুখের কথা কমে যায়। আমি তা জানি বলেই নির্বিবাদে রণ চৌধুরীর জ্ঞান গ্রহণ করে যাচ্ছি একাই। ফুল সিগার, হাফ সিগার, সিগারেল্লো। ঠাণ্ডার দিনে বিয়ারের সঙ্গে ম্যানিলা, খুব ঠাণ্ডায় উইস্কির সঙ্গে ডাচ, গরমের দিনে ইণ্ডিয়ান,বার্মা, সুমাত্রা উইফ আর জাভা ডসেন। পানপাত্রে একটু আফিং মিশিয়ে দিলে.....
"মড়ার মতো ঘুম", বলে সটান হয়ে বসল ইন্দ্রনাথ। একটু থেমে ফের বললে, —"আফিং।"
পরের দিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই বারান্দায় বেরিয়ে দেখি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কোলে ম্যানলিকার নিয়ে পদ্মাসনে বসে আছেন রণ চৌধুরী। সতর্ক কৃপাণ চক্ষু ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে নিবদ্ধ সামনে।
বললেন—"আপনার বন্ধুর মাথায় ছিট আছে।"
"কেন?"
"আবার শহরে গেছে—বাসে। আমাকে রেখে গেল আপনাদের পাহারা দেওয়ার জন্যে। প্রকাশও গেছে সঙ্গে।"
ইন্দ্রর মৌন থাকার কারণটা এবার বোধহয় আঁচ করতে পারলাম।
ফিরল সন্ধের সময়ে।
আমরা তখন গুলতানি করছি একটা ঘরে। রণ চৌধুরী এখনও আগ্নেয়াস্ত্র ত্যাগ করেননি। দরজা বন্ধ করে বসে আছেন দরজার সামনেই। পরিহাসের মেজাজ নেই দেখে তাঁর সঙ্গে আমরা কথা বলছি না।
কবিতা আর চিত্রা চুটিয়ে সন্ধ্যা-নিন্দা করে যাচ্ছে। বিষকন্যাদের নাকি অল্পবয়স থেকে নিশ্বেসে বিষগ্রহণ করানো হত।
জ্যোতিষশাস্ত্রেও আছে বিষকন্যার কেচ্ছা। সন্ধ্যার রাশিচক্র বিচার করলে দেখা যাবে......
ঠিক এই সময়ে টোকা পড়ল দরজায়।
ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরে —"দরজা খোলা হোক।"
রণ চৌধুরী দরজা খুলে দিলেন। ইন্দ্রনাথের পরিপাটি ধুতি পাঞ্জাবি লাটঘাট হয়ে রয়েছে। মুখ থমথমে। প্রকাশের মেয়ে এতক্ষণ পুতুল খেলছিল—ইন্দ্রকে দেখে তারও চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল ইন্দ্রনাথ। বললে—"একটু পরেই এখানে একটা মিটিং বসবে। মেয়েরা থাকবে পাশের ঘরে।"
কবিতা বললে—"কেন?
"নাটকটা এবার শেষ করে দিতে চাই বলে।"
"তুমি কী করলে সারাদিন?"
"সন্ধ্যাকে খুঁজলাম।"
"সন্ধ্যা!"
"তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"
মিনিট দশেক পরে প্রকাশ ঢুকল ঘরে। মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। অদ্ভুত ছোকরা। আমরা চার পুরুষ মুখোমুখি বসে।
ইন্দ্র বললে—"স্কুটারটা কী ভাবে আছে?..."
"যে ভাবে দেখে গেছিলেন", বললেন প্রকাশ —"গ্যারেজে শুধু একটা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। এখনও ঝুলছে। চাবি আমার কাছে।"
ঘর ফের নিস্তব্ধ। আমি কৌতূহল প্রকাশ করলাম না। হাওয়া অন্যরকম। বিদ্যুৎগর্ভ পরিবেশ।
ন'টার সময়ে গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। বাংলোর বাইরে থেমেছে।
উঠবার আগে ইন্দ্র জিজ্ঞেস করল প্রকাশকে—"গাড়ি পার্কিং-এর কী ব্যবস্থা করেছেন?"
"বাংলোর সামনে কাটা কাঠ ফেলে রেখেছি—কোনও গাড়ি দাঁড়াতে পারবে না। দূরে রাখতে হবে।"
"দূরত্ব নিরাপদ?"
"হ্যাঁ।"
জুতোর শব্দ উঠে এল বারান্দায়। রণ চৌধুরী দরজা খুলে ধরেছিলেন।
প্রথমে চৌকাঠ পেরিয়ে এলেন ডি এফ ও প্রদীপ কাঞ্জিলাল। ঈশ্বর তাঁকে জন্মাবধি হাস্য-প্রক্রিয়া শেখাননি। এই মুহূর্তে তিনি সুকুমার রায়ের আঁকা ছবির সজীব সংস্করণ হয়ে রয়েছেন এবং উৎকট গম্ভীর।
গণ্ডারোচিত পদক্ষেপ কিন্তু বিস্মৃত হননি। মেঝে কাঁপিয়ে ঢুকলেন ঘরে। ঢিবি কপাল কুঁচকে বললেন গ্রামভারী গলায়—
"এসেছে?"
"না। তবে আসবে। আসতেই হবে।"
এঁর পিছন পিছন ঢুকলেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার— অচেতন বরাট আর মনোহর

আচার্য। পুলিশ কর্তা সঞ্জয় ভঞ্জ—ডানহিল পাইপ কড়মড় করে চিবিয়ে চলেছেন।
সবশেষে থপথপ করে অতিকায় শরীর টেনে নিয়ে এলেন ওসমান সাহেব।
সবাই বসলেন—খাড়া রইলেন শুধু সঞ্জয় ভঞ্জ। দুই নয়নে সীমাহীন তাচ্ছিল্য বিকিরণ করে বললেন— "কোথায় সেই স্কুটার ?"
তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রকাশ। ফিরে এলেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। নিস্তব্ধ ঘরে আমরা তখন চুপচাপ বসে। বসলেন সঞ্জয় ভঞ্জ। বললেন,
—"ঠিক আছে। নো প্রব্লেম।"
এক-একটা সেকেন্ডকে মনে হচ্ছিল ব্রহ্মার এক-একটা বছর। কাটতে যেন আর চায় না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পাথরের স্ট্যাচুর মতো বসে আছে ইন্দ্র।
গাড়ি থামল বাইরে। জুতোর আওয়াজ উঠে এল বারান্দায়। দরজা খোলাই ছিল। ঘরে ঢুকলেন দুর্যোধন মাহাতো।
ইন্দ্রনাথ শুধু বলল—"ওইখানে বসুন।"
দুর্যোধন তক্ষুনি বসলেন না। স্লোস্পিড চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন ঘরের সব ক'জনকে। মুখের ভাব রইল অবিচল।
বসলেন তারপর। বললেন সহজ গলায়—
"ব্যাপারটা কী ?"
সঞ্জয় ভঞ্জ পাইপ নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—
"টয়লেটটা ঘুরে এসে আমি বলছি। —প্রকাশবাবু, কোনদিকে যাব ?"
"চলুন।"
দুজনে বেরিয়ে গেলেন।
ইন্দ্রনাথ বললে—"আপনার সঙ্গে কয়েকটা গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। কাল আমরা চলে যাব। তাই আজ রাতেই এই গেট টুগেদার।"
"গেট-টুগেদারের তো লক্ষণ দেখছি না। আমি ব্যস্ত মানুষ। সংক্ষেপে সারুন," দুর্যোধনের স্বর ঈষৎ কঠিন। চোখ কিন্তু ঠাণ্ডা।
"আপনার কনট্রাসেপটিভ পিল-এর গবেষণা কদ্দূর ?"
চেয়ে রইলেন দুর্যোধন। ঠোঁটের কোণে জাগ্রত ক্ষীণ বিদ্রূপহাস্য।
—"আপনি ব্যাচেলর বলেই কি ব্যাপারটায় ইন্টারেস্টেড ?"
"এই দুই ডক্টর ডেথ-ও ইন্টারেস্টেড," অচেতন বরাট আর মনোহর আচার্যকে দেখাল ইন্দ্রনাথ। নড়ে বসলেন দুজনে। অচেতনের শীর্ণ মুখাবয়বের কুটিল চোখে একটা ছায়া ভেসে গেল। মনোহর আচার্যর আবলুস মুখ আরও ঘোর হল— এই প্রথম তাঁর চোখে দেখলাম গুলবাঘ চাহনি —আকৃতির সঙ্গে চোখ খাপ খেয়েছে এবার।
ধীরে ধীরে চোখ আর মুখের চেহারা পালটে গেল দুর্যোধনের।
চোখের পাতা না ফেলে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইলেন ইন্দ্রর দিকে। একেবারে অপলক। একটানা বেশ কিছুক্ষণ।
তারপর বললেন কঠিন গলায়—"ষড়যন্ত্র !"
"ষড়যন্ত্র দিয়ে ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটন।"
প্রকাশ ফিরে এলেন আগে। পিছনে আই পি এস অফিসার। রুমাল দিয়ে হাত মুছছেন। পাইপ সঞ্চরমাণ হয়েছে ঠোঁটের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। বললেন কড়মড়িয়ে —"ও.কে। এবার একজিবিট নম্বর ওয়ান-কে আনা হোক।"
প্রকাশ বললেন —"খবর দিয়েছি। আসছে।"
কোয়ার্টারের দিক থেকে শোনা গেল অস্ফুট হাসির তরঙ্গ। একাধিক নারীকণ্ঠ হেসে লুটিয়ে পড়ছে। নিস্তব্ধ অরণ্য রাত্রে চলছে রঙ্গালাপ।

হাসি আর পদশব্দ এগিয়ে এল। ঢুকল ঘরে। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তিন মহিলা। চিত্রা আর কবিতা হাসি গোপন করার চেষ্টা করছে এতগুলো পুরুষের সামনে —কিন্তু দুজনেই এক-এক হাতে কোমর জাপটে ধরে রেখেছে মাঝের মহিলাকে।
সন্ধ্যা।
এতক্ষণ নিশ্চয় হাসছিল। এখন তা অন্তর্হিত হয়েছে। ফুঁসে উঠেছে। বুকের প্রজাপতি রঙ পাল্টাচ্ছে। গনগনে চোখে দেখছে দুর্যোধনকে।
কালো মুখ থেকে হঠাৎ রক্ত নেমে গেলে মুখবর্ণ কী রকম হয়, দুর্যোধনের মুখ দেখে সেদিন তা জানলাম।
দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে। সন্ধ্যা আর দুর্যোধন।
শানানো গলায় বললে সন্ধ্যা—"ডক্টর ডেথ ! আপনাকে অবলাইজ করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। পালিয়ে এলাম। তবে আপনার চা খেয়েছি।"
"কীসের চা ?" ইন্দ্রর প্রশ্ন।
"জঙ্গলের জড়িবুটির রস মিশোনো চা—যে চা রোজ একবার করে মাসখানেক পেটে গেলে তিন-তিনটে বছর নিশ্চিন্ত—কমপ্লিট সেক্সুয়াল ফ্রিডম। ব্রেজিলের ইণ্ডিয়ানরা জানে সেই জাদু—আর জানেন ইনি।"
"আপনি খেতে গেলেন ? কেন ?..."
"অদ্ভুত প্রশ্ন ! আমি যে বিষকন্যা। আমি যে হাফ কল-গার্ল। পঞ্জাবের প্রমীলা যদি প্যামেলা হয়ে বৃটিশ সরকারকে কাঁপিয়ে দিতে পারে আমি কেন পারব না ভারত কাঁপাতে ? কলেজ লাইফে আমিই তো চিৎকার করে বলেছিলাম —হোয়াট উড হ্যাপেন টু মি নাউ। আই ফরগট টু টেক কনট্রাসেপটিভ পিলস !"
"ওটা তো আপনার কথা নয় —প্রমীলা ওরফে প্যামেলার কথা। আপনি নকল করে চমক সৃষ্টি করেছিলেন।"
ঠোঁট কামড়ে হাসি সামলে নিল সন্ধ্যা— "কিন্তু দুর্যোধন মাহাতো ভেবেছিলেন সব সত্যি। যেমন সবাই ভাবে। তাই আমাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেলেন জঙ্গলের ডেথ হাউসে।"
"ডেথ-হাউস !"
"সবাই জানে অবশ্য অন্য নামে— ফ্যাক্টরি বাড়ি। হার্বস থেকে ওষুধ বানানোর কারখানা। আগে এক সাহেব ওখানে বয়লার বসিয়েছিলেন একই ইচ্ছে নিয়ে—সাঁওতালি মেডিসিনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করবেন বলে— এখনও আছে সেই বয়লার, হার্বস রাখবার গুদোম, বিশাল উনুন—আর চিমনি।"
"এখন কী হয় সেখানে ?"
ছিটকে যেতে গেল সন্ধ্যা। দুপাশ থেকে আরও জোরে চেপে ধরল চিত্রা আর কবিতা। দাঁতে দাঁত পিষে বললে সন্ধ্যা— "মানুষ পোড়ানো।"
"মানুষপোড়ানো আগুন দিয়ে বয়লার ফোটানো হয় ? হাড়গুলো ?"
"মাটির তলায়—যেখানে হার্বস রাখা হত।"
"মরা মানুষও আছে নাকি ?"
"চুন দিয়ে চাপা আছে।"
"চুন ! এত চুন যেত জঙ্গলে ? ওসমান সাহেব, আপনি চুন সাপ্লাই দিয়েছেন নাকি ?"
"বস্তা, বস্তা", বললেন ওসমান সাহেব। তাঁর গলা বসে গেছে।
"কাকে ?"
"ওই ওঁকে," দুর্যোধন মাহাতোকে তর্জনী সঙ্কেতে দেখালেন ওসমান সাহেব।
"অন্যায়, খুব অন্যায়। আমরা অবশ্য ওঁর মাটির বাড়ি দেখে এসেছি, চুনের কাজ সেখানে নেই। তাই তো সন্দেহ হয়েছিল। অত চুন কী কাজে লাগাচ্ছেন এতদিন ধরে। নিশ্চয় আপনার অদ্ভুত জিপে করে নিয়ে যেতেন দুর্যোধনবাবু ? কথা বলবেন না ? কিন্তু চুন যে পড়ে রয়েছে জিপের মধ্যে। এই মাত্র সন্দেহ ভঞ্জন করে এলেন সঞ্জয় ভঞ্জ। সন্ধ্যা আচার্য নিশ্চয় চুনের বস্তা দেখেছেন ডেথ হাউসে ?"
"অনেক। যে ঘরে আমাকে আটকে রাখা হয়েছিল।"
"কী সর্বনাশ ! কেন জানতে পারি ?"
"দেশের কাজে লাগাবেন বলে। আমাকে মাতাহরি বলবেন বলে। নারী গুপ্তচরের নাকি খুব দরকার। কেচ্ছা ফাঁস করবেন কেচ্ছা বানিয়ে।"
"কনট্রাসেপটিভ চা খাইয়ে তারই ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল ?"
"সেই ক্ষেত্রে উনিও বিচরণ করবেন—অভয় দিয়েছিলেন।"
"বাঃ ! বাঃ ! যদি রাজি না হতেন ?"
"ডেথ চেম্বারে ঢুকতে হত।"
"সেটা কোথায় ?"
"অদ্ভুত জিপের পিছনে।"
"জিপের পিছনে ডেথ-চেম্বার ! প্রাঞ্জল করবেন ?"
"চওড়ায় মাত্র এক ফুট—ভিতরে একটা চেয়ার। বাইরে থেকে মনে হয় মালপত্র রাখবার

জায়গা। কিন্তু ভিতরে আছে কার্বনমনোক্সাইড ছাড়ার ব্যবস্থা।"
"হরিবল! মানুষ মারার কল। আপনাকে ওখানে ঢোকাতেন?"
"লাশটা পথেঘাটে ফেলে রাখতেন। পকেটে থাকত আমাকেই দিয়ে লেখানো আত্মহত্যার চিরকুট।"
"শহরে আত্মহত্যার হিড়িকের মূলে তাহলে এই ডেথ-চেম্বার?"
"হ্যাঁ। এটাও ওঁর দেশসেবা। সমাজের বোঝা কমিয়ে দিতেন জরাগ্রস্তদের টাকা নিয়ে—সেই টাকা খরচ করতেন সমাজকল্যাণে।"
"রবিনহুডের মাসতুতো ভাই! দুর্যোধনবাবু, ডক্টর ডেথ তাহলে অচেতন বরাট আর মনোহর আচার্য নন—আপনি নিজে। সন্ধ্যাকে খতম করে সন্দেহ ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ওঁদের দিকেই?"
দুর্যোধন এখন প্রস্তর মূর্তি।
ইন্দ্রনাথ বললে সঞ্জয় ভঞ্জকে, "মিছে কথা বলা অন্যায়। কেন বলেছেন ওঁকে—আপনার হিটলিস্টে আছে দুই নিরীহ ডাক্তার আর এই অবলা মেয়েটার নাম?"
"আসল টার্গেট যাতে নিশ্চিন্ত থাকে। ইনফরমেশন পেয়েই এসেছি—রাঘববোয়ালের খেলা মশায়—কিসসু করা যাবে না।"
এই প্রথম ভারী গলায় কথা বললেন দুর্যোধন—"এখনও কিছু করতে পারবেন না।"
"তাতো বটেই, তাতো বটেই," মধুক্ষরা কণ্ঠস্বরে জবাব দিল ইন্দ্রনাথ, "সন্ধ্যা মদ খেতে চেয়েছে—আপনি তাকে মদ খাইয়েছেন—ও কী করে জানবে মদে ছিল আফিং? স্বেচ্ছায় যারা আত্মহত্যা করতে চেয়েছে, তাদেরও তো এইভাবে বেহুঁশ করে পুরেছেন ডেথ-চেম্বারে। আফিং যেখান থেকে রেগুলার কিনেছেন—সেখানকার রেকর্ডও হাতিয়েছেন যে আই. পি. এস. সাহেব।"
"তাহলেও আমার চুল ছুঁতে পারবেন না।"
"তা ঠিক। নেতা বলে কথা। মড়াপোড়ানো তেলচর্বি চিমনি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল গাছের পাতায়—রণ চৌধুরী বেশি কৌতূহল দেখাতে গিয়ে মরতে বসেছিলেন আপনার বন্দুকের গুলিতে। সেটাও প্রমাণ করা যাবে না।"
"না। কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না। পণ্ডশ্রম করছেন।"
"তাই কি? আপনার সাঁওতাল মেডিসিনের বইয়ের মধ্যে কী রেখেছিলেন দুর্যোধনবাবু?"
টলে গেলেন মাহাতো। এই প্রথম। কিন্তু কথা বললেন না।
ইন্দ্র ছুরি শানিয়ে গেল কথার সুরে—"একটা কাগজ। দুদিকে সাইক্লোস্টাইল করা। বিদেশের এক রাষ্ট্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র। এই তল্লাটকে নিজের স্কিমে ঢালবার পরিকল্পনা। আর-ডি-এক্স এক্সপ্লোসিভ আনবার প্ল্যান। সন্ত্রাস সৃষ্টির ব্লুপ্রিন্ট।"
দুর্যোধন এখন ছাইয়ের মতো বিবর্ণ।
"সে কাগজের ফটোকপি অফিসে রেখে এসেছেন সঞ্জয় ভঞ্জ। পলিটিক্স বড় লাভের ব্যবসা—কিন্তু এসব পথে আপনি কেন গেলেন দুর্যোধনবাবু?"
"পথের কাঁটা সরানোর জন্যে।" গলা ধরে গেছে দুর্যোধনের।
"তাই আর-ডি-এক্স প্যাক করে রেখেছিলেন প্রকাশের স্কুটারে? স্টার্টারে কিক করলেই উড়ে যেত এই বাড়ি—প্রাণ যেত এতগুলো প্রাণীর?"
দুর্যোধন এখন বুঝি শব হয়ে গেছেন।
"ছিঃ ছিঃ!" ইন্দ্রনাথ এখন চোখে চোখে চেয়ে কথা বলছে। সম্মোহনের অদৃশ্য ঢেউ বয়ে যাচ্ছে যেন একজনের চোখ থেকে আর একজনের চোখে— "কেন? কেন এ পথে পা দিলেন দুর্যোধনবাবু? আমি খবর নিয়ে জেনেছি, ছেলেবেলা কেটেছে আপনার দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। আপনার মাকে ডাইনি সন্দেহ করে পিটিয়ে মেরে ফেলে আসা হয়েছিল বাঘ-নেকড়ে-অজগরের জঙ্গলে—সম্পত্তির লোভে খুন করা হয়েছিল আপনার বাবাকে। আপনি মানুষ হয়েছেন অনাথ আশ্রমে—দেশকে ভালবাসতে শিখেছেন—কিন্তু এপথে কেন?"
"কারণ, এদেশের আদালতে বিচার হয় না—এদেশের পুলিশ সাধারণ মানুষের কাছে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধার্মিক পার পেয়ে যাচ্ছে। ইয়ং জেনারেশন তাই দেখে অধর্মের পথেই যেতে চাইছে। আমাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে—যে ভাবেই হোক। জানেন কাদের মাংস পুড়িয়ে বয়লারের জল ফুটিয়েছি? দেশের শত্রুদের। টেররিস্ট! বর্ডার পার করিয়ে এনেছি ব্যাঙ্ককে পাচার করে দেব আশ্বাস দিয়ে, দক্ষিণা নিয়েছি লাখ লাখ টাকা ...কিন্তু পাঠিয়েছি যমালয়ে। নিপাত্তা হতেই ওরা চায়—তাই কেউ পাত্তা নেয়নি। আরও নৃশংস পন্থা জানা থাকলে, তাই করতাম। ...লাখ লাখ টাকা নিজে ভোগ করিনি, লাগিয়েছি সমাজের উপকারে। এরা সমাজের ভাইরাস, এদের মেরেছি স্ট্রং মোটিভ নিয়ে। আরও মারব আরও স্ট্রং মনোবল নিয়ে। জঙ্গলে থাকুক জঙ্গলের আইন।"
"কংক্রিটের জঙ্গল আর গাছের জঙ্গল কি এক হল? শহরের জংলিদের থেকে আপনাদের তফাতটা তাহলে কোথায়?"
যেন একটা অদৃশ্য থাপ্পড় খেলেন দুর্যোধন মাহাতো।
গভীর আর্দ্র গলায় বললে ইন্দ্রনাথ—"সোজা পথে চলুন, দুর্যোধনবাবু। দেশ আপনার মতো বড় মনের নেতা চায়।"
"আর ফেরা যাবে না।"
"যাবে। সব ভুলে যান। আপনি ফিরুন।"
"নইলে?"
"যেতে হবে। অনেকের যাওয়া রোধ করার জন্যে আপনার যাওয়া দরকার। ভাবুন দুর্যোধনবাবু। ভেবে বলুন। অপরাধীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে—আর বাড়াবেন না। দরকার নেতার। আপনার মতো। হৃদয়বান।"
উঠে দাঁড়ালেন দুর্যোধন—"কথা দিলাম।"
উঠে দাঁড়াল ইন্দ্র "আপনার প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।" চোখের ইঙ্গিত করতেই বেরিয়ে গেলেন সঞ্জয় ভঞ্জ—"উনি আর-ডি-এক্স বসানোয় এক্সপার্ট। স্কুটারে যা বসিয়েছিলেন কালরাতে, আজ সকালেই তা আমি ধরেছি—গ্যারেজের কড়ায় তার জড়াতে ভুলে গেছিলেন—সন্দেহ হয়েছিল প্রকাশবাবুর। আমি গিয়ে দেখেছিলাম আর-ডি-এক্স। সঞ্জয়বাবু এসেছেন খোদার উপর খোদকারি করার জন্যে।"
ধ্বসা চোখে চেয়ে রইলেন দুর্যোধন মাহাতো।
ঘরে ঢুকলেন সঞ্জয় ভঞ্জ। হাত মুছলেন রুমালে।
বললে ইন্দ্র—"স্কুটারের আর-ডি-এক্স বসিয়ে এসেছিলেন আপনার গাড়ির বনেটের তলায়—ইগনিশন চাবি ঘোরালেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন—প্রমাণের দরকার হত না। শঠে শাঠ্য সমাচরেৎ—শাস্ত্রের বচন, দুর্যোধনবাবু আসুন—ও হ্যাঁ, নেমন্তন্নটা নিয়ে যান। শুভবিবাহ। অচেতন বরাটকে ফাঁসি দেবে সন্ধ্যা আচার্য। মনোহরের আশ্রিতা বোন—নো অবৈধ সম্পর্ক। অনেক খেলেছে, অনেক নাচিয়েছে—এখন ও ক্লান্ত। শুভরাত্রি।"
তিন মহিলাই এবার হেসে উঠল তিনরকম সুরে। গাড়িতে ওঠার সময়ে ডি. এফ. ও. বললেন প্রকাশকে "তোমার মতো অনেস্ট আর ডেয়ারডেভিল অফিসার যদি আর জনাকয়েক পেতাম—"
"প্রমোশনটা অন্তত দিন," বলে উঠল ইন্দ্রনাথ।
"কাঁচা মাংসখেকো আদিবাসীদের কাছে উনি ছাড়া কেউ যেতে পারেন না—ডেথ-হাউসের ঠিকানা উনিই তো বের করলেন—ওই আদিম বাসিন্দাদের এলাকায়। হাওয়ার গতির খবর উনিই দিয়েছেন। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন মাংসপোড়ার তেলচর্বি হাওয়ায় ভেসে জঙ্গলের ওদিকে যেতে পারে না—শঙ্খচূড়ের শ্মশানে পৌঁছেছিল যেদিক থেকে—সেদিকে উনিই নিয়ে গেছিলেন আমাদের।"
"রণ চৌধুরীকে দুর্যোধন মাহাতোর বাড়িতে নিয়ে গেলে না কেন?" জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।
"মাঝে মাঝে বড় বোকা হয়ে যাও, মৃগ। যাঁকে একবার মারতে গিয়েও মারতে পারেননি—বাড়ির মধ্যে তাঁকে দেখলে পিছনে লোক লাগাতেন দুর্যোধন—ডেথ-হাউস আবিষ্কার করা শিকেয় উঠত।"
"সন্ধ্যাকে কে উদ্ধার করে আনল?"
"প্রকাশ ঘটক। সঙ্গে আমি। সন্ধ্যাকে পাশের কোয়ার্টারে নিয়ে গেল আগে—আমি পাঠিয়ে দিলাম কবিতা আর চিত্রাকে—নাটকের বাকি অংশটা ওরা নিজেরাই রিহার্সাল দিয়ে নিয়েছে। মৃগ, মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে বেশি হয়—যদিও তুমি তা মানো না।"
"আমি শুধু জানি হাজার বছর আগেকার অস্ত্র এখনও মেয়েরা কাজে লাগাচ্ছে।"
জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন অতিথিরা।
বললাম—"ভুরুর ধনুক আর চোখের তীর।" ♣

সম্পূর্ণ গোয়েন্দা উপন্যাস

# ছাতা-পূজারীর অ্যাডভেঞ্চার

অদ্রীশ বর্ধন

বেকার স্ট্রিটের বসবার ঘরে বসে অনেক অদ্ভুত টেলিগ্রাম পেতে আমরা অভ্যস্ত। একটা টেলিগ্রাম এসেছিল বিচিত্র এক কেসের সূচনা স্বরূপ—যে কেস মিস্টার শার্লক হোমসের কেসপঞ্জীর মধ্যে অতুলনীয় স্থান দখল করে থাকবে চিরকাল।

ডিসেম্বরের এক হিমশীতল অপরাহে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল, চারদিক অন্ধকার হয়ে ছিল। রিজেন্ট পার্কে বেড়াচ্ছিলাম হোমসের সঙ্গে। কথা হচ্ছিল আমার কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে—যা শুনিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাই না পাঠককে। চারটে নাগাদ ফিরে যখন এলাম আরামের বসবার ঘরে, মিসেস হাডসন এলেন একগাদা চা-জলখাবার নিয়ে—সঙ্গে একটা টেলিগ্রাম। শার্লক হোমসের নামে। বয়ানটা এইরকম ঃ

"ছাতা পূজা করে, এমন পুরুষ জীবনে দেখেছেন? স্বামীরা অসঙ্গত হয়। সন্দেহ হচ্ছে, হিরে নিয়ে ছলচাতুরি চলছে। চা-পানের সময়ে আসব। মিসেস গ্লোরিয়া ক্যাবপ্লেজার।"

শার্লক হোমসের কোটরাগত চোখে আগ্রহ-দ্যুতির ঝিলিক দেখে আমার খুব আনন্দ হলো।

অস্বাভাবিক খিদের তাড়না দেখিয়ে বসল খাবারের ওপর। কাঁটা-চামচ দিয়ে মাখন মাখানো গরম গোল কেক আর ফলের চাটনি খোঁচাতে খোঁচাতে বললে—"এটা কী? এটা কী?... হাইগেট পোস্টঅফিসের ছাপ রয়েছে। জায়গাটা মানুষদের জন্যে নয়। টেলিগ্রাম ছাড়া হয়েছে তিনটে-সতেরো মিনিটে। ওয়াটসন, চোখ মেলে একটু দ্যাখো।"

সময়টা আরও সঠিক করে বলা যাক। ১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস শেষ হতে চলেছে। তখন আমি বেকার স্ট্রিটে থাকতাম না। কিন্তু এসেছিলাম পুরোনো ডেরায় দিন কয়েক কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে। এই বছরে শার্লক হোমসের যে ক'টা কেস লিখে রেখেছিলাম আমার নোটবুকে, তার মধ্যে একমাত্র মিসেস রোনডার-এর কেস বৃত্তান্ত আমি পাঠকের সামনে হাজির করেছিলাম বটে, কিন্তু সে কেসে হোমসের ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রকাশের সুযোগ ছিল যৎসামান্য।

তাই স্বল্পমেয়াদী উপবাস আর হতাশায় ভুগছিল হোমস। চোখের সামনে ভাসছে শেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত ওর কৃশকায় মুখচ্ছবি। যার অসাধারণ ধীশক্তি নিগূঢ় প্রহেলিকা সমাধানের সুযোগ না পাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে, আমার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্যাবলী তার সামনে উপস্থিত করি কি করে?

টেলিগ্রামটা ছিনিয়ে নিয়ে ফের পড়তে পড়তে বললে হোমস, "নামটা অদ্ভুত। নামটা জবর। গ্লোরিয়া ক্যাবপ্লেজার। লন্ডন শহরে এই নামে দুজন মহিলা থাকলেও থাকতে পারেন। যদিও তাতে আমার সন্দেহ আছে।"

"তার মানে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে তোমার পূর্বপরিচয় আছে?"

"না, না। জীবনে এই নামের কাউকে দেখিনি। তা সত্ত্বেও, মনে হচ্ছে হয়তো ইনি কোনও বিউটি স্পেশ্যালিস্ট—যিনি কিনা....যাকগে সেকথা, তোমার কি মনে হচ্ছে তা বলো।"

"কিম্ভূত ঘোঁট পাকানো এমন একটা ব্যাপার যা তোমার কাছে পরম প্রিয়। 'ছাতা পূজা করে, এমন পুরুষ জীবনে দেখেছেন?' কঠিন সমস্যা।"

"খাঁটি কথা বলেছ, ওয়াটসন। কোনও মহিলা বড় বড় ব্যাপারে যতই খরচে হোক না কেন, ছোটখাট ব্যাপারে টিপে টিপে চলেন। শব্দচয়নের ব্যাপারে খুবই মিতব্যয়ী এই মিসেস ক্যাবপ্লেজার ভদ্রমহিলা। এতই মিতব্যয়ী যে উনি নিজেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন আমার কাছে।"

"আমার কাছেও গোটা টেলিগ্রামটা একটা ধোঁয়াটে ব্যাপার।"

"কি বলতে চাইছেন টেলিগ্রামে? বিশেষ এক পুরুষ বিগ্রহ বানিয়েছে ছাতাকে? ছাতাই তার কাছে ঈশ্বর? আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস? অথবা, উপজাতিরা যেমন স্রেফ বিশ্বাসের বশে বিগ্রহ-পুজো করে যায়—তত্ত্বগতভাবে সঠিক না হলেও ইনিও হয়তো ছাতা-পুজো করেন এই ঝড়-বাদলা প্রশমনের জন্যে? যদিও ভদ্রলোক ইংরেজ? চুলোয় যাক, কি সিদ্ধান্তে আসা যায় হে?"

"টেলিগ্রাম থেকে সিদ্ধান্তে আসতে চাও?"

"অবশ্যই।"

একটু হাসবার সুযোগ পেয়ে ভালই লাগল। ওই সময়ে বাতের ব্যথায় বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম। নিজেকে বুড়োটে বুড়োটে মনে হচ্ছিল।

বলেছিলাম—"হোমস, সিদ্ধান্তে হয়তো আসা যাবে না। বড় জোর অনুমান করা যেতে পারে।"

"থাম। অনুমান আমি করি না, কতবার বলেছি তোমাকে? অভ্যেসটা খুব খারাপ। যুক্তিবৃত্তি ধ্বংস করে ছাড়ে।"

"ভায়া হোমস, তোমার নিজস্ব নীতিগর্ভ এই শিক্ষাবিজ্ঞান যদিও বা আয়ত্ত করি, তবুও বলব, যুক্তিবাদীর কাছে এই টেলিগ্রাম কোনও সুযোগ এনে দিচ্ছে না। কারণ একটাই ঃ টেলিগ্রামটা অতিশয় সংক্ষিপ্ত আর নৈর্ব্যক্তিক—ব্যক্তিগত উল্লেখ একেবারেই নেই।"

"তাহলে আর না বলে পারছি না, তুমি ভুল পথে চলেছ।"

"গোল্লায় যাও, হোমস—"

"হে বন্ধু, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করো। ডজন খানেক পাতা জুড়ে কেউ যখন চিঠি লেখেন, তখন তিনি তাঁর আসল চেহারাটা শব্দের ধূম্রজালে ঢেকে রেখে দিতে পারেন। শব্দের বেড়াজাল টপকে লোকটার প্রকৃতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর লিখনশৈলী যদি কাটছাঁট হয়, তাঁকে জানা যায় নিমেষে। পাবলিক বক্তাদের ক্ষেত্রে এরকম মন্তব্য তুমি করেছিলে।"

"কিন্তু ইনি যে নারী।"

"ফলে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করছে বিষয়টা। কিন্তু আমি যে চাই তোমার মতামত। এস বন্ধু, এস! সেয়ানাপনায় তুমি একটা বিশেষ স্থান দখল করে রয়েছো। বিশেষ এই গুণটা খাটাও টেলিগ্রামের ওপর।"

দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান পেলে কি স্থির থাকা যায়? স্ফীত হয়েছিলাম আত্মপ্রসাদে। তোষামোদে চিঁড়ে গলে যায়। মনে পড়ে গেছিল, অতীতে আমি বহুবার দেখিয়ে দিয়েছি, নিতান্ত নিষ্কর্মা আমি নই—ওর কাজে সহায় হতে পেরেছি। তাই চনমনে করে নিলাম মগজের কোষগুলোকে।

বললাম—"বলছ যখন, তখন মুখ খোলা যাক। মিসেস ক্যাবপ্লেজার ভদ্রমহিলা বিলক্ষণ অবিবেচক। কনফার্মেশন ছাড়াই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বসলেন। তোমার সময়টা ওঁরই সময়, এই ধারণায় ভুগছেন।"

"দারুন বলেছো, ওয়াটসন। এক-একটা বছর যাচ্ছে, তোমার ব্রেন আরও খুলছে। আর কি বুঝলে?"

প্রেরণা তাতিয়ে দিয়েছিল আমাকে।

বলেছিলাম—"শব্দ নিয়ন্ত্রণ করে বার্তা-কে যখন এতই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তখন 'মিসেস' শব্দটা না ঢোকালেই চলতো। বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। ব্যস, আর কিছু মাথায় আসছে না।"

"আরে ভায়া, যা বললে, তাই বা কম কী?" বলতে বলতে ন্যাপকিন নিক্ষেপ করে করযুগল যুক্ত করেছিল শার্লক হোমস—শব্দ না করে। —"এবার হোক বিশ্লেষণ। আমি কান পেতে রইলাম।"

"মিসেস গ্লোরিয়া ক্যাবপ্লেজার কনে বউ হওয়ার চৌকাঠ সবে পেরিয়েছেন। তাই সদ্য বিয়ের পরের নতুন নামের টাটকা গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে রয়েছেন। এতই মদমত্ত অবস্থা যে পুঁচকে এই বার্তায় গুঁতিয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তাজা বিয়ের সুবাস। মিসেস....উনি কিনা মিসেস....মিস আর নেই। সদ্য মিসেস হলে এইভাবে জাহির করাটা খুবই স্বাভাবিক, হোমস। বিশেষ করে পরিণয়-বন্ধনে পরম সুখী পরমাসুন্দরী ললনারা—"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবে দয়া করে বর্ণনা বাদ দাও, পয়েন্টে চলে এস।"

"যাচ্চলে! আরে ভায়া, যা নির্জলা সত্যি, তা তো বলতেই হবে। যা বললাম, তা আমার সবিনয় সিদ্ধান্তের সমর্থক। মেয়েটা নিতান্তই

অবিবেচক, বরের আদরে ফুলে বেলুন হয়ে গেছে।"

মাথা নেড়ে গেল কিন্তু শার্লক হোমস। মনঃপূত হয়নি আমার সিদ্ধান্ত।

বললে—"না, বন্ধু, না। সদ্য বিয়ের সুখের সাগরে ভাসমান অবস্থায় যে অতীব্র অহঙ্কার পেয়ে বসে সব মেয়েকেই, সেই গর্ব যদি এঁর মধ্যে থাকত, তাহলে স্বাক্ষরটা হতো এইরকম : 'মিসেস হেনরি ক্যাবপ্লেজার', অথবা, 'মিসেস জর্জ ক্যাবপ্লেজার', অথবা, তাঁর প্রিয় স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া নতুন পদবী। তবে হ্যাঁ, ওয়াটসন, একটা বিষয়ে তুমি সঠিক। একটা ব্যাপার বেশ খাপছাড়া—খটকা জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট—সেটা এই 'মিসেস' শব্দটা। বড্ড বেশি জোর দিয়েছেন উপাধিটার ওপর।"

"ভায়া হোমস!"

আচমকা উঠে দাঁড়িয়েছিল বন্ধুবর। গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর হাতল-চেয়ারের সামনে। গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফায়ার প্লেসের অগ্নি ঘরকে কবোষ্ণ করে রেখে দিয়েছে, বিষণ্ণ তমিস্রা বুকে নিয়ে ঝুপঝুপ করে বারিধারা আঘাত হেনেই চলেছে জানলার কাচে।

চেয়ারে কিন্তু বসেনি হোমস। ললাট কুঞ্চন দেখেই বুঝেছিলাম বুদ্ধিবৃত্তিকে সূচ্যগ্র বিন্দুতে সংহত করছে। খুব আস্তে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল চিমনি-পিসের ডানদিকে। আবেগের বন্যা বয়ে গেছিল আমার অণু-পরমাণুতে, রোমাঞ্চিত হয়েছিল কলেবর—শার্লক হোমস বেহালা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ওর প্রাণপ্রিয় বহুকালের সঙ্গী সেই স্ট্র্যাডিভেরিয়াস বেহালা—বিষাদের মেঘ মেজাজ খিটখিটে করে রাখায় যে বেহালা ও ছোঁয়নি বেশ কয়েক সপ্তাহ।

আলো পিছলে গেল সাটিন-সদৃশ কাঠের ওপর দিয়ে। চিবুক দিয়ে বেহালা চেপে ধরে ছড়িতে টান দিল শার্লক হোমস।

পরক্ষণে হলো দ্বিধাগ্রস্ত। নামিয়ে রাখল বেহালা আর ছড়ি। গর্জে উঠল খেঁকি কুকুরের মতো।

"নাহে। যথেষ্ট সত্য এখনও হাতে আসেনি। গোড়ায় গোঁজামিল হয়ে যাবে যদি মূল সত্য ছাড়া তত্ত্ব কপচাতে যাই।"

বলে ফেললাম—"টেলিগ্রাম বিশ্লেষণ করে আমি যে সিদ্ধান্তে এসেছি, তুমিও তাহলে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছলে?"

"টেলিগ্রাম?" এমন স্বর-বিস্ফোরণ ঘটালো হোমস যেন শব্দটা কখনও শোনেইনি।

"আরে হ্যাঁ। কোনও পয়েন্ট কি চোখ এড়িয়ে গেছে আমার?"

"ওয়াটসন, আমার তো মনে হয়, তুমি প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেই ভুল করে বসেছো। এই টেলিগ্রাম যে নারী পাঠিয়েছেন, তাঁর বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে, প্রথম যৌবনা তিনি এখন নন। এঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন হয় স্কটল্যান্ডে, নয় আমেরিকায়। শিক্ষিতা মহিলা। অবস্থাপন্ন। বিয়েটা কিন্তু সুখের হয়নি। উদ্ধত, প্রভুত্ব খাটানোর প্রবণতা আছে। খুব সম্ভব, বেশ সুশ্রী। এই হলো গিয়ে আমার তুচ্ছ কিন্তু সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, হয়তো কাজ হবে এতেই।"

মাস কয়েক আগে হলে শার্লক হোমসের এই মেজাজী চেহারা, হুঁশিয়ার আর সতর্ক কথাবার্তা, বিদ্রূপতীক্ষ্ণ চক্ষুভঙ্গিমা নিশ্চয় উপাদেয় ঠেকত আমার কাছে। সেদিন কিন্তু আমি প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করেছিলাম তুষারধবল চাদর-ছাওয়া টেবিলে—নেচে উঠেছিল উজ্জ্বল নকশাকাটা চৈনিক বাসন।

"হোমস, এবার কিন্তু তোমার পরিহাস প্রাণান্তিক হয়ে উঠছে। বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!"

"মাই ডিয়ার ওয়াটসন, ক্ষমা করে দাও। তুমি যে এত সিরিয়াস হয়ে যাবে, তা—"

"আরে রাখো। লোকে জানে, নিচু মহলের মানুষই শুধু থাকে হ্যাম্পসটেড আর হাইগেট অঞ্চলে—জায়গাদুটোর নাম উচ্চারণেও 'হ' বাদ দেওয়া হয়। তামাশা জুড়েছো এমন এক দীন-দুঃখী অল্পশিক্ষিতা স্ত্রীলোককে নিয়ে যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে হয়তো উপবাস!"

"মোটেই তা নয়, ওয়াটসন। অল্পশিক্ষিতা কোনও স্ত্রীলোক 'অসঙ্গত' আর 'ছলচাতুরি' শব্দ দুটো লিখতে গেলে বানান ভুল করলেও করতে পারে। একইভাবে বলা যায়, মিসেস ক্যাবপ্লেজার যখন সন্দেহ করছেন হিরে নিয়ে ছলচাতুরি চলছে, তখন আমরা ধরে নিতে পারি, ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁটে তাঁকে খেতে হয় না।"

"বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে? বিয়েটা কিন্তু সুখের হয়নি? জানলে কি করে?"

"ওয়াটসন, আমরা যে যুগে বাস করছি, সে যুগে যে যে-রকম, তার ব্যবহারও সেইরকম হয়। এই ঔচিত্যবোধ সম্পর্কে আমি সজাগ থাকি, তা তো তুমি জানোই।"

"আরে গেল যা। তার সঙ্গে এই ব্যাপারের কী সম্পর্ক?"

"বেশ কয়েক বছর আগে বিয়ে যাঁর হয়েছে, শুধু এমন নারীই এত সুস্পষ্টভাবে, পোস্ট অফিসের কেরানীর চোখের সামনে, টেলিগ্রামে লিখতে পারেন তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের কথা—'স্বামীরা অসঙ্গত হয়'। প্রভুত্বব্যঞ্জক প্রকৃতি আর অসুখী থাকার গন্ধ কি পাচ্ছ না? এবার আসা যাক দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে : যেহেতু ছলচাতুরির অভিযোগ এনেছেন খোদ স্বামীর বিরুদ্ধেই—এ বিয়ে যে সুখের হয়নি, তা কী আরও খোলসা করে বলতে হবে?"

"কিন্তু ওঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন হয় স্কটল্যান্ডে, নয় আমেরিকায়? জবাব দাও।"

"টেলিগ্রামটা দ্যাখো। স্কচ অথবা আমেরিকানরাই শুধু লেখেন—'will call upon you', শিক্ষা থাকুক আর না থাকুক, যে কোনও ইংরেজ মহিলা লিখতেন—'Shall call upon you'। জবাব পেয়েছো?"

"দাঁ-দাঁড়াও! তুমি বললে, ভদ্রমহিলা 'বেশ সুশ্রী'। কল্পনা নয়—যেন, ঘটনা। কিভাবে বললে?"

"আরে, আমি তো তার আগেই বলেছি, 'খুব সম্ভব'। সম্ভাবনার এই অনুমিতি কিন্তু টেলিগ্রাম থেকে পাইনি।"

"তাহলে কোত্থেকে পেলে?"

"শান্ত হও। তোমাকে তো বলেই ছিলাম, হয়তো ইনি কোনও বিউটি স্পেশ্যালিস্ট। এই পেশা যে মহিলারা গ্রহণ করেন, তাঁরা নিজেরা কদাচ কদাকার হন—নইলে যে বিজ্ঞাপন জমে না—নিজেদের রূপলাবণ্য দিয়ে পেশার বিজ্ঞাপন দিয়ে যান। ওহে ওয়াটসন, মক্কেল মহিলা এসে গেছেন বলেই তো মনে হচ্ছে।"

নিচের তলায় দ্বিধাহীন জোর ঘণ্টাধ্বনি শুনলাম। তারপর একটু বিরতি। ল্যান্ডলেডি নিশ্চয় তাঁকে নিয়ে আসছেন বসবার ঘরে। বেহালা আর ছড়ি সরিয়ে রেখে মিসেস গ্লোরিয়া ক্যাবপ্লেজারের ঘরে ঢোকার প্রতীক্ষায় রইল শার্লক হোমস।

এলেন তিনি। বাস্তবিকই বেশ সুশ্রী। দীর্ঘাঙ্গী, মর্যাদা সচেতন, হাবভাব প্রায় রানীর মতো, হয়তো রীতিমতো উদ্ধত, মাথায় একরাশ পেতল-রঙিন চুল, নীলবর্ণ চোখ বিলক্ষণ শীতল। পরনে মূল্যবান গাঢ় নীল মখমল গাউনের ওপর নকুল-লোমের কোট। মাথায় ধূসর পশমের হ্যাট—তার ওপর একটা মস্ত শ্বেত বিহঙ্গর সূচিকর্ম।

আমি এগিয়ে গেছিলাম ভদ্রতার খাতিরে নকুল-লোমের কোটটা নিয়ে যথাস্থানে রাখব বলে—বিষম অবজ্ঞায় আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না ভদ্রমহিলা। হোমস অবশ্য সহজ সৌজন্য রক্ষা করে গেল—পরিচয় পর্ব সাঙ্গ করে নিল।

আমাদের সামান্য ঘরদোরে চোখ বুলিয়ে নিলেন মিসেস ক্যাবপ্লেজার। অখুশি যে হয়েছেন, তা প্রকট হলো চাহনির মধ্যে। ফায়ার প্লেসের সামনে পাতা ভালুকের চামড়া—যথেষ্ট বয়স হয়েছে বস্তুটার। কেমিক্যাল টেবিলে অ্যাসিডের অজস্র দাগ। এতৎসত্ত্বেও আমার আর্ম-চেয়ারে বসতে অরাজী হলেন না। সাদা দস্তানা পরা দু-হাত একত্র করে রাখলেন কোলের ওপর।

কথা বললেন বিনয়-নম্র ভাবে, কিন্তু কুলিশকঠোর কাটছাঁট গলায়—"ওয়ান মোমেন্ট, মিস্টার হোমস। আমার কাজের ভার আপনাকে দেওয়ার আগে জানতে চাই আপনার পেশাদারি

দক্ষিণা কত।"

ক্ষণেক যতি দিয়ে জবাবটা দিল হোমস।

"দক্ষিণা আমার কমে বাড়ে না—যদি না একেবারেই ছেড়ে দিই।"

"মিস্টার হোমস, দুর্বল দরিদ্র নারীর কাছে সুযোগ নিতে চাইছেন মনে হচ্ছে। এই কেসে তা হতে দেব না।"

"তাই নাকি, ম্যাডাম?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি পেশাদার স্পাই হিসেবে কাজে লাগাতে চাই। পাছে আপনি বেশি চেয়ে বসেন, তাই আগেভাগেই জেনে নিতে চাই আপনার সঠিক দক্ষিণা।"

চেয়ার ছেড়ে সটান উঠে দাঁড়াল শার্লক হোমস। বললে স্মিত মুখে—"আমার এই ক্ষুদ্র প্রতিভা আপনার সমস্যা সমাধানে হয়তো পাবেন না। কষ্ট করে এলেন, তার জন্যে দুঃখিত। গুড-ডে, ম্যাডাম। ওয়াটসন, অতিথিকে অনুগ্রহ করে নিচের তলায় নিয়ে যাবে?"

"থামুন!" সজোরে অধর দংশন করে ফেললেন মিসেস ক্যাবপ্লেজার।

দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফের চেয়ারে বসে পড়ল হোমস।

"মিস্টার হোমস, দরাদরির মধ্যে আপনি যেতে চান না। কিন্তু যখন শুনবেন, কেন আমার স্বামী পুতুল পুজোর মতো ধ্যানেজ্ঞানে আরাধনা করে যায় একটা বাজে নোংরা ছাতাকে, এমনকি রাতেও চোখের সামনে থেকে ছাতা সরাতে চায় না—তখন নিশ্চয় সমস্যা প্রতিবিধানের দক্ষিণা দশ শিলিং থেকে এক গিনি পর্যন্ত হতে পারে।"

হোমসের মনে আঘাত লেগেছিল নিশ্চয়। কিন্তু নতুন সমস্যার আবির্ভাবে মানসিক উপবাস তিরোহিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে প্রদীপ্ত হলো চক্ষু।

"বলেন কী! আক্ষরিক অর্থে ছাতা-পুজো করেন তাহলে আপনার স্বামী?"

"তাই তো বললাম।"

"তাহলে তো বলতে হয় সেন্টিমেন্টের দিক দিয়ে এ ছাতা বেশ দামি তাঁর কাছে? অথবা, ছাতা হিসেবে অসামান্য বলেই জিনিসটার বাজারদর আছে বিলক্ষণ—নজরছাড়া করতে চান না সেই কারণেই?"

"ননসেন্স! আড়াই বছর আগে এই ছা' উনি কিনেছিলেন টটেনহ্যাম কোর্ট রোডের একটা দোকান থেকে মাত্র সাতষট্টি পেনি দিয়ে—আ' তখন ছিলাম সঙ্গে।"

"কিন্তু হয়তো কোনও ব্যক্তিগত ঝোঁক থাকার ফলে—"

ধূর্ততা ঝলসে উঠল মিসেস গ্লোরিয়া ক্যাবপ্লেজারের দুই চোখে।

"তা নয়, তা নয়, মিস্টার হোমস। আমার স্বামী স্বার্থপর, অমানুষ, মহত্ত্বহীন। মামার বাড়ির দিক দিয়ে আমার প্রপিতামহ ছিলেন অ্যাবারডিনশায়ারের দ্য ম্যাকরিয়া অফ ম্যাকরিয়া। সেই ধারা রক্ষে করে চলুক আমার স্বামী, আমি তা চাই—সে চেষ্টাও করেছি। কিন্তু স্বভাবেই শুধু উচ্ছৃঙ্খল নয় মিস্টার ক্যাবপ্লেজার, কারণ বিনা কোনও কাজই করে না।"

গম্ভীর হয়ে গেল হোমস।

"অমানুষ? স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খল? খুব কড়া কড়া কথা বলছেন। উনি কি আপনার প্রতি নির্দয়?"

অতিশয় উদ্ধত ভঙ্গিমায় ভুরুযুগল উত্তোলন করলেন মিসেস ক্যাবপ্লেজার।

"নির্দয় নয়, তবে হতে যে চায়, সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। জেমস অস্বাভাবিক বলবান বর্বর। মাথায় মাঝারি, ফিগার লতাগাছের খুঁটির মতো। পুরুষ জাতটার অহঙ্কারে বলিহারি যাই। মুখে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই যা মন টানতে পারে—যার বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। অথচ অতিরিক্ত দেমাকে ফেটে পড়ে গোঁফ নিয়ে। ভীষণ পুরু, ভীষণ চকচকে বাদামি গোঁফ—ঘোড়ার নালের মতো বেঁকে নেমে এসেছে মুখের দু'পাশ দিয়ে। বেশ কয়েক বছর ধরেই লালনপালন করছে এই গোঁফকে— ছাতার পরেই গোঁফ যেন ওর জীবনদেবতা—"

"ছাতা।" স্বগতোক্তি করেছিল হোমস—"ছাতা! মাপ করবেন, ম্যাডাম। আমি কিন্তু চাই আপনার স্বামীর স্বভাবের আরও বিশদ বর্ণনা।"

"দেখতে ঠিক পুলিশ কনস্টেবলের মতো।"

"কি বললেন?"

"গোঁফটার জন্যে।"

"মদ পান করেন কি? অন্য নারীর প্রতি আসক্তি আছে কি? জুয়ো খেলেন? যথেষ্ট টাকাপয়সা দেন না আপনাকে? সেকী, কোনোটাই নয়?"

পাল্টা শেল বর্ষণ করলেন মিসেস ক্যাবপ্লেজার বেশ ঘাড় বেঁকিয়ে— "আপনি তো দেখছি শুধু প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী জানতেই ইচ্ছুক? কেন তা বুঝিয়ে দিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার মুখেই ব্যাখ্যা শুনতে চাই। আমার যা বলবার আমি বলছি। আপনার শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলতে কি দেবেন?"

হোমসের পাতলা ঠোঁট শক্ত হয়ে গেল—"বেশ তো, বলুন।"

"আমার স্বামী 'ক্যাবপ্লেজার অ্যান্ড ব্রাউন' কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার। হ্যাটন গার্ডেনের সেই বিখ্যাত হিরের ব্যবসায়ী। আমাদের বিবাহিত জীবনের পনেরো বছরে—ইয়ে। পনেরো দিনের বেশি কখনও ছাড়াছাড়ি থাকিনি—গতকালের অত্যন্ত অশুভ ঘটনাটাই একমাত্র ব্যতিক্রম।"

"গতকালের ঘটনা?"

"ইয়েস, স্যার। গতকাল বিকেলে জেমস ফিরে এল আমস্টারডাম আর প্যারিসে ছ'মাস বিজনেস জার্নি করে—আরও বেশি পৌত্তলিক হয়ে—ছাতা-বিগ্রহ এখন তার নয়নের মণি। সারা বছরে ছাতা-পুজোর এত ধুম দেখিনি।"

দশ আঙুলকে ডগায় ডগায় ঠেকিয়ে, দু-পা সামনে ছড়িয়ে বসেছিল শার্লক হোমস। সামান্য চমকে উঠল শেষের কথায়।

"সারা বছরে? একটু আগেই কিন্তু বলেছেন, মিস্টার ক্যাবপ্লেজার ছাতাটা কিনেছিলেন আড়াই বছর আগে। তাহলে কি ধরে নেব, ছাতা-পুজো শুরু হয়েছে ঠিক এক বছর আগে?"

"হ্যাঁ, তা ধরতে পারেন।"

"ইঙ্গিতময়—খুবই ইঙ্গিতময় বিবৃতি!" বন্ধুবরের ললাটকুঞ্চনে চিন্তার আবিলতা প্রকট হলো—"কিন্তু ইঙ্গিতটা কিসের? আমরা—ওয়াটসন, হলো কী? এত অস্থির হয়ে উঠলে কেন?"

হোমস না চাইলে সচরাচর আমার মতামত জাহির করতে যাই না। কিন্তু সেদিনের সেই মুহূর্তে ব্যক্ত হওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

বলেছিলাম বিষম উত্তেজনায়—"আরে ভায়া, এটা কি একটা হেঁয়ালি হলো? এ তো জলের মতো সোজা! জিনিসটা তো একটা ছাতা, হ্যান্ডলটাও বেঁকা, নিশ্চয় খুবই মোটা হ্যান্ডল। ফোঁপরা হ্যান্ডেলের মধ্যে, অথবা ছাতার অন্য কোথাও হিরে অথবা অন্য দামি জিনিস লুকিয়ে রাখা তো খুবই সোজা ব্যাপার।"

মিসেস ক্যাবপ্লেজার আমার দিকে ফিরেও চাইলেন না। বললেন—"মিস্টার হোমস, সমাধানটা যদি এত সহজ হতো, তাহলে কি আপনার কাছে আমার আসার দরকার হতো?"

ঝটিতি বললে হোমস—"ব্যাখ্যাটা তাহলে সঠিক নয়?"

"একেবারেই নয়। বুদ্ধি আমার বিলক্ষণ ধারালো, মিস্টার হোমস", পাশ থেকে ভদ্রমহিলার সুশ্রী মুখাকৃতি ছুরির মতোই ধারালো বটে— "বিলক্ষণ ধারালো। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর ধরে আমি বন্ড স্ট্রিটের ম্যাডেম ডুবারি-র বিউটি পার্লারের প্রেসিডেন্ট হয়ে আছি। ক্যাবপ্লেজার পদবীটাকে খোলাখুলি কাজে লাগাচ্ছি কেন? 'ম্যাকরিয়া অফ ম্যাকরে' তাতে বাদ সাধছেন না কেন? আদ্যিকালের কৌতুক-রস যার মধ্যে আছে, এই নাম দেখলেই সে থমকে দাঁড়ায়, একটানা একটা মন্তব্য করে।"

"তাই নাকি?"

"মক্কেল যারা হয়ে রয়েছে, অথবা হতে

দশ আঙুলকে ডগায় ডগায় ঠেকিয়ে বসেছিল শার্লক হোমস।

চলেছে—তাদের প্রত্যেকেই নামটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। হাসে বটে, কিন্তু নামটা মনে গেঁথে যায়।"

"ঠিক ঠিক, জানলায় এ নামের বোর্ড দেখেছি বটে। কিন্তু আপনি তো ছাতা প্রসঙ্গে কথা বলছিলেন।"

"মাস আষ্টেক আগে এক রাতে আমার শোবার ঘর থেকে স্বামীর শোবার ঘরে পা টিপে টিপে ঢুকেছিলাম। সে তখন ঘুমিয়ে কাদা। খাটের পাশ থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে চলে এসেছিলাম নিচের তলায় কারিগরের কাছে।"

"কারিগর?"

"ছাতা তৈরির কারখানায় কাজ করে। হাইগেট-এর 'দ্য আরবার' পাড়ার 'হ্যাপিনেস ভিলা'য় তাকে ডেকে এনেছিলাম। ছাতার ভেতর পর্যন্ত দেখবার জন্যে। পুরো ছাতাটিকে টুকরো টুকরো করে ফের জুড়ে দিয়েছিল লোকটা—ধরতেই পারেনি আমার স্বামী ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার পর। ভেতরে কিছুই লুকোনো ছিল না, এখনও নেই, পরেও থাকবে না। জঘন্য নোংরা ছাতা ছাড়া আহামরি কিছু নয়।"

"পয়মন্ত বলেই হয়তো ছাতার এত আদর।"

"ঠিক উল্টো। জেমসের দু-চক্ষের বিষ এই ছাতা। বেশ কয়েকবার তো আমাকেই বলেছে—'মিসেস ক্যাবপ্লেজার, এই ছাতাই আমাকে মারবে। অথচ ছাতা ছাড়া থাকতে পারব না'।"

"বটে! বটে! বটে! আর কিছু বলেননি?"

"একেবারেই না। পয়মন্ত ছাতাই যদি হবে তো মাঝে মাঝে যখন ছাতা ভুলে ফেলে যায় বাড়িতে অথবা অফিসে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে, ভয়ানক আতঙ্কে অমন চেঁচিয়ে ওঠে কেন? দৌড়ে যায় কেন ছাতা বগলদাবা করতে? নির্বোধ যদি না হন, মিস্টার হোমস, এই থেকেই একটা ধারণা গড়ে নিতে পারেন। কিন্তু আমি তো দেখছি, এ ধাঁধার সমাধান আপনার বুদ্ধির নাগালের বাইরে।"

রাগে, অপমানে ধূসর হয়ে গেল শার্লক হোমস।

বললে—"ভারি তো ধাঁধা, এ আমার হাতের ময়লা। তবে হ্যাঁ, করণীয় কী, সেটাই এখনও ঠিক করে উঠতে পারছি না। কারণ, এখনও পর্যন্ত আপনি এমন কোনও ঘটনা নিবেদন করেননি যার ভিত্তিতে বলা যায়, আপনার স্বামী ক্রিমিন্যাল অথবা কোনও দোষে দোষী।"

"ক্রাইম করেনি? গতকালই বেশ কিছু হিরে সরায়নি সিন্দুক থেকে? যে হিরের জয়েন্ট মালিক সে নিজে আর বিজনেস পার্টনার মিস্টার মর্টিমার ব্রাউন?"

ভুরু তুলল হোমস।

"এতক্ষণে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা জানা গেল।"

ঠাণ্ডা গলায় বলে গেলেন সুশ্রী ভিজিটর—"ইয়েস, স্যার। গতকাল বাড়ি ফেরার আগে আমার স্বামী গেছিল অফিসে। তারপর একটা টেলিগ্রাম এল বাড়িতে তার নামে, পাঠিয়েছেন মিস্টার মর্টিমার ব্রাউন। বয়ানটা এই ঃ

"কাউলেস-ডারনিঙহ্যাম-এর হিরের বাক্স থেকে ছাব্বিশটা হিরে সিন্দুক খুলে আপনি নিয়ে গেছেন?"

"হুম। টেলিগ্রামটা তাহলে আপনার স্বামী আপনাকে দেখিয়েছিলেন?"

"না। আমার ন্যায্য অধিকার খাটিয়ে খাম খুলে দেখে নিয়েছি।"

"তারপর স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন টেলিগ্রামের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে?"

"জেনেই যখন গেছি, তখন আর জিজ্ঞেস করতে যাব কেন? সময় নিচ্ছিলাম, সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলাম। কাল শেষ রাতে নাইটগাউন গায়ে দিয়ে পা টিপে টিপে নিচের তলায় নেমে যেতেই আমি পেছন পেছন গেছিলাম—আমি যে আমার ঘরে জেগে বসে আছি, ওকে নজরে রেখেছি, তা ওর মাথায় আসেনি। নিচের তলায় গিয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বাইরে তখন ঘন কুয়াশা। যার সঙ্গে কথা বলে

গেল, তাকে দেখতে পেলাম না। জেমস কথা বলছিল ফিসফিস করে। দুটো কথা শুধু শুনতে পেলাম। 'বেস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটার আগেই গেটের সামনে থাকবে', তারপরেই বললে—'আমাকে ডুবিয়ো না'।"

"শুনে আপনি কি বুঝলেন?"

"আমাদেরই বাড়ির গেটের বাইরে থাকার কথা বলা হচ্ছে! আমার স্বামী রোজ কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাড়ে আটটায় অফিসে রওনা হয়। বেস্পতিবার মানে কাল সকাল! মিস্টার হোমস, জেমস যে ক্রিমিন্যাল ষড়যন্ত্র শুরু করেছে, তার ফল ফলাবে কাল সকালে। আপনি হাজির থাকবেন তাতে বাগড়া দিতে।"

হোমসের দীর্ঘ শীর্ণ আঙুল যেন পাইপের অন্বেষণে এগিয়ে গেল ম্যান্টল সেলফের দিকে, পরক্ষণেই টেনে নিল হাত।

"কাল সকাল সাড়ে আটটায় আলো থাকবে না বললেই চলে।"

"তা নিয়ে আপনাকে তো মাথা ঘামাতে হবে না। আবহাওয়া যে রকমই থাকুক না কেন, পয়সা পাবেন, স্পাইগিরি করবেন। আমি চাই, আগেভাগেই পৌঁছে যান, এবং স্থিরমস্তিষ্কে।"

"ম্যাডাম, আপনি কিন্তু—!"

"আর সময় দিতে পারছি না আপনাকে। আপনার দক্ষিণা যদি অন্যায্য না হয়, আমার হিসেবে যদি ন্যায্য হয়, তাহলে পাবেন—নইলে পাবেন না। গুড ডে!"

দরজা বন্ধ হয়ে গেল মিসেস ক্যাবপ্লেজারের অন্তর্ধান ঘটতেই।

গাল লাল হয়ে গেছিল শার্লক হোমসের—"এই ধরনের ঝামেলা আমি একদিক দিয়ে যেমন চাই না—আর এক দিক দিয়ে তেমনি এই সবের জন্যেই হা-পিত্যেশ করে থাকি।"

ওর মানসিক অবস্থার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে—"হোমস, ভদ্রমহিলা খাঁটি স্কচমহিলা নন মোটেই। আধ-বছরের রোজগার বাজি ফেলে বলতে পারি, 'ম্যাকরিয়া অফ ম্যাকরে' এই মহিলার আত্মীয়ই নন।"

"বেশ তেতে গেছো দেখছি। তোমার নিজের পূর্বপুরুষের নিবাসভূমির প্রসঙ্গ উঠতেই আর তোমাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও, তোমাকে দোষ দিতে পারছি না। মিসেস ক্যাবপ্লেজারের ধরনধারণ সেকেলে মর্চে পড়া ব্যাপার—হাস্যকর। যাক সে কথা, ছাতা-রহস্য ভেদ করা যায় কি করে?"

ঠিক সেই সময়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম জানলার সামনে। দেখেছিলাম, সাদা পাখি আঁকা হ্যাট মাথায় উদ্ধত অসভ্য সেই ভদ্রমহিলা একটা চার চাকার গাড়ির ভেতরে অন্তর্হিত হচ্ছেন। বেকার স্ট্রিট-ওয়াটারলু লাইনের একটা চকলেট-রঙিন অমনিবাস ঘড়ঘড় শব্দে ঘনায়মান সন্ধ্যার আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। অমনিবাসের বাইরের দিকে বসেছিলেন বারোজন প্যাসেঞ্জার—প্রত্যেকেই ছাতা খুলে মাথায় দিয়েছেন নতুন করে বৃষ্টি শুরু হওয়ায়। ছাতার জঙ্গলই শুধু দেখলাম। হতাশ হয়ে ফিরে এলাম জানলার সামনে থেকে।

"কি করবে হোমস?"

"সন্ধে নামছে, দেরি হয়ে গেছে। এখন হ্যাটন গার্ডেনে গিয়ে তদন্ত চালানো ঠিক হবে না—যদিও তদন্ত শুরুর ওই একটা লাইনই দেখতে পাচ্ছি সামনে। মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজার ভদ্রলোক তাঁর চকচকে গোঁফ আর প্রাণপ্রিয় ছাতা নিয়ে সবুর করবেন কাল সকাল পর্যন্ত।"

তাই, পরের দিন সকালে আটটা বাজবার কুড়ি মিনিট আগে বন্ধুর সঙ্গে গেলাম 'হাই গেট' অঞ্চলের 'দ্য আরবার' পাড়ার 'হ্যাপিনেস ভিলা' বাড়ির সামনে। তখনও জানতাম না বজ্রসহ বর্ষা নামবে।

বাইরে যখন নিকষ অন্ধকার, তখন ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়েছিলাম গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে। তারপর বৃষ্টি থেমে গেল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, কনকনে ঠাণ্ডা হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। ছ্যাকড়া গাড়িতে চেপে দুই বন্ধু এসে যখন নামলাম মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ক্যাবপ্লেজারের বাড়ির সামনে, তখন যথেষ্ট ধূসর আলো থাকায় বাড়িটার আশপাশ নজরে এল।

বেশ বড় বাড়ি। রাস্তা থেকে প্রায় তিরিশ গজ ভেতরে, কোমর সমান উঁচু একটা পাথরের দেওয়ালের পেছনে। গথিক স্থাপত্য অনুসারে চুনবালি দিয়ে তৈরি, তার ওপর চুনকাম করা। ছাদের পাঁচিলে গুলি চালানোর ফোকর—স্রেফ ভাঁওতাবাজি। কামান দাগার গম্বুজও রয়েছে—মিছিমিছি বানানো হয়েছে। সামনের দরজাটাও খোপ-কাটা কাঠ দিয়ে বানানো—গথিক খিলেনের ঠিক নিচে। প্রবেশপথ অন্ধকারময় থাকলেও, ওপরতলার দুটো জানলা হলুদবর্ণ ধারণ করে রয়েছে ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে বলে।

শার্লক হোমস ওর প্রিয় হাতাহীন ইনভারনেস কোট গায়ে দিয়ে, মাথায় কান ঢাকা ট্র্যাভেলিং ক্যাপ এঁটে সাগ্রহে চোখ বুলিয়ে নিল চারদিকে।

"চমৎকার!" বড় রাস্তা বরাবর দেওয়াল-সমান উঁচু পাঁচিলে হাত রেখে বললে, "গাড়ির রাস্তা অর্ধচন্দ্রাকার—শুরু হয়েছে পাঁচিলের গেট থেকে, গেছে সামনের দরজার সামনে দিয়ে, একটা সরু রাস্তা মূল রাস্তা থেকে বেরিয়ে গেছে দোকানদারের দরজার সামনে—ফিরে গেছে বড় রাস্তায় দেওয়ালের আর একটা গেট দিয়ে। আমাদের পাশেই রয়েছে সেই গেট। এ আবার কী! দেখেছো, ওয়াটসন?"

"গোলমেলে কিছু কী?"

"ওদিকে তাকাও, ওদিকে! পাঁচিলের ওই দূরের গেটটার দিকে! ইন্সপেক্টর লেসট্রেড না? আরে গেল যা! লেসট্রেডই তো বটে!"

মাংসপেশী-ঠাসা বাচ্চা বুলডগের মতো একটা লোক মাথায় কড়া কাপড়ের হ্যাট আর গায়ে মোটা কম্বলের গ্রেটকোট চাপিয়ে রাস্তা বেয়ে হনহন করে আসছে আমাদের দিকে। পেছনে দু-জন হেলমেটধারী পুলিশ কনস্টেবল। নীলবর্ণ পোশাকে মোটা গুম্ফধারী যেন যমজ ভাই।

সক্ষোভে বললে হোমস—"বটে! মিসেস ক্যাবপ্লেজার তাহলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেও গেছিলেন!"

কথাটা বললে স্বয়ং লেসট্রেডকে।

লেসট্রেডও তৎক্ষণাৎ জবাবটা ছুঁড়ে দিল মুখের ওপর—"ঠিক জায়গাতেই গেছিলেন। আরে, ডক্টর ওয়াটসনও যে! তা প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেল, প্রথম মোলাকাৎ ঘটে আপনাদের সঙ্গে। অথচ আজও শুধু থিওরিই কপচে গেলেন মিস্টার হোমস, আমি রয়ে গেলাম প্র্যাকটিক্যাল ম্যান।"

"লেসট্রেড, হাতে সময় কম।" হোমস যেন তেড়ে ওঠে—"ভদ্রমহিলা আমাদের যা বলেছেন, তোমাকেও তাই বলেছেন। তোমার কাছে গেছিলেন কখন?"

"গতকাল সকালে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমরা কাজ করি বিদ্যুৎবেগে। সারাদিন কাটিয়েছি মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজারের নাড়ীনক্ষত্র তদন্তে।"

"তাই নাকি? পেলে কী?"

লেসট্রেড সন্দিগ্ধ অপাঙ্গ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আমাদের দিকে। "ভদ্রলোক সর্বজনপ্রিয়। অফিসের বাইরে বইপোকা—বই ছাড়া থাকতে পারেন না। স্ত্রী-র তা পছন্দ নয়। মূকাভিনয়ে পটু—পয়লা নম্বরের ভাঁড়—লোক হাসাতে পারেন।"

"তা ঠিক। কৌতুক রস আছে ভদ্রলোকের!"

"দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে তাহলে?"

"ভদ্রলোকের সঙ্গে? আরে না। হয়েছে ওঁর স্ত্রী-র সঙ্গে।"

"সে যাকগে। কাল রাতে সাক্ষাৎ হলো ভদ্রলোকের সঙ্গে। নিজেই গেছিলাম ভদ্রলোকের দৌড় কতখানি, তা দেখতে। আরে না, একটা অছিলা নিয়ে গেছিলাম। হুঁশিয়ার হয়ে যেতে পারেন, সেরকম কিছু করিনি।"

"তা তো বটেই। তা তো বটেই," হোমস যেন গুটিয়ে ওঠে—তাহলে বলো দিকি, লেসট্রেড, বিলকুল সাচ্চা মানুষ হিসেবে সুনাম আছে কিনা ভদ্রলোকের?"

ক্যাবপ্রেজার তাহলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেও গেছিলেন।

"সেইটাই তো সন্দেহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে", দুই চোখে ধূর্ত ঝিলিক হেনে বললে লেসট্রেড— "ভদ্রমহিলাকে আমার আদৌ ভাল লাগেনি মানছি, কিন্তু ভদ্রলোককে আমি হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব—আপনি কিস্যু করতে পারবেন না।"

"ভায়া লেসট্রেড। ভদ্রলোককে হাতকড়া পরাবে কোন অপরাধে?"

"কারণ—আরে, দাঁড়ান।" বিকট চেঁচিয়ে ওঠে লেসট্রেড—"ও মশায়! শুনছেন? দাঁড়ান—ওইখানেই দাঁড়ান।"

লেসট্রেডের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে নিচু পাঁচিল বরাবর এগোতে এগোতে দুই ফটকের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছেছিলাম। আচমকা আমাদের সান্নিধ্য ছেড়ে দিয়ে লেসট্রেড ভোঁ দৌড় দিল যে গেট আমরা ছেড়ে এসেছি, সেই গেটের দিকে। অসাধারণ চালাকি দেখিয়ে কোনও ম্যাজিশিয়ান যেন সেখানে সকালের আঁধার থেকে বের করে এনেছেন মোটাসোটা খানদানি চেহারার রক্তিমমুখ এক ভদ্রলোককে। ঘাবড়ে গেছেন বিলক্ষণ। মাথায় ধূসর টপহ্যাট। গায়ে সুদৃশ ধূসর গ্রেটকোট।

ভদ্রলোকের মূল্যবান পরিচ্ছদ দেখেই হাঁকডাকের মধ্যে ভারিক্কি ভাব এনে ফেলল লেসট্রেড—"কে আপনি? কি নাম আপনার?"

নার্ভাস ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন—"আমার নাম হ্যারল্ড মর্টিমার ব্রাউন। আমি ক্যাবপ্রেজার অ্যান্ড ব্রাউন কোম্পানির পার্টনার। গাড়ি ছেড়েছি বড় রাস্তায়। থাকি সাউথ লন্ডনে।"

"সাউথ লন্ডন থেকে এতদূরে এসেছেন নর্থ লন্ডনে?" লেসট্রেডের গলায় যেন দুরমুশ পেটার আওয়াজ।

হোমস নাক গলালো ঠিক সেই সময়ে। বললে—"মাই ডিয়ার মিস্টার মর্টিমার ব্রাউন", এমন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় লেসট্রেডকে পাশ কাটিয়ে গেল যে ভদ্রলোক যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন—"ঘটনাচক্রে একটু আবেগ দেখিয়ে ফেলেছেন আমার বহুদিনের বন্ধু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর লেসট্রেড। কিছু মনে করবেন না। আমার নাম শার্লক হোমস। আপনার কাছে অসীম কৃতজ্ঞ থাকব আপনি যদি শুধু আমার একটিমাত্র প্রশ্নের সদুত্তর দেন। আপনার পার্টনার কি সত্যিই চুরি—"

"থামুন!" অগ্নুৎপাত-গর্জনে বললে লেসট্রেড। বলেই অবশ্য বোঁ করে ঘুরে গেল দূরের গেটের দিকে। সেই গেট দিয়ে ঝন ঝন ঝনাৎ শব্দে একটা দুধের গাড়ি ঢুকে কাঁকর বিছোনো পথ বেয়ে এগোচ্ছে চুনকাম করা গথিক বাড়িটার দিকে—দুধভর্তি ক্যানগুলো নেচে নেচে ঐকতান সৃষ্টি করে চলেছে অশ্বখুরধ্বনির সঙ্গে।

খুদে বুলডগের মতোই সর্বাঙ্গ কম্পিত করে ফেলল লেসট্রেড। বললে পুলিশি হুঙ্কারে—"নজর রাখো দুধের গাড়ির ওপর! সামনের দরজা ঢেকে যেন না দাঁড়ায়!"

না, সামনের দরজা ঢেকে দাঁড়ায়নি দুধের ভ্যান। শিস দিতে দিতে পরম ফূর্তিতে ওয়াগন থেকে লাফ দিয়ে নামল দুধওলা, হনহনিয়ে পা চালিয়ে দুধ ঢালতে গেল প্রবেশপথের সামনে রাখা ছোট্ট দুধের জগে—পরে দেখেছিলাম, এই জগ আগে থেকেই রেখে দেওয়া হয়েছিল সামনের দরজার সামনে। কিন্তু খিলেনের তলা দিয়ে যাওয়ার সময়ে আমাদের চোখের আড়ালে সে চলে যেতেই, মিল্ক-ভ্যান সম্পর্কিত সমস্ত ভাবনাচিন্তা উড়ে গেল আমার মাথা থেকে।

উত্তেজনায় টান-টান গলায় বলে উঠল লেসট্রেড —"এসেছেন! মিস্টার হোমস, এসেছেন সেই তিনি!"

সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার দড়াম শব্দ শুনলাম সুস্পষ্ট। চকচকে হ্যাট মাথায়, ভারি গ্রেটকোট গায়ে, সম্ভ্রান্ত আকৃতি এক ভদ্রলোক গাড়ি চলাচলের কাঁকর বিছোনো পথে বেরিয়ে এলেন—চোখে পড়ার মতো গোঁফ জোড়া দেখেই এসে গেলাম সঠিক সিদ্ধান্তে—মিস্টার জেমস ক্যাবপ্রেজার চলেছেন অফিসে।

তুরুক নাচ নাচতে নাচতে বললে লেসট্রেড—"দেখেছেন, দেখেছেন মিস্টার হোমস? ছাতা নেননি সঙ্গে!"

লেসট্রেডের চিন্তাধারা যেন ধূসর আঁধারের

মধ্যে দিয়ে ডানা মেলে উড়ে গিয়ে আঘাত হানল মিস্টার ক্যাবপ্লেজারের ব্রেনে। কাঁকর বিছোনো পথে আচমকা দাঁড়িয়ে গেলেন হীরক-ব্যবসায়ী। যেন তড়িদাহত হয়ে চোখ তুললেন আকাশের দিকে। নামহীন আতঙ্কে শিউরে উঠে এমন একটা হরফহীন চিৎকার ছাড়লেন যা শিহরন জাগ্রত করে দিয়ে গেল আমার মেরুদণ্ডে। পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎবেগে পলায়ন করলেন বাড়ির মধ্যে।

সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার দড়াম শব্দ ভেসে এল আর একবার। বিলক্ষণ বিস্মিত দুধওলা পেছনে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে উঠে বসল দুধের গাড়ির চালকের আসনে।

আঙুল মটকাতে মটকাতে সেকী আস্ফালন লেসট্রেডের—"জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল পুরো ব্যাপারটা! আমার চোখে ধুলো দেবে? এত সোজা? মিস্টার হোমস, দুধওলা ব্যাটাকে আগে আটকাই।"

"কী সর্বনাশ! দুধওলাকে আটকাবে কেন?"

"বাড়িতে ঢোকবার দরজায় মিস্টার ক্যাবপ্লেজার আর এই দুধওলা খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল বলে। খুব কাছাকাছি—নিজের চোখে তো দেখলাম! মিস্টার ক্যাবপ্লেজারের কুকর্মের দোসর এই ব্যাটা দুধওলা—চোরাই হিরে পাচার করে দিয়েছেন দুধওলার হাতে।"

"মাই ডিয়ার লেসট্রেড—"

কর্ণপাত করার পাত্র নয় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ। আমরা যে ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দুধের ভ্যান গড়গড়িয়ে সেই ফটকের দিকে এগিয়ে আসতেই, লম্ফ দিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল লেসট্রেড—দু-হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেল ভ্যানের সামনে—চালক বিশ্রী একটা গালাগাল দিয়ে কষে লাগাম টেনে রুখে দিল ঘোড়াকে।

মেদিনী-কাঁপানো হুঙ্কার ছাড়ল লেসট্রেড—"দেখেছি, দেখেছি, তোমাকে আগেই দেখেছি। চেহারাটা মেজেঘষে নিয়েছ বটে, কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। তোমার নামই তো হ্যানিবাল প্রঙ্গমর্টন, ওরফে, ফেলিক্স পোর্টিয়াস?"

বিষম বিস্ময় বিমূর্ত হলো দুধওলার পরিষ্কার কামানো লম্বাটে বদনে। ঝুলে পড়ল চোয়াল।

বললে পরক্ষণেই পাল্টা চিৎকার ছেড়ে—"যাচ্চলে! আমার নাম তো আলফ্ পিটার্স। এই তো আমার আইডেনটিটি কার্ড। দেখে নিন না ফটোটা—ম্যানেজারের সইটাও দেখে নিন—চোখ বুঁজে সই মারেননি! কী ভাবেন আমাকে? গভর্নর সিসিল রোড্স?"

"নামো.....নামো.....গাড়ি থেকে আগে নামো.....নইলে সোজা ফাটকে চালান করব।....বাঃ! এই তো!" বলতে বলতে দুই পুলিশ-কনস্টেবলের দিকে ঘুরে গেল লেসট্রেড—"বার্টন! মুরডক! সার্চ করো দুধওলাকে!"

চিল্লিয়ে উঠল বটে দুধওলা, কিন্তু রেহাই পেল না দুই কনস্টেবলের খপ্পর থেকে। টিকলিকে মাঝারি হাইটের বপু নিয়ে দুর্ধর্ষ লড়ে গেল কনস্টেবল যুগলের সঙ্গে—কিন্তু দেহতল্লাসি আটকাতে পারল না।

পাওয়া গেল না কিছুই।

লেসট্রেড তাতে দমবার পাত্র নয়—"হিরে আছে তাহলে ওই পাঁচটা দুধের ক্যানে। দুধ ঢেলে দাও রাস্তায়!"

এবং, তাই করা হলো। তখন যে-ভাষায় কথা বলে গেছিল দুধওলা, তা সভ্যযুগে নিতান্তই অচল।

তাতেও কিন্তু ভাঁটা পড়ল না লেসট্রেডের তড়পানিতে—"সেকী! নেই দুধের ক্যানে? তাহলে নিশ্চয় গিলে ফেলেছে! নিয়ে যাবো নাকি থানায়?"

আর এক দফা ছাপার অযোগ্য শব্দাবলী আউড়ে দুধওলা বলেছিল—"তার চাইতে একটা কুড়ুল নিয়ে কেটেকুটে দেখুন না গাড়িটাকে?"

হোমসের তীক্ষ্ণ কর্তৃত্বময় কণ্ঠস্বরই কিন্তু মোড় ফিরিয়ে দিল পরিস্থিতির।

"লেসট্রেড! কৃপা করে পিটার্সকে যেতে দাও। প্রথম কারণ, ছাব্বিশটা হিরে গিলে ফেলা যায় না। দ্বিতীয় কারণ, স্যাঙাতের হাত দিয়ে যদি হিরে পাচারই করতে যাবেন মিস্টার ক্যাবপ্লেজার, তবে তা মঙ্গলবার গভীর রাতেই করে ফেললেন না কেন? একতলায় জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে যখন কথা বলছিলেন বাইরের লোকের সঙ্গে? ওঁর স্ত্রী ঠিকই বর্ণনা দিয়েছেন, মিস্টার ক্যাবপ্লেজার ভদ্রলোকের—হাবভাব কথাবার্তা আচার-আচরণ সবই যুক্তিহীন—যেমন যুক্তিহীন ছাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, যদি না—"

এই পর্যন্ত বলেই অকস্মাৎ গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেল শার্লক হোমস—এই সেই 'মুড' যার জন্যে ও এত বিখ্যাত। দু-হাত ইনভারনেস কোটের ভেতরে ঢুকিয়ে পর্যায়ক্রমে দেখে নিল প্রথমে দোকানদারদের প্রবেশপথ, তারপর বাড়িতে ঢোকার প্রবেশপথ। ওর মতো শীতল প্রকৃতি, উচ্ছাসবিহীন মানুষেরও গলা চিরে ঠিকরে এল চকিত বিস্ময়ধ্বনি। ক্ষণেকের জন্যে নিস্পন্দ হয়ে রইল দীর্ঘ, শীর্ণ আকৃতি বিদ্যুৎগর্ভ আকাশের পটভূমিকায়।

বললে তারপরেই—"কী মুশকিল, লেসট্রেড! কতক্ষণ ধরে ছাতা খুঁজছেন মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজার?"

"বলতে চান কী?"

"ছোট্ট একটা ভবিষ্যৎবাণী করতে চাই। বলতে চাই—মিস্টার ক্যাবপ্লেজার আর নেই। অদৃশ্য হয়ে গেছেন বাড়ির মধ্যে থেকে।"

"বললেই হলো অদৃশ্য হয়ে গেছেন? হবেন কি করে?" গলাবাজিতে লেসট্রেডকে তখন থামায় কার সাধ্য।

"কেন হবেন না জানতে পারি?"

"পুলিশ-কনস্টেবলদের দিয়ে বাড়ি ঘিরে রেখেছি। সটকান দেওয়ার কোনও সুযোগ রাখিনি। প্রত্যেকটা দরজা আর জানলার ওপর নজর রাখা হয়েছে। চোখ এড়িয়ে ইঁদুর পর্যন্ত বেরতে পারেনি—এখনও পারবে না।"

"লেসট্রেড, তা সত্ত্বেও ছোট্ট ভবিষ্যৎবাণীটার পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছি। বাড়ি সার্চ করলেই দেখবে, সাবানের বুদবুদের মতো অদৃশ্য হয়ে গেছেন মিস্টার ক্যাবপ্লেজার।"

পুলিশ-হুইশলটা ঠোঁটে লাগাতে যেটুকু সময় লাগে, সামান্য সেই সময়টুকুর জন্যে খাড়া থেকেই, পরমুহূর্তে পবনবেগে বাড়ির দিকে ধেয়ে গেল লেসট্রেড। দুধওলা আলফ্ পিটার্স সুযোগটার সদ্ব্যবহার করে নিল নিমেষমধ্যে। তড়াক করে উঠে গেল চালকের আসনে, ছিপটি হাঁকালো শনশনিয়ে অশ্ব বেচারীর পৃষ্ঠদেশে এবং খটমট খটমট গড়গড় শব্দঝঙ্কার সৃষ্টি করে এমনভাবে অন্তর্হিত হলো তল্লাট ছেড়ে যেন প্রাণ হাতে চম্পট দিচ্ছে এক বিপজ্জনক উন্মাদের সম্মুখ থেকে।

সম্ভ্রান্ত আকৃতির মিস্টার মর্টিমার ব্রাউন ভদ্রলোকও বিলম্ব করা সমীচীন বোধ করলেন না। তাঁকে হয়তো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন ছিল শার্লক হোমসের—কিন্তু সেজন্যে তিলমাত্র কালক্ষেপ তিনি করলেন না। রক্তিম মুখে ভয়ার্ত ভাব জাগ্রত করে এবং খানদানি চলন-বলন বিস্মৃত হয়ে তিনি টেনে দৌড়লেন রাস্তা বরাবর, পাছে টুপি উড়ে যায়—তাই দু-হাত তুলে ধরে রইলেন মাথার টুপি।

শার্লক হোমস বললে কর্তৃত্বকঠিন কণ্ঠস্বরে—"শান্ত হও, ওয়াটসন, আরে না, পরিহাস করছি না। সামান্য একটা পয়েন্টের তাৎপর্য অনুধাবন করলেই দেখবে পুরো ব্যাপারটা বিলকুল সোজা।"

"কী সেই সামান্য পয়েন্ট?"

"ছাতাকে ধ্যানজ্ঞান নিত্য সহচর করেন কেন মিস্টার ক্যাবপ্লেজার—আসল সেই কারণটা।"

শীতার্ত আকাশ একটু একটু করে আলোকময় হয়ে উঠছিল। রৌদ্রপ্রভা জাগ্রত হচ্ছিল। দোতলার যে দুটো জানলা গ্যাসের আলোয় হলুদ হয়েছিল এতক্ষণ, রোদ এসে পড়ায় তা ম্লান হতে ম্লানতর হয়ে যাচ্ছিল। বিরামবিহীন পুলিশি তল্লাশি কিন্তু তখনও চলেছে গোটা বাড়ি জুড়ে। যত দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি পুলিশ

এস বন্ধু, এস!

বাড়িময় থুকথুক করছে।

একটা ঘণ্টা গেল এইভাবে। নিথর দেহে দাঁড়িয়ে রইল শার্লক হোমস এই একটা ঘণ্টা। তারপর বুলেটবেগে বাড়ির ভেতর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো লেসট্রেড। চোখেমুখে যে বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করলাম, নিশ্চয় তা প্রকট হয়েছিল আমার চোখেমুখেও।

"মিস্টার হোমস, মিস্টার হোমস, হক কথাই বলেছেন। বর্ণে বর্ণে সত্যি আপনার ভবিষ্যৎবাণী। মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজারের ছাতা, গ্রেটকোট, টুপি সবই পড়ে রয়েছে সামনের দরজার ঠিক ভেতরে। কিন্তু—"

"বলে যাও?"

"দিব্যি গেলে বলতে পারি, বাড়ির মধ্যে কোথাও ঘাপটি মেরে নেই শয়তান-শিরোমণি সেই ভদ্রলোক—অথচ কনস্টেবলরা একবাক্যে বলছে, বাড়ি ছেড়ে তিনি বেরোননি।"

"বাড়ির মধ্যে এখন রয়েছেন কে?"

"শুধু ওঁর স্ত্রী। কাল রাতে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কথা হয়ে যাওয়ার পর, মনে হচ্ছে চাকর-বাকরদের সব ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন—স্ত্রী অবশ্য বলছেন—ঘাড় ধরে প্রায় তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—তবে ওয়ার্নিং সূচক একটা কথাও বলেননি। এহেন বিদকুটে গলাধাক্কা কারোরই মনঃপূত হয়নি—কোথায় গিয়ে থাকবে, তাও জানা ছিল না—যেতে কিন্তু হয়েছে—মিস্টার ক্যাবপ্লেজারের তাড়নায়।"

শিস দিয়ে উঠল হোমস।

"স্ত্রী তাহলে ভেতরেই আছেন! ভাল! ভাল! কিন্তু এত যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল এতক্ষণ ধরে, ভদ্রমহিলাকে তো একবারও দেখতে পেলাম না, তাঁর সুমধুর বচনও শুনতে পেলাম না! কাল রাতেই কি তাহলে ওঁকে ঘুমের আরক খাইয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা নিতে বাধ্য করা হয়েছে? চোখের পাতা খুলতে পারেননি সারারাত—হয়তো এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরছে একটু একটু করে?"

যেন জাদুকরের চোখের সামনে থেকে ঝট করে এক পা পেছিয়ে গেল লেসট্রেড।

"মিস্টার হোমস, আপনি তা জানছেন কি করে?"

"এ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না বলে।"

"বেদবাক্য বলেছেন। শয্যাগ্রহণের একঘণ্টা আগে ভদ্রমহিলার নিত্য অভ্যেস এক কাপ গরম মাংস-সুপ খাওয়া। এত বেশি আফিং দেওয়া হয়েছে কাল রাতের মাংস-সুপে যে, কাপের গায়ে এখনও তা লেগে রয়েছে।" বলতে বলতে মুখ অন্ধকার হয়ে গেল লেসট্রেডের—"আমি কিন্তু ওই ভদ্রমহিলার মুখদর্শন করতে চাই না—ইয়ে—মুখখানা যত কম দেখি, তত ভাল।"

"আফিং-এর ঘোর কিন্তু অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন—জানলায় মুখ দেখতে পাচ্ছি।"

"চুলোয় যাক। আপনি খালি একটা কথা বলুন। চোর-চূড়ামণি হিরে-ব্যবসায়ী ভদ্রলোক আমাদের নাকের ডগা দিয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেলেন কি করে?"

ফুঁসে উঠলাম আমিও—"ভায়া হোমস, জবাব একটাই। নিশ্চয় কোনও পাতাল-সুড়ঙ্গ অথবা গুপ্ত পথ দিয়ে লম্বা দিয়েছেন মিস্টার ক্যাবপ্লেজার।"

গলার শির তুলে লেসট্রেড বললে—"অসম্ভব! এরকম কোনও সিক্রেট প্যাসেজ ও বাড়িতে নেই।"

হোমসও সায় দিল তৎক্ষণাৎ—"আমার কথাও তাই। ওয়াটসন, বাড়িটা হালে তৈরি হয়েছে, বড় জোর গত বিশ বছরের মধ্যে। আজকালকার স্থপতিরা পূর্বপুরুষদের কায়দায় বাড়ির মধ্যে গোপন সুড়ঙ্গ বানিয়ে রাখার ঝকমারির মধ্যে যান না। ওহে লেসট্রেড, এর বেশি আর তো কিছু করবার নেই আমার।"

"কিন্তু আপনি এখন যেতে পারবেন না!"

"বলো কি হে! যেতে পারব না?"

"না। আপনি তত্ত্বকথার প্রবক্তা হতে পারেন, প্র্যাকটিক্যাল মানুষ একেবারেই নন, তা সত্ত্বেও অস্বীকার করতে পারি না—অতীতে এক-আধবার আপনার সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে। রক্তমাংসের একটা মানুষ বাড়ির মধ্যে থেকে

স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, এহেন অলৌকিক কাণ্ড যদি আপনি আপনার অনুমানের মধ্যে আনতে পারেন তাহলে তো সৎ নাগরিক হিসেবে আপনাকে বলে যেতেই হবে, অসম্ভব অনুমানটা আপনার মাথায় এল কি করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনাকে বলতেই হবে—এবং তা আপনার ডিউটি।"

দ্বিধাগ্রস্ত হলো শার্লক হোমস।

বলল তারপর—"এই মুহূর্তে মুখে চাবি এঁটে থাকার একটা কারণ আছে। তবে একটা ইঙ্গিত তোমাকে দিতে পারি। ছদ্মবেশ ব্যাপারটা নিয়ে কি ভেবেছো?"

দু-হাতে মাথার হ্যাট খামচে ধরল লেসট্রেড। পেছন ফিরল আচমকা। দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সেই জানলার দিকে যে জানলায় স্বমহিমায় বিরাজ করছেন মিসেস ক্যাবপ্রেজার—নিরীক্ষণ করছেন না কিছুই—কিন্তু অণুপরমাণুতে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন ঔদ্ধত্য, আভিজাত্য আর আকাশচুম্বী কর্তৃত্ববোধ—যা টলানোর সাধ্য কারও নেই।

গলা নামিয়ে ফেলল লেসট্রেড এই দেখেই—"মাই গড! কাল রাতে যখন এ বাড়িতে এসেছিলাম, তখন তো একবারও মিস্টার আর মিসেস ক্যাবপ্রেজারকে একত্র দেখিনি। হলঘরে একটা ঝুটো গোঁফ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। পেয়ে খটকা লেগেছিল। এখন পরিষ্কার হয়ে গেল খটকা। আজ সকালে একটা মানুষই ছিল গোটা বাড়িতে— রয়েছে এখনও। তার মানে—"

শিউরে ওঠার পালা এবার হোমসের।

"লেসট্রেড, শেষ মুহূর্তে আবার কি খচখচিয়ে উঠল মাথার মধ্যে?"

"এত সহজে আমাকে ধোঁকা দেওয়া যায় না। মিস্টার ক্যাবপ্রেজার আর মিসেস ক্যাবপ্রেজার দুটো আলাদা মানুষ নন—একই মানুষ। হয় মিস্টার নয় মিসেস পুরুষের ধড়াচূড়া পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরে গেছেন বাড়িতেই—জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল গোটা ব্যাপারটা।"

"দাঁড়াও, লেসট্রেড, দাঁড়াও—তাড়াহুড়ো করতে যেও না।"

লেসট্রেড তখন খরগোশের মতো ধাবমান হয়েছে বাড়ির দিকে। মুখে ফুটছে বুলি—"দেহ তল্লাশির জন্যে আছে মেয়ে পুলিশ। এখুনি প্রমাণ করে দেবে, উনি ভদ্রমহিলা, না, ভদ্রলোক।"

"হোমস! হোমস!" সমানে চেঁচিয়ে গেলাম আমি—"আদৌ কি সত্যি হতে পারে বীভৎস এই থিওরি?"

"ননসেন্স!" বললে হোমস।

"তাহলে আটকাও লেসট্রেডকে", আমার মুখ থেকে বাক্য নিঃসরণ ঘটতে না ঘটতেই গবাক্ষ থেকে সরে গেলেন মিসেস ক্যাবপ্রেজার এবং পরমুহূর্তেই তেপান্তর কাঁপানো নারীকণ্ঠের নিনাদে প্রমাণিত হয়ে গেল অতি-তৎপর লেসট্রেড তার অতুলনীয় ধীশক্তির যথা প্রয়োগ ঘটিয়ে বসেছে। —"হোমস, হোমস, এ কী করছো তুমি? স্বীকার করছি, ভদ্রমহিলা অতিশয় অশোভন আচরণ করেছেন তোমার সঙ্গে, হুকুম খাটিয়ে এনে ফেলেছেন যাচ্ছেতাই লটঘটে এই ব্যাপারের মধ্যে—তাই বলে তাঁকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে থানায়—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি তা দেখতে চাও?"

চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে হোমস বললে—"থানায় নিয়ে গিয়ে ফেললে ভদ্রমহিলার খুব একটা ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না আমার। বরং, উত্তম শিক্ষালাভ করবেন। না, না, কুতর্ক জুড়ে দিও না! তোমার জন্যে একটা কাজ মাথায় এসেছে।"

"কিন্তু—"

"বেশ কয়েকটা লাইনে তদন্ত চালিয়ে যাব আজ—হয়তো পুরো দিনটা লাগবে। যেহেতু আমার ঠিকানা কারও অজ্ঞাত নয়, বিবেকবান ভদ্রলোক মিস্টার মর্টিমার ব্রাউন হয়তো আমার নামে একটা টেলিগ্রাম ছাড়তে পারেন। ওয়াটসন, সবিশেষ কৃতজ্ঞ থাকব যদি বেকার স্ট্রিটের ঘরে হাজির থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে তৎক্ষণাৎ খুলে পড়ে নাও—আমি ফিরে আসবার আগেই।"

লেসট্রেডের অতি-তৎপরতা সংক্রামক ব্যাধির মতোই নিশ্চয় আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। নইলে তক্ষুণি ছ্যাকড়া গাড়িতে উঠে, চালকের ওপর হম্বিতম্বি চালিয়ে, হুড়মুড়িয়ে বেকার স্ট্রিটের বাসায় ফিরে আসব কেন? একঘণ্টা....ঠিক একঘণ্টার মধ্যে হাজির হয়েছিলাম বসবার ঘরে।

তবে প্রত্যাশিত টেলিগ্রামটা এসেছিল দুপুরের খাওয়ার সময়ে। আর একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম পড়ে। বয়ানটা এইরকম :

"আজ সকালে ঊর্ধ্বশ্বাসে বিদায় গ্রহণ করার জন্যে অনুতপ্ত। খোলাখুলি জানাচ্ছি, 'ক্যাবপ্রেজার অ্যান্ড ব্রাউন' কোম্পানির নামকাওয়াস্তে অংশীদার ছাড়া আমি কিছু নই—আগেও তা ছিলাম, এখনও তাই আছি—কারবারের সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক মিস্টার জেমস পি. ক্যাবপ্রেজার। টেলিগ্রাম করে আমি খোঁজ নিয়েছিলাম, কাউন্টেস-ডারনিঙহ্যামের হিরের বাক্স থেকে ছাব্বিশটা হিরে সিন্দুক খুলে নিয়ে গেছেন কিনা। নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম হিরেগুলো তাঁর কাছে বাড়িতে নিরাপদে রয়েছে কিনা। নিয়ে যদি থাকেন, তাহলে তাঁর পূর্ণ অধিকার আছে হিরে নিয়ে বাড়ি যাওয়ার। — হ্যারল্ড মর্টিমার ব্রাউন।"

কী আশ্চর্য। জেমস ক্যাবপ্রেজার তাহলে চোর নন! বেশ তাই যদি না হন, তাহলে তাঁর অতীব উদ্ভট আচরণগুলোর হৃদয়গ্রাহ্য ব্যাখ্যা জানবার অধিকার আমার আছে। রাত সাতটায় তদন্ত সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিল হোমস, সিঁড়িতে শুনেছিলাম অতি-পরিচিত পদধ্বনি। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলাম আবেগে।

দরজার 'নব' ঘুরে যেতেই কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে বলেছিলাম—"এস বন্ধু, এস। কূট-কচালের একমাত্র সহজবোধ্য সমাধান অবশেষে হস্তগত হয়েছে আমার।"

ঝটকান দিয়ে কপাট খুলে শার্লক হোমস দৃষ্টিকৃপাণ বুলিয়ে নিল ঘরের সর্বত্র, এবং আশাহত হলো বিলক্ষণ।

"সেকী হে! কোনও সাক্ষাৎপ্রার্থীই আসেনি! হয়তো একটু আগেই এসে পড়েছি...হ্যাঁ, একটু আগে আসা হয়ে গেছে! কি যেন বলছিলে, ওয়াটসন?"

টেলিগ্রাম তুলে দিলাম বন্ধুবরের হাতে। ও যখন পাঠনিরত, তখন আমি গড়গড়িয়ে বলে গেলাম—"মিস্টার ক্যাবপ্রেজার আদৌ যদি অদৃশ্য হয়ে যান, লেসট্রেডের বিশ্বাস অনুযায়ী, তাহলে তা অলৌকিক ব্যাপার। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটে না। হোমস, আমাদের মনে হয়েছিল, অদৃশ্য হয়ে গেছেন হিরের কারবারি। আসলে উনি ওইখানেই ছিলেন সর্বক্ষণ—কিন্তু আমরা চোখ মেলে দেখিনি।"

"কিভাবে তা সম্ভব?"

"ভদ্রলোক পুলিশ-কনস্টেবলের ছদ্মবেশে ছিলেন।"

গায়ের কোট আর মাথার টুপি খুলে কপাটের পেছনে হুকে ঝুলিয়ে রাখতে যাচ্ছিল হোমস, আমার কথা শুনে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম, কালো ভুরুযুগল ঘন সন্নিবদ্ধ হয়ে গেছে।

"তারপর? চালিয়ে যাও!"

"এই ঘরে বসেই মিসেস ক্যাবপ্রেজার বলেছিলেন, গোঁফের জন্যে স্বামীকে দেখে মনে হয় যেন পুলিশ কনস্টেবল। ভদ্রলোক যে মূকাভিনয়ে পটু, তা জেনে ফেলেছি। ভাঁড়ারে কৌতুক রসের অভাব নেই, তাও জানা হয়ে গেছে। পুলিশম্যানের ফ্যান্সি ড্রেস ইউনিফর্ম যোগাড় করা তাঁর কাছে জলভাত। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফের বাড়িতে ঢুকে গিয়ে আমাদের ধোঁকায় ফেলে দিয়েই ঝটিতি পরে নিয়েছিলেন পুলিশের ইউনিফর্ম—ভিড়ে গেছেন পুলিশ দলে—পুলিশের নজর এড়িয়ে পয়াকার দিয়েছেন যথাসময়ে।"

"এক্সেলেন্ট, ওয়াটসন! লেসট্রেডের সান্নিধ্যে যখন থাকি, শুধু তখনই তোমার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে মেপে উঠতে পারি। বলেছ চমৎকার।"

"সমাধানে তাহলে পৌঁছেছি?"

"তেমন প্রকৃষ্ট নয়, বলতে বাধ্য হচ্ছি। মিসেস ক্যাবপ্লেজার কি বলেছিলেন, মনে করে দ্যাখো। ওঁর স্বামী মাথায় মাঝারি, ফিগার লতাগাছের খুঁটির মতো। অর্থাৎ উনি বলতে চেয়েছেন, ভদ্রলোক হিলহিলে, লিকলিকে। কথাটা যে ঠিক, তা যাচাই করে এলাম 'হ্যাপিনেস ভিলা'র ড্রইংরুমে বসে ভদ্রলোকের অনেকগুলো ফটোগ্রাফ দেখে। লন্ডনের পুলিশম্যানের মতো আখাম্বা লম্বা তিনি নন, পেশীবহুল বপুর অধিকারীও নন। চেষ্টা করলেও তা হতে পারবেন না।"

"কিন্তু আমার এই সিদ্ধান্তই তো সর্বশেষ সম্ভাব্য সমাধান।"

"আমার তা মনে হয় না। হাইট আর ফিগার মিলে যায় শুধু একজনেরই হাইট আর ফিগারের সঙ্গে। তিনি—

জোর ঘণ্টাধ্বনি শুনলাম একতলায়।

"ওই শোনো।" শার্লক হোমস যেন লাফিয়ে উঠল—"এসে গেছেন ভিজিটর। সিঁড়িতে শুনছ পায়ের আওয়াজ? এরপর যে নাটক অনুষ্ঠিত হবে, তা আটকানোর সাধ্য আমার নেই। দরজাটা কে খুলবে, ওয়াটসন? তুমি, না, আমি?"

দরজা আপনিই খুলে গেল। গায়ে কোট, মাথায় টুপি চাপিয়ে সান্ধ্যপোশাকে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গেলেন যে ভদ্রলোক, আমি তাঁর লম্বাটে, পরিষ্কার কামানো পরিচিত বদনমণ্ডলের দিকে অপরিসীম অবিশ্বাসভরা চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

সোল্লাসে বললে হোমস—"গুড ইভনিং, মিস্টার আল্‌ফ্ পিটার্স—মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজার বললে কি খুশি হবেন?"

জ্যামুক্ত শায়কের মতো উপলব্ধিটা আঘাত হানলো আমার মস্তিষ্কে। টলে গেলাম।

উচ্ছ্বাসের রাশ টেনে ধরল হোমস নিমেষমধ্যে। বললে কুলিশ-কঠোর কণ্ঠে—"দুধওলার ছদ্মবেশ ধারণের মধ্যে ছিল প্রকৃত শিল্পীর নৈপুণ্য। তার জন্য প্রাপ্য প্রশংসা জানাই আপনাকে। অনুরূপ একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ঘটেছিল ১৮৭৬ সালে রিগা-তে। ১৯৮৮ সালেও এইভাবে অপর লোক সাজার একটা কেসে মাথা ঘামাতে হয়েছিল। সেই ভদ্রলোকের নাম ছিল মিস্টার জেমস উইন্ডিব্যাঙ্ক। কিন্তু আপনার এই কেসের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বাস্তবিকই অনবদ্য। গোঁফ ফেলে দিয়ে মুখের চেহারা পালটে ফেলা, বিশেষ করে বয়স কমিয়ে ফেলার এই বিশেষ বিদ্যা নিয়ে একটা সন্দর্ভ রচনা করব ভেবে রেখেছি। লোকে গোঁফ রাখে ছদ্মবেশ ধারণের জন্যে, আপনি সেই কর্মটি করেন গোঁফ বর্জন করে।"

সান্ধ্যপোশাকে ভদ্রলোকের মুখগরিমা স্পষ্টতর হয়েছে, প্রখর ধীশক্তি মুখের পরতে ধৃতিমান হয়ে রয়েছে, এ মুখ এমনই মুখ যা রকমারি ভাবের পরিস্ফুটন ঘটাতে পারে মুহুর্মুহু পটপরিবর্তনের মাধ্যমে। কৌতুকতরলিত বাদামী চক্ষুর পার্শ্বদেশ ঈষৎ কুঞ্চিত, বুঝি এখুনি হাস্যপরিহাসে মত্ত হবেন। কিন্তু কৌতুক ব্যঞ্জনার পরিসমাপ্তি ওই পর্যন্তই—কারণ, ভয়ানক উদ্বেগ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর নয়ন-মণিকায়।

কথা বললেন সুললিত সুমধুর স্বরে—"ধন্যবাদ। আমারই বাড়ির সামনে দুধওলা সেজে যখন দুধের গাড়িতে বসে রয়েছি, তখন আমার অবস্থা কাহিল করে তুলেছিলেন মিনিট কয়েকের জন্যে শুধু আপনি—আমার সমস্ত প্ল্যানটা ধরে ফেলেছিলেন পলকের মধ্যে। কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙে না দিয়ে সংযত হয়ে রইলেন কেন?"

"সবার আগে চেয়েছিলাম, আপনার বক্তব্য আপনারই মুখে শুনতে—লেসট্রেডের উপস্থিতিতে তা ঘটলে আপনি বিব্রত হয়ে পড়তেন।"

অধর দংশন করলেন জেমস ক্যাবপ্লেজার।

হোমস কিন্তু চালিয়ে গেল ওর নীরস ভাষণ—"তারপরে অবশ্য 'পিউরিটি মিল্ক কোম্পানি'র মাধ্যমে আপনার হদিস বের করতে বেগ পেতে হয়নি—পরিণামদর্শী শব্দ চয়ন করে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছিলাম তার পরেই। যে-টেলিগ্রাম পেয়ে আপনার আবির্ভাব ঘটেছে এই বাঙ্গারামের দীন আলয়ে। জেমস ক্যাবপ্লেজারের একটা ফটোগ্রাফ থেকে গোঁফ বাদ দিয়ে দেখিয়েছিলাম আপনার অন্নদাতাকে, মানে, দুধ কোম্পানির মালিককে। দেখেই উনি বলেছিলেন, ফটোগ্রাফের গোঁফহীন মানুষটার নাম আলফ্রেড পিটার্স, ছ-মাস আগে দরখাস্ত করেছিলেন দুধের কোম্পানিতে চাকরি নেওয়ার জন্যে, মাত্র দু-দিনের ছুটি নিয়ে কাজে আসেননি—সে দিন দুটো হলো, মঙ্গলবার আর বুধবার।

গতকাল, আপনার স্ত্রী এই ঘরে বসে বলে গেছেন, ছ-মাসের বিজনেস জার্নিতে আপনি ছিলেন আমস্টারডাম আর প্যারিসে—ফিরেছেন মঙ্গলবার। আপনার এইসব অসঙ্গত ব্যাপার-স্যাপারের সঙ্গে যখন যুক্ত করি ছাতার প্রতি আপনার অস্বাভাবিক দুর্বলতা—যে-ছাতা কেনবার সময়ে আপনি তিলমাত্র উদ্বেলিত হননি—হয়েছিলেন তখন থেকেই যখন আপনি আপনার অভিনব পরিকল্পনার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মনে মনে সাজিয়ে ফেললেন—জিগির ছাড়তে লাগলেন, এই ছাতাই নাকি আপনার মরণ ডেকে আনবে—অতিশয় উদ্ভট আর অবিশ্বাস্য এই বদ্ধবিশ্বাসের পাশে আপনার আগের বিচিত্র ব্যবহারগুলো সাজাতেই সুস্পষ্ট হয়ে গেল আপনার অভিলক্ষ্য—আপনি প্রতারণা করতে চান স্ত্রী-কে।"

"আমাকে, স্যার, বলতে দিন—"

"আর একটু। গোঁফ কামিয়ে ফেলে ছ-মাস

স্পর্ধার চূড়ান্ত দেখালেন আজ সকালে—

আপনি দুধের গাড়ি হাঁকিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তা উপভোগও করেছেন। মঙ্গলবার ফিরে এলেন 'মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজার' হয়ে। আসল চুল থেকে নকল গোঁফটা হুবহু আপনার হারানো গোঁফের মতো করে বানিয়ে দিয়েছিল পরচুলা ব্যবসায়ী মেসার্স ক্লার্কফেদার—খবরটা তাদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি। শীতের প্রায়ান্ধকারে অথবা গ্যাসবাতির স্বল্পালোকে স্ত্রী-র চোখে ধুলো দিয়েছেন অতি সহজেই—উনি তো আপনার দিকে চেয়েও দেখেন না পাছে গোঁফ দেখতে হবে বলে—এ ছাড়াও থাকেন স্বতন্ত্র কক্ষে। আপনার প্রতি অনুরাগও নেই।

চুলচেরা হিসেব করেই তবে এই বিপজ্জনক অভিযানে নেমেছেন। আপনার প্রতিটি কথা প্রতিটি ব্যবহার সন্দেহ সৃষ্টি করে গেছে। মঙ্গলবার রাতে দুর্লক্ষণযুক্ত নাটকের অবতারণা করলেন খোলা জানলার সামনে—যেন, শলাপরামর্শ আঁটছেন কুকর্মের দোস্তের সঙ্গে—হুবহু সেই ছাপ এঁকে দিলেন স্ত্রী-র মনে—যাতে চটজলদি বেরিয়ে পড়েন আপনাকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে—উনি যে ঠিক এই পথেই যাবেন—সে হিসেবও ছিল আপনার সুচারু পরিকল্পনার নকশার মধ্যে।

বুধবার রাত্রে ইন্সপেক্টর লেসট্রেড দেখা করেছিল আপনার সঙ্গে। লেসট্রেড খুব সূক্ষ্ম পদার্থ দিয়ে গড়া নয়। সাক্ষাৎকার শেষ হতেই আপনি বুঝে ফেলেছিলেন, হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার যে উপসংহারটি স্থির করেছেন অভিনব এই নাটকের অন্তে—তার সাক্ষী রাখা দরকার। প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনেই আপনাকে শূন্যে বিলীন হতে হবে। সেইটাই হবে সব চাইতে নিরাপদ পন্থা। চাকরবাকরদের তাই ছুটি দিয়ে বাড়ি থেকে ভাগিয়ে দিলেন, বউকে আফিং খাইয়ে বেহুঁশ করে দিলেন, নিজে বাড়ি ছেড়ে সটকান দিলেন।

স্পর্ধার চূড়ান্ত দেখালেন আজ সকালে—কিছু মনে করবেন না, আমার কথা এইরকমই—মাথায় হ্যাট না পরে, গায়ে গ্রেটকোট না চাপিয়ে—কী দুঃসাহস আপনার—হাসবেন না, হাসবেন না—দুধের গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা চলে এলেন আপনারই বাড়ির সামনে—তমালকালো আঁধারে চালিয়ে গেলেন দুই ব্যক্তির দু-রকম ভূমিকার অভিনয়।

গাড়ি থেকে তড়াক করে নেমে দুধওলার ভূমিকায় ফুর্তিতে নেচে নেচে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বাড়ির মধ্যে ঢোকবার দরজার সামনে। ভেতরে সাজানো ছিল মিস্টার ক্যাবপ্লেজারের গ্রেটকোট, হ্যাট আর গোঁফ। হ্যাট-কোট পরতে সময় লাগল ঠিক আট সেকেন্ড, ঝট করে সেঁটে নিলেন গোঁফ—নাটকের এই পর্যায়ে যা একান্তই দেখানো দরকার, অথচ লোকে তা দেখবে দূর থেকে আধো-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে।

বেরিয়ে এলেন হিরে-ব্যবসায়ীর সম্ভ্রান্ত আকৃতি গ্রহণ করে, পরমুহূর্তেই যেন মনে পড়ে গেল, ভুলে ছাতা ফেলে এসেছেন বাড়ির মধ্যে—হরিণকেও হার মানিয়ে ধেয়ে গেলেন বাড়ির দিকে, খুললেন সদর দরজা, কিন্তু ভেতরে না ঢুকেই বাইরে থেকে হ্যাট-কোট-গোঁফ লুকিয়ে ফেললেন দরজার খুপরিতে—ছাতা আগে থেকেই রাখা ছিল দরজার ভেতরে—বেশ আওয়াজ করে টেনে দরজা বন্ধ করলেন—যাতে শব্দ শুনে আমাদের মনে হয়, আপনি ঢুকলেন দুধওলাকে পাশ কাটিয়ে—একেই বলে দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি—পাকা ম্যাজিশিয়ানের মতো।

ইন্সপেক্টর লেসট্রেড যদিও মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে ফেলেছে দৃষ্টিবিভ্রম-এর এই ধোঁকাবাজি—দুই ব্যক্তিকে একসঙ্গে দেখেছে, এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে তার মনের মধ্যে, যদিও আমরা জানি সদর দরজার সামনে আঁধার এত নিবিড় ছিল যে দুজন কেন একজনকেও চোখে দেখা সম্ভব ছিল না। লেসট্রেডকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। দুধের গাড়ি রুখে দিয়ে হুঙ্কার দিয়ে যখন বলেছিল, আপনাকে সে আগেই দেখেছে—তখন নিছক ডাকাতে হুঙ্কার ছাড়েনি। সত্যিই সে আপনাকে আগে দেখেছিল—একবারই দেখেছিল কিন্তু কোথায় দেখেছিল, তা মনে করতে পারেনি।

দোস্ত রেখে এ কাজ আপনি করেননি,

আগেই তা বলেছি। আক্ষরিক অর্থে, কথাটা সত্যি। তবে কি জানেন, আপনার গুপ্ত অভিপ্রায়ের আভাস দিয়েছিলেন আপনার নামকাওয়াস্তে অংশীদার মিস্টার মর্টিমার ব্রাউনকে, যিনি আজ সকালেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন নজরে আসার জন্যে এবং দুধওলার ওপর থেকে নজর সরিয়ে আনবার জন্যে। দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি অতি সতর্ক আর অতি শঙ্কিত হয়ে যাওয়ায় প্ল্যানটা গেল ভেস্তে। আপনিও একটা যাচ্ছেতাই ভুল করে বসলেন হলঘরে নকল গোঁফ লুকোতে গিয়ে। অবশ্য, পুলিশ আপনার বডি সার্চ করেও তা পেয়ে যেত। তথাকথিত এই অলৌকিক কাণ্ড সম্ভবপর হয়েছে আপনার পরিকল্পনামাফিক রটনার দৌলতে—ছাতা আপনার প্রাণ, ছাতা আপনার ধ্যান, ছাতা আপনার বিগ্রহ—ছাতা-পুজোর ভড়ং দিয়ে বিপথে নিয়ে গেছেন আপনার স্ত্রী আর তাঁর পরিচিত মানুষদের। আসলে ছাতাটাকে আপনি নয়নের মণি করে রেখেছিলেন একটাই কারণে—ছাতা ছাড়া ভণ্ডুল হয়ে যেত আপনার প্ল্যান।" কাটছাঁট কথায় নিরুত্তাপ শুষ্ক স্বরে বচনাস্ত্র নিক্ষেপ করার পর কৃশকায় দণ্ডদাতার মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শার্লক হোমস।

বললে—"স্ত্রী-সঙ্গ কেন অসহ্য হয়ে উঠেছিল, কেন তাঁকে পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন, মিস্টার জেমস ক্যাবপ্লেজার, হয়তো আমার তা অজানা নয়। কিন্তু সে কাজটা আইনসঙ্গতভাবে, বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে না করে, ভাঁড়ের মতো মূকাভিনয়ের মাধ্যমে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পন্থায় করতে গেলেন কেন?"

মিস্টার ক্যাবপ্লেজারের ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেল।

"তাই করতাম, যদি না আমাকে বিয়ে করার আগে আর একটা বিয়ে করত গ্লোরিয়া।"

"কী বললেন?"

মুখভঙ্গি করলেন মিস্টার ক্যাবপ্লেজার। ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ ঘটালেন আচমকা। বুঝিয়ে দিলেন, কৌতুকাভিনয়ে তিনি কতখানি দক্ষ।

"আরে মশাই, ব্যাপারটা প্রমাণ করা যায় নিমেষে! ও নিজেই তো হেদিয়ে মরছে আসল স্বামীর খোঁয়াড়ে ফিরে যাওয়ার জন্যে। সে ভদ্রলোকের নাম শুনে আর দরকার নেই—নামের ডাকে গগন ফাটে—মুরোদ নেই এক পয়সা রোজগার করার—আমাকে শ্রীঘরে পাঠিয়ে তবে আমার ঘাড় থেকে নামতে চায় গ্লোরিয়া। তবেই তো হবে পোয়া বারো। বড় হিসেবী মেয়ে, মশায়।"

"কী আশ্চর্য, ওয়াটসন," স্বগতোক্তির সুরে বলে গেল হোমস—"শেষ মিসিং লিঙ্কটাও পেয়ে গেলাম। কী বলেছিলাম তোমাকে? ভদ্রমহিলা বিয়েতে পাওয়া 'মিসেস' উপাধিটার ওপর বড় বেশি জোর দেন? লোকে জানুক তিনি মিসেস ক্যাবপ্লেজার, ঢাকা থাকুক আর একটা মিসেস বৃত্তান্ত। মনের সঙ্গে ছলনা। অবচেতন মন কিন্তু তাঁকে হারিয়ে দিল।"

"গ্লোরিয়ার শৈত্য আমাকে শ্রান্ত করে তুলেছে। ওর প্রাধান্য আমাকে অবসন্ন করে তুলেছে। চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছি, এখন ইচ্ছে যায়, সময় পেলেই চুপচাপ বসে থাকি আর বই পড়ি। স্বীকার করছি, যা করেছি তা স্রেফ ইতরোমি।"

"ধীরে, ধীরে, আমি সরকারি পুলিশ নই।"

"আমার নাম ক্যাবপ্লেজারও নয়। পদবীটা আমাকে নিতে বাধ্য করেছে আমার কাকা—ব্যবসার পত্তন করেছিল যে এই কাকা। আমার আসল নাম ফিলিমোর—জেমস ফিলিমোর। আমার যা কিছু আছে, সবই গ্লোরিয়ার নামে লিখে দিয়েছি—ছাব্বিশটা দামি হিরে ছাড়া। জেমস ফিলিমোর নাম নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে চেয়েছিলাম—অভিশপ্ত, হাস্যকর নামের যাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলাম। আপনার বুদ্ধি-প্রাবল্যের কাছে আমি পরাজিত। যা বলবেন, তাই করব।"

"আরে না", অমায়িক গলায় বললে হোমস—"একটা ভুল এর মধ্যেই করে ফেলেছেন—যে ভুলটা আমার নজরে এসেছে পরে। দুধের গাড়ি যখন দোকানদারদের দরজার দিকে না গিয়ে সদর দরজার দিকে ধেয়ে যায়—তখনই তো ধাক্কা লাগে আমাদের গোটা সমাজ-ব্যবস্থায়। আপনার নতুন জীবনে আমার সাহায্য যদি চান—"

"সাহায্য করবেন?"

"তাহলে আসল নামের আড়ালে ভুলেও যাবেন না—কেউ না কেউ চিনে ফেলবেই। প্রয়োজনে কৌশল অবলম্বন করতেই হয়। যদ্দিন না পরলোকে রওনা হচ্ছেন, তদ্দিন ওয়াটসন আপনার অন্তর্ধান রহস্য অমীমাংসিত হিসেবেই লিখে রাখবে। নাম ভাঁড়িয়ে অন্য মানুষ হয়ে যান—মিস্টার জেমস ফিলিমোরকে যেন এই পৃথিবীতে আর না দেখা যায়।"

[অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়াল ও জন ডিকসন কার লিখিত "দ্য অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য হাইগেট মিরাক্‌ল" অবলম্বনে]

ছবি : সমীর সরকার

# বেঁটে মস্তান আর ইন্দ্রনাথ রুদ্র

অদ্রীশ বর্ধন

বেঁটে মস্তান জোরো চোখ রাখল হাতঘড়িতে। সাতটা বাজতে বাকি পাঁচ মিনিট। সময় হয়েছে যাওয়ার। সাড়ে সাতটার মধ্যেই খুনটা করতে হবে।

আঙুল বুলিয়ে নিল স্পেশালভাবে তৈরি গাড়ির স্টার্টার বোতামে। নিঃশব্দে পিছলে গেল গাড়ি সান্ধ্য ট্রাফিকের ভিড়ের মধ্যে।

মার্ডার প্ল্যানের ফাইনালে এই তুমুল বৃষ্টিটা দরকার। সেই আমেজ প্রকাশ পেল জোরো'র

মুখভঙ্গিমায়। দিন পনেরো আগেই খুন করতে পারত অনাময় দস্তিদারকে। কিন্তু সময় নিয়েছে অতি কষ্টে। আসুক বৃষ্টি ঝেঁপে, কাজ হবে ছেঁকে। রিমঝিম একটু বৃষ্টি হলেই কাম ফতে করা যেত, তবে ঝমাঝম বৃষ্টি হলে হবে আরও তোফা।

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে চলমান গাড়িকে সামলে রাখতে রাখতে বছরখানেক ধরে ভাবা প্ল্যানটাকে আর একবার মনে মনে ঝালিয়ে নিল জোরো। বৃষ্টি, হুইস্কি, রিভলভার—মনে মনে দাগিয়ে গেল একটার পর একটাকে। ফটোগ্রাফ, সুইসাইডের চিঠি, দারোয়ান সবশেষে, যে গল্পটা পুলিশকে শোনাবে—সেইটা। অতীব পারফেকশনিস্ট যে, যে ব্যক্তি নিজের কাজ পুরোপুরি নিখুঁত না হলে কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, সেইভাবেই খুঁত বের করল নিজের পরিকল্পনায়। রিভলভারটা। বানানো গল্পের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল জায়গা এইটা—এই রিভলভারটা তবে কী, নিখুঁত নিটোল কাজেও একটা না একটা দুর্বল জায়গা থাকেই। সেখানে ভাগ্যকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া উপায় থাকে না। সে ব্যাপারটাও থাকে হিসেবের মধ্যে। সে হিসেব তো করেই রেখেছে বেঁটে মস্তান। কিন্তু এই ঝুঁকি নিতান্তই সামান্য। অনাময় দস্তিদার খ্যাঁটকেল নাটক লেখে। নাট্যকার, কাজকর্ম সব ঘড়ি ধরে করে। ঝাড়া একটা বছর বন্ধু হয়ে থেকে ব্যাপারটাকে নখদর্পণে এনে ফেলেছে জোরো মস্তান।

রিভলভারটা ছাড়া গোটা প্ল্যানটা ফুলপ্রুফ। খুঁটিনাটি প্রতিটা ব্যাপার মনে মনে ঝালানো হয়ে গেছে অনেকবার, এমনকী এই রোববারটা পর্যন্ত। এমনই একটা রবিবার হওয়া চাই, যে রবিবারে বৃষ্টি ঝরবে একনাগাড়ে, টিপটিপ করে। বিশেষ কারণ আছে বলেই বৃষ্টিভেজা রোববারে খুনটা হওয়া চাই।

অনাময় দস্তিদার খ্যাঁটকেল প্রতিটা রোববারের বিকেলবেলাটা, থিয়েটারে কাটায়। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সাতটার সময়ে বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট বাড়ির নিজস্ব ফ্ল্যাটে। আজকাল অবশ্য কায়দা করে বলা হয় অ্যাপার্টমেন্ট। মার্কিনি ঢং। ননসেন্স! বৃষ্টিঝরা রাতে ট্যাক্সি নেয়। কিন্তু আজ নেবে না। আজ তাকে ফ্রি গাড়ি চড়ানো হবে। এই কারণেই তো বৃষ্টির মুখ চেয়ে বসে ছিল বেঁটে মস্তান। অনাময় খ্যাঁটকেল ফ্রি গাড়ি-চড়া পায়ে ঠেলবে না।

বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ড্রাইভ করতে করতে থিয়েটারটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল বেঁটে মস্তান। ওর আর একটা নাম আছে। গুলু। গুলু বললেই তামাম কলকাতা চিনে ফেলবে পয়মালটাকে।

আর এই গুলু নামটাকেই ব্যবসায় খাটাচ্ছে হারামজাদা অনাময় দস্তিদার। বিশাল বিশাল অক্ষরে লিখিয়েছে:

**গ্রেট গুলু ম্যাজিশিয়ান**

খুবই মনে ধরানো নাম। ক্যাচি নাম, ভিড় হচ্ছে খুব। নিশ্চয় ওর নামের জোরে মুচিপাড়ায় এরকম পয়মাল আগেও এসেছিল। কিন্তু গুলু নাকি সবাইকে ম্লান করে দিয়েছে।

স্লোগানটা গুলুর মনের স্মৃতির দরজা খুলে দিয়েছে। কত কথাই না মনে পড়ছে। চম্পার কথা মনে পড়লেই টনটন করে উঠছে বুকের ভেতরটা। এক সময়ে গুলুর অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল এই চম্পা। অমন সুন্দর বডিখানা পুড়ে ছাই হয়েছে শ্মশানে। অনাময় দস্তিদারটাকে মনে পড়ে গেল পরক্ষণেই। যে রাস্কেলটার জন্যে সুইসাইড করতে হয়েছে চম্পাকে? ব্লাডি অনাময়। ওই তো বেঁটে মর্কটের মতন চেহারা। কুতকুতে চোখ। ছাগুলে দাড়ির জন্যে আরও বিটকেল। চম্পাকে পটিয়েছিল পয়সা দেখিয়ে। ননসেন্স। চম্পাও কম যায় না। পয়সার দিকে ঢলেছিল।

সুবিখ্যাত নাট্যকার থিয়েটার থেকে যখন বেরচ্ছে ঠিক সামনেই গিয়ে ব্রেক কষল জোরো। খুশিতে নেচে উঠল মনটা। সেন্স অভ টাইমিং তার প্রখর। চিরকাল। তাই ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে।

ঝাঁ করে জানলার কাচ নামিয়ে বললে সোল্লাসে—'আরে! কী সৌভাগ্য! লিফট দিতে পারি?

অনাময় এমনভাবে গাড়ির মধ্যে উঠে বসল যেন গাড়িটা তারই। থিয়েটারি ঢং জানে বটে! রাস্কেল কোথাকার!

বলে গেল নায়কোচিত কায়দায়—'নিশ্চয় সেজন্য ঘুরপথে যেতে হবে না?'

'ধুস'! বলতে বলতে গাড়িকে ট্রাফিকের মধ্যে এনে ফেলল জোরো।

'আসলে আমার একটা ধান্দা আছে।'

'যথা?' হিরো-হিরো কায়দায় চোখ ছোট করে বললে অনাময়। ব্যাটাচ্ছেলে নাটুকে গিমিকগুলো রপ্ত করেছে ভালো।

'ওই যে নাটকটা আমাকে পড়ে শোনাতে বললেন, ওতে আমি একটা ভূমিকা চাই।'

খুকখুক করে হাসল অনাময়। হাসির মধ্যেও হিরো-হিরো ভাব। নাটক লিখে-লিখে নিজেকে হিরো মনে করে। স্কাউন্ড্রেল!

বললে 'ব্যাপারটা কী? আমার হাতের লেখা পড়তেও কি অসুবিধে হয়?'

কথাটা বলা হল এমনভাবে যেন স্রেফ হাতের লেখা দেখিয়েই কিস্তিমাত করে বসে আছে। গ্রেট গ্যান্ডাগুলাম!

হাসির ফাঁকে ফাঁকে চালিয়ে গেল অনাময়—হিরো-হিরো স্টাইলে—'টাইপ করিয়ে তোমাকে পড়তে দিলেই দেখছি ভালো হত। কচুপোড়া টাইপরাইটারটাকে আমি যে বাগে আনতে পারি না।'

অনাময়ের নিবাস যে ফ্ল্যাট বাড়িটায় সেটা আর বেশি দূরে নেই। মিনিটকয়েকের ড্রাইভিং। জোরো ঢুকে গেল গাড়ি নিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ির পেছন দিকের কার পার্কিং এলাকায়।

অনাময় ভারিক্কি চালে বললে—'আসা হোক ফ্ল্যাটে। হয়ে যাক এক গেলাস। নাটকটা একটু শুনে নাও। মালটা কীরকম দাঁড়িয়েছে, তোমার মুখে শুনতে চাই।'

বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে শাঁ করে ঘুরে গিয়ে ফ্ল্যাট বাড়ির পেছন দিকে চলে এল গাড়ি।

ঘাড় বেঁকিয়ে সুপিরিয়র ভঙ্গিমায় বললে অনাময়—'বিলিতি মাল এসেছে। বেস্ট হুইস্কি। চুমুক দিতে দিতে শুনলে মজা পাবে।'

হ্যাঁ, জোরো'র পানদোষ আছে। তাই সমানে খুঁচিয়ে যাচ্ছে রাস্কেলটা। মরণবাড় বাড়লে এইরকমই হয়। তারপর হবে খতম। গাড়ি থেকে নেমে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ছুটে ঢুকতে হল বিল্ডিংয়ের মধ্যে। হলঘর খাঁ খাঁ করছে। জনমানবশূন্য। জোরো তা জানে। জেনেশুনেই আজকের দিনটা বেছে নিয়েছে। রোববারে নাটকের মহড়া চলে, কিন্তু ফ্ল্যাট বাড়ির হলঘর ফাঁকা থাকে। বিশেষ করে সন্ধের দিকে। তবে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ইভনিং-ওয়াক সমাপ্ত করে ফিরবে অনেকে। মাস্টার-

প্ল্যানের মধ্যে সবই ছকে রেখেছে জোরো, সে কাঁছাখোলা খুনি নয়। লাশ ফেলে দেয় চোখের পাতা না কাঁপিয়ে, তারপর হাওয়া হয়ে যায় এমনভাবে কাকপক্ষীও টের পায় না। জোরো অকারণে হিরো হয়নি।

সেলফ্-সার্ভিস লিফটে ঢুকে গিয়ে গেট টেনে দিয়ে বারোতলার বোতাম টিপে দিল অনাময়। একটু পরেই ঢুকল নিজের ফ্ল্যাটে জোরো'কে পেছনে নিয়ে।

নাটকের এই জায়গাটায় কৌশলের দরকার। জোরো'র তা মনে আছে। মনে মনে ছক কষে রেখেছে তো অনেক আগে। কোনও কারণে যদি অনাময় রাস্কেল ওর অটোমেটিকটা যে জায়গায় রাখার কথা সেখানে না রেখে অন্য জায়গায় রাখে, তাহলেই প্ল্যান কেঁচে যাবে। অনাময়ের ফ্ল্যাটে তো আগে কখনও আসেনি জোরো, কিন্তু দুজনেরই বন্ধুস্থানীয় একজনকে বলতে শুনেছে লোডেড রিভলভারটা রাখে লেখবার টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ারে।

সোফায় বসতে বসতে বললে অনাময় কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমায়—'আমার নতুন নাটকটা নিয়ে কী যেন বলছিলে? তার আগে হয়ে যাক এক গেলাস।'

'থাক, এই অসময়ে নো ড্রিঙ্ক', হিরো-হিরো ভঙ্গিমায় অফারটাকে পাশ কাটিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল জোরো। এখান থেকে পয়াকার দেওয়ার সময়ে মুখের হুইস্কির গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে যাওয়াটা যে সমীচীন নয়, মুখ ফুটে তা তো বলা যাচ্ছে না অনাময়কে। বিশেষ করে এই সময়টায় তো তার থাকার কথা নয় এখানে... বানানো অ্যালিবি অনুসারে।

'বটে? বটে? বটে?' ব্যঙ্গ বঙ্কিম স্বরে হিরো-হিরো স্টাইলে শব্দ তিনটে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে ডিক্যান্টার নিয়ে ব্যস্ত হল অনাময়। কাষ্ঠ হাসি হেসে নিল জোরো। বিলিতি মালের টেস্ট আলাদা। কিন্তু এখন নয়। গিলুক রাস্কেল অনাময়, যত গিলবে, কাজটা তত সহজ হয়ে যাবে। পুলিশ এসে দেখুক সব স্বাভাবিক।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার ধরে টান দিল জোরো। ড্রয়ার বেরিয়ে এল না, লক করা রয়েছে। কিন্তু এর জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে জোরো। অনাময় এখনও হুইস্কি নিয়ে তন্ময়।

ইস্পাতের একটা পাতলা পাতি বের করল পকেট থেকে। ঢুকিয়ে দিল তালাচাবির ফুটোয়। মাথায় তো প্রায় ফুট তিনেক, চাবির ফোকর বুকের প্রায় কাছাকাছি। পাকা হাতে কয়েকটা মোচড় দিতেই তালা খুলে গেল। এই ব্যাপারটায় জোরো ওস্তাদ, মস্ত আর্টিস্ট।

জোরোর হাতের চেটো একটু বেশি রকমের চওড়া। ঘামে ভিজে গেল চেটো ড্রয়ার টেনে বের করতে গিয়ে। এই প্রথম সন্দেহ খচখচ করে গেল মনের মধ্যে, রিভলভারটা যদি না থাকে ভেতরে? যদি হঠাৎ ঘুরে বসে অনাময়! মাই গড! সত্যিই তো রাস্কেল ঘুরে বসছে এদিকে!

ক্ষিপ্তের মতন ড্রয়ার ধরে টানাটানি করে গেল জোরো। ড্রয়ার বেরিয়ে এল খুপরি থেকে, একটু ঝাঁকুনি দিয়ে, জ্যাম হয়ে থাকলে যা হয়—তারপরেই বেরিয়ে এসে ঝুলে পড়ল নীচের দিকে। অনাময় যখন মুখ ফেরাচ্ছে এদিকে, জোরোর হাত কখন ঢুকে গেছে ভেতর দিকে।

'হচ্ছেটা কী' চিল-চিৎকার করে ঠিকরে এসেছিল অনাময়ের গলা থেকে, ততক্ষণে কিন্তু রিভলভার বের করে নিয়েছে জোরো নলচে ধরেছে নাট্যকারের পেট লক্ষ করে। 'এটা কী ধরনের ইয়ারকি?' ওই পর্যন্তই বলতে পেরেছিল নাট্যকার, তারপরেই জোরো আর কথা বলতে দেয়নি।

'ইয়ারকি নয়, ইয়ারকি নয়, মাই ডিয়ার অনাময়। আপনার নাটুকে চোখে ইয়ারকি মনে হতে পারে, আমার চোখে নয়।'

পাকা হাতে রিভলভারটাকে নাচিয়ে নিয়ে হুকুমটা ছাড়ল পরক্ষণেই—'গেলাসটা হাতে নিয়ে উঠে আসুন', 'ঈষৎ দাঁত খিঁচিয়ে—'না, না, বোতলটা রেখে আসতে হবে না, এখানে আসুক, আকণ্ঠ ড্রিঙ্ক করতে হবে যে। তাতে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট মনে হবে—সুইসাইড।'

'সুইসাইড?' বোমার মতন ফেটে পড়ল অনাময়—'মাথাটা বিগড়েছে নাকি?'

'নাটক ছাড়ুন। দেখবার লোক আমি ছাড়া কেউ নেই।' রিভলভার নেচে নেচে উঠল মুঠোর মধ্যে। লাফিয়ে গিয়ে অনাময়ের মাথায় নলচে চেপে ধরে তুলে এনে বসাল ঘোরানো চেয়ারে।

'হুইস্কি খান। হাতের গেলাস শেষ করুন।'

ছ' ফুট হাইটের নাট্যকার গনগনে চোখে চেয়ে রইল তিন ফুট হাইটের বেঁটে মস্তানের দিকে। চেপে রইল ঠোঁটজোড়া। জোরো'র আঙুল চেপে বসে গেল ট্রিগারে, প্রথম চাপ দিলেন তৎক্ষণাৎ।

'ড্রিঙ্ক!' যেন সাপের হিসহিসানি শোনা গেল গলায়।

দ্বিরুক্তি না করে গেলাসের সব হুইস্কি গলায় ঢেলে দিল অনাময়। এগিয়ে গিয়ে বোতলটাকে টেবিলে এনে রেখে বললে জোরো—'আরও!'

পর পর তিনটে গেলাস শেষ করবার পর চোখে জল এসে গেল অনাময়ের। কান্না-কান্না গলায় বললে—'ব্যাপারটা কী? মতলব কী তোমার, কী চাই বললেই তো হয়?'

দাঁত-খিঁচোনো শয়তানি মার্কা হাসি হেসে জোরো বললে চিবিয়ে চিবিয়ে... সাধু ভাষায় যাকে বলা হয় নেকড়ে হাসি—'ওই নাটকটায় আমার একটা রোল চাই। আরে না, বাজে বকছি না। নাটক তো সঙ্গেই এনেছি।'

বাঁ হাত ঢুকে গেল পকেটে, টেনে বের করে আনল এক তাড়া কাগজ—'আপনার স্ক্রিপ্ট থেকে ছিঁড়ে এনেছি। শুনুন, পড়ছি।'

'একটা সময়ে ভেবেছিলাম তাকে ছাড়া বেঁচে থাকতে পারব না। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি, ওকে ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব। সে যেখানে, আমাকেও যেতে হবে সেখানে।' আহা! মন যে ছুঁয়ে যাচ্ছে! বেড়ে লিখেছেন মাইরি!'

অনামায়ের জিভে ততক্ষণে জড়তা এসে গেছে। পর-পর তিনটে পেগ, কম নয়—'আ-আমি তো কিছুই বু-বুঝতে পা-পারছি না!'

'এখুনি বুঝবেন, হাড়ে হাড়ে। ততক্ষণ বোতলটাকে শেষ করুন অন্তত আর একটা গেলাস। পারবেন, পারবেন, পেটে তো টালার ট্যাঙ্ক আছে।'

অনাময়কে ফের গুঁতোনোর দরকার ছিল না। কানায় কানায় গেলাসটা ভরে নিয়ে চোঁ করে গিলতে গিয়ে খানিকটা হুইস্কি গড়িয়ে পড়ল কষ বেয়ে। হাত দিয়ে কষ মুছে চোখ তুলে যখন তাকিয়েছে অনাময়, জোরো ততক্ষণে বাঁ হাত দিয়ে বুক পকেট থেকে এক লাস্যময়ী তরুণীর ফটো বের করে তুলে ধরেছে শূন্যে। আড়াআড়িভাবে লেখা রয়েছে ফটোতে 'শুধু তোমার জন্যে'।

অনাময়কে দেখিয়ে দেখিয়ে ফটোটা নাড়তে নাড়তে বলে গেল জোরো—'চিনতে পারছেন?'

জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বললে অনাময়—'মহুয়া মুখার্জি!' গলা কেঁপে গেল পরক্ষণেই। বোঝা হয়ে গেছে ব্যাপারটা—'জোরো, বিশ্বাস করো। আমি কিচ্ছু জানতাম না, বলেইনি আমাকে।'

'শট আপ!' আচমকা কর্কশ হয়ে গেল জোরো'র কণ্ঠস্বর—'আপনিই খতম করেছেন। গলা টিপে ধরে পুরীর জলে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। এবার আপনার পাল্লা। বাস্টার্ড, ব্লাডি সোয়াইন! কীরকম লাগছে, অনাময়?'

এবার মরিয়া হয়ে যায় অনাময় দস্তিদার—'তুমি কিন্তু পার পাবে না। খুন করে ফাঁসিতে ঝুলবে।'

'খুন?' বিতিকিচ্ছিরি হেসে বললে জোরো 'শব্দটা বড্ড কড়া। মালবিকাকে যখন খতম করেছিলেন, তখন কিন্তু অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল।'

'আমি তো মার্ডার করিনি। সুইসাইড করেছিল মালবিকা।'

'তা বটে। জাহান্নমে নামিয়ে দিয়েছিলেন বলেই নিজেই নিজেকে শেষ করেছিল!'

জোরো'র চোখের আগুন আর ঘৃণা বিচ্ছুরণের ওপর চোখ রাখতে পারল না অনাময়। নিঃসীম আতঙ্কে সে তখন কুঁকড়ে গেছে। পাপবোধের অনল এইভাবেই তিল তিল করে দহন করে। চিতার আগুন নিমেষমাত্র বললেই চলে সে তুলনায়।

তোতলাতে তোতলাতে কোনওমতে বলে গেল অনাময়—'জোরো, জোরো, বিশ্বাস কর, সব কথা খুলে বললেই তো হত। বলল না কেন? আমি তো বিয়েও করতাম?'

'বিয়ে করতেন? মালবিকাকে? বিয়ে—বিয়ে করতেন? ইউ বাস্টার্ড! এরকম বিয়ে আর কটা করেছেন? সেগুলো তো পগারের মাল! এ মেয়ে ছিল দেবকন্যা! ওর পা চাটবার মতন পুণ্যও আপনি অর্জন করেননি।'

বলতে বলতে গনগনে হয়ে ওঠে জোরো'র কদাকার মুখাবয়ব। শেষ করে গলার মধ্যে যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়ে—'মরেছে, বেঁচেছে, নইলে তিলে তিলে পচে যেত!'

কুয়াশা ঘনিয়ে ওঠে বড় বড় চোখে শেষ কথাগুলো বলবার সময়ে। থিরথির করে কাঁপতে থাকে পুরু ঠোঁট।

মুখের কথায় কিন্তু দেখা গেল আশ্চর্য নরম ছোঁয়া— 'বড় সুন্দরী ছিল মেয়েটা। রিয়ালি বিউটিফুল। মনটাও নরম. তুলোর মতন।

মিষ্টি। আমি বেঁটে মর্কট বলে কখনও হাসেনি, ভেংচায়নি। ছিমছাম মানুষ যেন আমি, আগাগোড়া দেখে গেছে আমাকে বড় বড় চোখে, তাই তো অত ভালো বেসেছিলাম....' চোখে জল এসে গেছে বামনাবতার জোরো'র গুলি-গুলি চোখে—'ইয়েস ইয়েস, ভালোবেসেছিলাম দিনকয়েক আমাকেও ভালোবেসে ছিল....দিনকয়েক বা মাসকয়েক.... ভগবানে জানে...কিন্তু ওর তো সময়ের দাম আছে....যেমন আছে বডিটার...মানে, ছিল.,...এখন নেই....কদ্দিন আর খেলবে আমার মতন একটা বাঁদর নাট্যকারকে নিয়ে! হেঃ!' সজোরে ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে মনটাকে শক্ত করে নেয় জোরো—

'তাই তো মন ঠিক করে নিয়েছি। যেমন কুকুর. তেমন মুগুর। অনাময়, খুন আমি করবই। দু'বার করতে পারলে মনের ঝাল মেটাতে পারতাম পুরোপুরি।'

গুঙিয়ে উঠল অনাময়—'মাথাটা খারাপ হয়েছে মনে হচ্ছে! বোকাচন্দর, আমাকে মার্ডার করলে পুলিশ তো তেলেভাজা করে ছাড়বে।'

'পুলিশ! এসে দেখবে একটা অতীব ট্র্যাজিক সিন। রোববারের দৈনিকগুলোর পাতা জমে যাবে বড় বড় হরফের হেডলাইন আর গরম গরম মার্ডার ডেসক্রিপশনে। স্টেজ জমাতে হয় কীভাবে, আমার তা জানা আছে। একটু পরেই কেয়ারটেকার উঠবে সিঁড়ি বেয়ে, করিডরের, চেকপয়েন্ট দেখে দেখে ঘড়ি মিলিয়ে যাবে। এই ফ্লোরে এসে দেখবে আমি তোর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপছি...ও ব্যাটাচ্ছেলে তো কানে কম শোনে... আমার ফায়ারিংয়ের আওয়াজ নাও শুনতে পারে... ওরকম আওয়াজ তো আকছার হচ্ছে পথেঘাটে,... দেখবে আরও একটা ব্যাপার...মেজাজ খিঁচড়ে যাওয়া মুখ নিয়ে কলিংবেল টিপেই যাচ্ছি... ভেতরের মোলায়েম ডিংডং ঘণ্টা বেজেই চলেছে....

কিন্তু নড়ছে না... কেন নড়বে? আমি যে জানি মানুষটা রয়েছে ভেতরে.... ঘুমোচ্ছে... মড়া ঘুম।

কেয়ারটেকার তখন দোসরা চাবির গোছা বের করবে। দরজা খুলে যাবে। আমি ভীষণ আঁতকে ওঠা মুখ নিয়ে তোর মড়াটার দিকে তাকিয়ে থাকব। তুই তো তখন মুখ গুঁজরে পড়ে থাকবি তোরই টেবিলে, হাতের মুঠোয় থাকবে তোর নিজের এই রিভলভার। হাতের তলায় চাপা থাকবে সুইসাইড নোট....নিজের হাতে লেখা আত্মহত্যা করার চিঠি... মাথার কাছে থাকবে মালবিকা'র ফটো...এখন যেটা রয়েছে টেবিলে।' বিকৃত বেসুরো হাসি ঠিকরে আসে জোরো'র গলা দিয়ে—'এই সেই চিঠি, যা ছিল তোর পাণ্ডুলিপিতে... কেটে নিয়েছি কাঁচি দিয়ে... তোর মরণবাণ.... আরও কিছু ফিনিশিং টাচ দেব এখুনি... গুলিটা করবার পর...হাতের কাছে থাকবে উলটে যাওয়া মদের গেলাস... গেলাসের মদ গড়িয়ে যাবে টেবিলে...

গেলাসটা থাকবে বাঁ হাতের কাছে.... যে হাতে থাকবে না রিভলভার... থাকবে ডান হাতের কাছে। বিউটিফুল পিকচার! তাই না পাপিষ্ঠ অনাময়?'

জোরো'র পুঁতি-চোখ আরও ছোট হয়ে গেল শেষ কথাগুলো বলবার সময়ে। দেঁতো হাসিতে এখন নির্মম ঝলক, রিভলভার তুলে ধরল অনাময়ের রগ টিপ করে।

'জোরো! জোরো! একটা ব্যাপার মাথায় নেই কেন? জোরো—'

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে এসে ভিজিয়ে দিল অনাময়ের মুখাবয়ব।

জোরো যেরকমটা ভেবে রেখেছিল, কেয়ারটেকার ঠিক সেইভাবেই অ্যাকশন নিতেই পুলিশ এসে গেল ধড়ফড় করে, সঙ্গে ইন্দ্রনাথ রুদ্র। থানায় বসেছিল আড্ডা মারবার জন্য। না আসা পর্যন্ত ঘরময় পায়চারি করে গেল জোরো। দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ কেটে কেটে বসে রইল কপালের রেখায় আর চোখের চাহনিতে। ট্রিগারটা বেশি তাড়াতাড়ি টেনে ফেলেনি তো? অনাময় বলেছিল, জোরো নাকি একটা ব্যাপার মাথায় রাখেনি। সত্যি কি? পুরো নাটকটা মনে মনে ঝালিয়ে গেল আর একবার। না। ভুল নেই কোথাও।

কেয়ারটেকারের পথ চেয়ে বসে না থেকে লিফট নিয়ে নেমে গেলেই তো হত। গাড়ি নিয়ে ভাগলবা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাতে ঝুঁকি বেড়ে যেত। গাড়িটাকেই তো অনেকে দেখে ফেলত। বাড়িতে যারা ঢুকছে বৈকালিক ভ্রমণ সাঙ্গ করে, তারাও দেখতে পেত জোরোকে। না, আগের প্ল্যানটাই ভালো। কেয়ারটেকারকে দিয়েই বডি খুঁজে নেওয়া যাক।

কিন্তু অনাময় যে বাড়ির বাইরে গেছিল, সে ব্যাপারেও

কেয়ারটেকারের ওয়াকিবহাল থাকা দরকার।

পুলিশ এসে গেল বায়ুবেগে। জোরো তাদের জেরার জবাব দিয়ে গেল ঠান্ডা গলায়। চোখের পাতা না কাঁপিয়ে।

হ্যাঁ, মরা মানুষটার প্রাণের বন্ধু ছিল জোরো। হ্যাঁ, এই লোকটার জন্যেই যে সেই মেয়েটা সুইসাইড করেছে, জোরো তা জানে না, তা নিয়ে বন্ধু অনাময়ের মনের মধ্যে কোনও অনুতাপ ছিল বলে তার জানা নেই। হয়তো বেশি মাল টেনে অনুতাপে জ্বলেপুড়ে গেছিল। না, এর আগে কখন অনাময়ের ফ্ল্যাটে সে আসেনি। হ্যাঁ, একাই এসেছিল, নিজে লিফট চালিয়ে, এতগুলো তলা হেঁটে উঠতে যাবে কোন দুঃখে লিফট যখন চালু রয়েছে?

কী? কী বললেন? বারোতলা লিফট বোতাম পর্যন্ত হাত গেল কী করে?

'আমি... আমি—'

কথা জড়িয়ে গেল জোরো দ্য ওস্তাদের। অনাময় এই খুঁতটাই বলতে গেছিল! আর মোক্ষম এই ব্যাপারটাই স্রেফ ভুলে মেরে দিয়েছিল জোরো দ্য গ্রেট!

মাত্র তিন ফুট হাইট যার, সে তো লিফটের একদম ওপরতলার বোতাম টিপতে পারে না! নাগালের বাইরে যে!

ধুতি পাঞ্জাবি পরা ধুরন্ধরটা ঠিক এই প্রশ্নটাই করে বসেছে।

ইন্দ্রনাথ রুদ্র। নামটা আগে শুনেছিল জোরো, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝল, কবি কবি চেহারা থাকলেও ব্রেনটা খাসা স্কাউন্ড্রেলটার।

**অঙ্কন : ইন্দ্রনীল ঘোষ**

# ভৈরব মন্দিরের রহস্য

## অদ্রীশ বর্ধন

রোমাঞ্চ ভালবাসেন? তাহলে আসুন সমুদ্রের ধারের এই জঙ্গলে।

এ জঙ্গল বটের জঙ্গল নামে বিখ্যাত। মূল গুঁড়িগুলোর সন্ধান পাওয়া মুশকিল। ঝুরি নেমেছে অগুন্তি। তলায় উঁচুনিচু বালি। বটের শেকড় এই বালির মধ্যে দিয়ে পাতালে প্রবেশ করেছে। তারপর নিশ্চয় দূরের ঐ দীঘি থেকে জল আহরণ করছে।

চতুষ্কোণ এই দীঘিতে ময়লা নেই। পরিষ্কার জল। পাথর দিয়ে বাঁধানো চারদিক। জোড়ের মুখে সবুজ আগাছা।

দীঘিতে ঘাট একটাই। মন্দিরটা রয়েছে এইদিকে। মন্দির থেকে বেরোলেই পাথরের সিঁড়ি। দীঘির এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত। ধাপগুলো নেমে গেছে টলটলে পরিষ্কার জলে। এ পাশের মন্দির আর তিন পাশের জঙ্গলের প্রতিবিম্ব পড়ে এই জলে।

এখন বেশ গরম। চৈত্র মাস। সমুদ্রের ধারে বালির গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। কিন্তু এই জঙ্গলে গরম নেই। গা জুড়িয়ে যায়। অথচ বালি রয়েছে পায়ের তলায়।

মন্দিরটার বয়স হাজার বছরেরও বেশি। বড় বড় পাথর সাজানো একটার পর একটা। এই পাথরের ভারেই গোটা মন্দিরটা পাতালে প্রবেশ করেছে মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়। উঁচু পাথরের ধাপগুলো বেয়ে নিচে নামতে হয় মাথা হেঁট করে—নইলে পাথরের খিলেনে মাথা ফাটবে।

আপনিও আসুন মাথা হেঁট করে। ধাপ শেষ হয়েছে। সরু গলিটা দেখে ভয় পাবেন না। কোনোমতে একজন মানুষ যেতে পারে এই গলি দিয়ে। অন্ধকার। পায়ের তলার পাথর যে ভিজে, তা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন? জুতো খুলে এসেছেন বাইরে, মনে আছে?

কি বুঝছেন? পাথরের ভিজে মেঝে একটু গরম? অথচ আপনি জঙ্গলের লেভেলের নিচে নেমে এসেছেন। ও পাশের দীঘির জলও এখন আপনার মাথার ওপর। তবে কেন ভিজে পাথর গরম?

ভৈরব ঠাকুরের কৃপায়। তাঁর অলৌকিক প্রভাবে স্যাঁতসেঁতে পাথরও গরম থাকে বারো মাস। এর পেছনে বিজ্ঞান আছে কি নেই, তা জানতে গেলে রোমাঞ্চ মাঠে মারা যাবে। আপনি এগিয়ে যান। ভয় নেই। অন্ধকার এই গলির শেষে আছে আরও রহস্য—আছে মশালের আলো।

এসে গেছেন। ঘরটা গরম মনে হচ্ছে, এই তো? হবেই তো। এ ঘরের ছাদে, দেওয়ালে, মেঝেতেও বড় বড় পাথর। ভিজে ভিজে। হয়তো পাশের দীঘির জল চুঁয়ে চুঁয়ে ঢুকছে। কিন্তু ভৈরব ঠাকুরের সান্নিধ্যে তা গরম হয়ে রয়েছে।

এ ঘরে মশাল জ্বলে চব্বিশ ঘণ্টা। দেওয়ালে ঝোলানো পাথরের আংটায় লাগানো জ্বলন্ত মশালের তলায় পাথরের বেদীতে ঐ যে মেয়েটি বসে রয়েছে হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে—ওকে চিনে রাখুন।

ওর নাম সন্ধ্যা। গায়ের রঙ কালো হলেও ওর মুখশ্রী নিশ্চয় আপনাকে থমকে দিয়েছে। বয়স ওর কুড়ির মধ্যে। কিন্তু মনে হয় আরও কম। ছিপছিপে চেহারা। দুই ভুরুর মাঝে লাল সিঁদুরের লম্বাটে টিপ দেখে কি ভাবছেন? এলোচুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে থাকায় মশালের লালচে আলোয় ঐ মুখ দেখে ভয় আর ভক্তি দুটোই মনের মধ্যে জাগছে? তাই না?

সন্ধ্যাকে ভৈরব ঠাকুর পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন। সে দেবদাসী। এই মন্দিরের সব কাজ তাকে করতে হয়। তার আর কেউ নেই। এর বেশি এখন আর জানতে চাইবেন না।

সন্ধ্যা দু-পা মুড়ে হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে বিশাল ঐ যে দরজাটার দিকে, ওর ওপারে রয়েছে মন্দিরের গর্ভগৃহ। মশালের আলোয় ভাল দেখা না গেলেও, জেনে রাখুন দেড় মানুষ সমান উঁচু ঐ পাল্লা দুটো কাঠের হলেও আগাগোড়া যে ধাতু দিয়ে মোড়া তাতে মরচে পড়ে না কখনো। মন্দির যিনি নির্মাণ করেছিলেন, তিনি জানতেন ভিজে ভিজে এই পাতালঘরে লোহার পাতে মরচে পড়বে। তাই কপাট মুড়েছেন রুপোর চাদর দিয়ে।

অবাক হচ্ছেন? হবেন না!। ভৈরব ঠাকুর যে ভাণ্ডাররক্ষক। এখান থেকে দু মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে কেল্লার মতো প্রাচীর দিয়ে ঘেরা যে বিশাল মন্দিরটা আপনি দেখে এসেছেন—সেই মন্দিরের বিপুল ঐশ্বর্য পাহারা দিচ্ছেন ভৈরব ঠাকুর।

এমন কথাও শোনা যায়, রাত্রি নিশীথে ভৈরব ঠাকুর এ মন্দির থেকে দূরের ঐ মন্দিরে যান পাতাল-সুড়ঙ্গ দিয়ে। পাথর বাঁধানো সেই সুড়ঙ্গের মুখ কোথায় আছে, কেউ জানে না।

সন্ধ্যা সন্ত্রস্ত হয়েছে। বিশাল কপাট আওয়াজ করে খুলে যাচ্ছে। তার কাজলটানা কালো চোখ আরও কালো হয়ে উঠছে। কারণ, সে আসছে।

সে এসেছে। খোলা দরজায় সে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে সন্ধ্যার দিকে। কিন্তু কি যেন ভাবছে।

এই ফাঁকে তাকে আপনি দেখে নিন ভাল করে। লম্বায় ছ' ফুট, তাই না? সেই অনুপাতে মাংসল বপু। খালি গা, পরনে শুধু একটা লাল কাপড়—লুঙ্গির মতো করে পরে আছে। কপালে সিঁদুর লম্বা করে টানা। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের ওপর চোখ দুটো বাজপাখির চোখের মতো ক্রূর, কঠিন, শাণিত।

এর নাম ভৈরব ভটচায। বংশপরম্পরায় এই মন্দিরের পুরোহিত। ভৈরব ঠাকুরের নামে নাম দিয়ে এর পিতৃদেব ভালই করেছিলেন। ভৈরব ভটচাযকে লোকে বলে স্বয়ং ভৈরব ঠাকুর।

ভৈরব দাঁড়িয়ে থাকুক দোরগোড়ায়। আপনি নির্ভয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকুন। আপনি এসেছেন কৌতূহল নিয়ে। আপনার গতি সর্বত্র।

হ্যাঁ, এই হলো মন্দিরের গর্ভগৃহ। ছাদ দেখতে পাচ্ছেন না? মশালের আলো অত উঁচুতে পৌঁছোচ্ছে না। এখানেও মশাল জ্বলছে। ইলেকট্রিকের আলো এ মন্দিরে আনা হয়নি ইচ্ছে করেই। মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে।

আসলে কারণটা অন্য। শুধু আপনাকেই জানানো যায়। গর্ভগৃহটা চৌকোনা। ঠিক মাঝখানে পাথরের পাঁচিল দিয়ে বাঁধানো একটা পাতকুয়ো। গহ্বরের ওপরে ঝুলছে একটা সোনার মুকুট। মন্দিরের চুড়ো থেকে শেকল নেমে এসে ঝুলিয়ে রেখেছে এই মুকুটকে।

না, বিগ্রহ নেই। ভৈরব ঠাকুর নামে যে দেবতার পুজো হয় এই মন্দিরে—তাঁর কোনো বিগ্রহ কেউ কখনো দেখেনি। তিনি বায়ুশরীর নিয়ে থাকেন এই পাতাল গহ্বরে। তাঁকে দেখা যায় না। কিন্তু তিনি যে অতুল বৈভব পাহারা দিয়ে চলেছেন, তার প্রমাণ ঐ সোনার মুকুট।

আপনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন দীঘির দিকে মুখ ফিরিয়ে। ঐ দিকের দেওয়ালে অনেক উঁচুতে একটা ফাঁক দেখতে পাচ্ছেন? পাতাল-ঘরে বাতাস যাতায়াতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন মন্দিরনির্মাতা। এত উঁচুতে যে বাইরের লোক বাইরে থেকেও ঐ ফোকরের নাগাল পায় না—চোখেই পড়ে না; ভেতর থেকেও ওখানে লাফিয়ে যাওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

এবার তাকান মেঝের দিকে। হরিণের চামড়াটা ভৈরব ভটচাযের পুজোর আসন। সামনেই কোষাকুষি। অন্যান্য পুজোর সরঞ্জাম। তার পাশের জিনিসটা এই পরিবেশে খাপছাড়া লাগছে। সবুজ রঙের প্লাস্টিকের জাগ। তার পাশে একটা সবুজ প্লাস্টিকের গেলাস। শরবত সেট-এর গেলাস নিশ্চয়। কিন্তু এখানে কেন?

কারণ, রাত ঠিক এগারোটার সময়ে ভৈরব ভটচায মদ্যপান করবে। ঐ জাগে ভর্তি আছে মদ।

রাত এগারোটা বাজতে মিনিট দশেক বাকি।

ভরাট গম্ভীর গলায় বলল ভৈরব—"সন্ধ্যা, তুই তৈরি?"

অদ্ভুত টেপা গলায় জবাব দিল সন্ধ্যা—"হ্যাঁ, ঠাকুর।" কণ্ঠস্বরে যৌনতা মাখানো। পুরুষ শরীরের রক্ত চনমনে করে তোলে।

একটু থেমে বলল ভৈরব ভটচায—"আজ রাতেই রওনা হব। এত বছর ধরে যে রত্নগুলো পাহারা দিয়ে এসেছে আমার পূর্বপুরুষরা—সেগুলোও নিয়ে যাব সঙ্গে।"

সন্ধ্যা বলল একই রকম রক্ত-ছলকে-ওঠা গলায়—"হ্যাঁ, ঠাকুর। সে আসবার আগেই আমাদের পালাতে হবে।"

"তুই আর একটু বোস", বলে ভেতরে গিয়ে পাল্লা দুটো চেপে বন্ধ করে দিল ভৈরব ভটচায। স্যাঁতসেঁতে ঘরে পাল্লা' ফুলে উঠেছিল এমনিতেই। চেপে বসাতেই এঁটে বসে গেল।

আবার হাঁটুতে থুতনি রেখে বসল সন্ধ্যা। আর ঠিক এই সময়ে শব্দটা ভেসে এল সরু গলিপথ থেকে।

কে যেন আসছে পা টিপে টিপে।

ত্রস্তে মুখ তুলেছিল সন্ধ্যা। পায়ের আওয়াজ নতুন লোকের। অন্ধকারে হনহন করে আসছে না। নতুন ভক্তরা পুজো দিতে এলে এইভাবেই আসে। পা ঘষটে ঘষটে।

কিন্তু এত রাতে পুজো দিতে তো কেউ আসে না?

ভুরু কুঁচকোয় সন্ধ্যা। মশালের আগুনের আভায় যেন জ্বলে ওঠে কপালের টানা লম্বা টকটকে লাল সিঁদুরের দাগ।

ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে সৌরভ। 'সুখবর' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার সৌরভ গুহ।

চোখ ছোট হয়ে যায় সন্ধ্যার। এই লোকটা আজ সকালে এসেছিল বউকে নিয়ে পুজো

দিতে। ভৈরব ঠাকুরের মাহাত্ম্য নিয়ে অনেক কথা জানতে চেয়েছিল। পরিচয়টা তখনই পাওয়া গেছিল। দেবদেউল প্রসঙ্গে ধারাবাহিক লেখার পরবর্তী কিস্তি হোক ভৈরব ঠাকুরের মন্দির।

সন্ধ্যা অথবা ভৈরব ভটচায বেশি কথা বলেনি। তবে এত রাতে লোকটা এখানে কেন?

বেদী থেকে নেমে এল সন্ধ্যা।

সেইদিনকার দুপুরের একটা দৃশ্যে ফিরে আসুন।

'সৈকত-আলয়' হোটেলের বারান্দায় বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে গল্প করছিল সৌরভ আর মৃদুলা। দুজনকেই ভগবান বিশেষ যত্ন নিয়ে বানিয়েছেন। দুজনের দিকেই বারে বারে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে যায়।

সৌরভের বয়স আটাশ। খাপখোলা তলোয়ারের মতো ধারালো তনুবর। চোখ-মুখ শাণানো। গালে অল্প দাড়ি মুখাবয়বকে আরও দৃপ্ত করে তুলেছে। ব্লু জিনস প্যান্ট আর সোনালী মুগার পাঞ্জাবি তার প্রিয় বসন। চূড়ান্ত আঁতেল চেহারা।

মৃদুলার বয়স মোটে পঁচিশ। ইংরেজী স্কুলে-পড়া মেয়ে। মুখের রোশনাইকে বাড়িয়ে তোলার মন্ত্রগুপ্তি সে জানে। প্রসাধন বাহুল্যে নয়—চাহনি আর রসনার কায়দা দিয়ে। তার তাকানো দেখলেই বুক উত্তাল হয়, কথা শুনলেই বেশি এগোতে সাহস হয় না। পঁচিশ বছরের জ্বলন্ত যৌবনের আঁচ সহ্য করা যায় না।

দুপুর দুটো। সমুদ্রে বড় বড় ঢেউয়ে চড়া রোদ ঠিকরে যাচ্ছে। দামাল হাওয়ায় মৃদুলার ছোট করে ছাঁটা চুলও গালে-মুখে লেপটে যাচ্ছে।

ওরা এইমাত্র ভৈরব ঠাকুরের মন্দির দেখে এসেছে। এ মন্দিরে সাধারণ পুণ্যকামীরা যায় না। অনেক দূর বলে। তারা যায় কেল্লার মতো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দূরের ঐ মন্দিরটায়।

হোটেল-মালিকের কাছে খবরটা পেয়েই দৌড়েছিল সৌরভ। ভাণ্ডারক্ষকের দেউল দেখবার বাসনা না থাকলেও বটের জঙ্গলের হাওয়া খেতে সঙ্গে গেছিল মৃদুলা।

মৃদুস্বরে এই প্রসঙ্গ নিয়েই কথা বলছে দুজনে। এমন সময়ে ডান দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল এক পুরুষ।

সেইদিকে এক ঝলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার ফিরে তাকিয়েছিল মৃদুলা। বলেছিল অস্ফুট স্বরে—"ইন্দ্রনাথ রুদ্র।"

সচমকে সেদিকে তাকিয়ে বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভের ধ্যানমগ্ন রূপ দেখতে পেল সৌরভ। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। লম্বা চুল উড়ছে হাওয়ায়। চোখে সুদূরের স্বপ্ন।

নাম শুনেছিল অনেক। চোখে দেখল এই প্রথম। কবি-কবি চেহারার এই মানুষটার বজ্রকঠিন রূপ কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে মৃগাঙ্ক রায়ের বহু উপন্যাসে, বহু গল্পে।

ব্যক্তিত্ব বটে। মুগ্ধ হয় সৌরভ। বিমুগ্ধ হয় মৃদুলা।

দুই বাহু তুলে সৌরভকে জাপটে ধরে।

মশালের কাঁপা আলোয় দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে আছে।

সৌরভ দেখছে রাত ঘন হতেই সন্ধ্যার চেহারা পাল্টে গেছে। এখন তার লম্বা দেহটাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নস্যি রঙের কটকী শাড়ি উদ্ধত যৌবনের বাঁকাচোরা রেখাগুলোকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। তার কালো জামের মতো কালো চোখ আরও কালো আর মদির হয়ে উঠেছে কাজলের পুরু প্রলেপে। মিশকালো নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে অবরুদ্ধ আবেগে। কালো কেউটের মতো বিনুনী ঘুরে এসে পড়েছে বুকের ওপর—তাতে পলাশ-কুঁড়ির কাজ। তার অঙ্গে কোনো আভরণ নেই। সেই কারণেই বুঝি আকর্ষণ বেড়ে উঠেছে শতগুণে।

চোখের পলক ফেলতেও ভুলে গেছিল সৌরভ। মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল শুধু একটাই শব্দ—রতিরঙ্গবিলাসিনী! এক লহমার মধ্যে কিন্তু সন্ধ্যা একটা কাণ্ড করে বসল। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ছুটে এল সৌরভের সামনে। ভুজঙ্গিনীর মতো দুই বাহু তুলে সৌরভকে সবলে জাপটে ধরে নিমেষে টেনে নিয়ে গেল তমিস্রাময় সঙ্কীর্ণ গলিটার মধ্যে।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিল সৌরভ। ডাকসাইটে সাংবাদিক সৌরভ গুহ। লম্বা মেয়েটা তার পীবরকোমল বুক রেখেছে সৌরভের কপাট বুকের ওপর। মাথার চুল থেকে ভেসে আসছে এমন একটা খোশবাই যা মাতাল করে মনকে।

সৌরভ বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠে কথা বলতে গেছিল, সন্ধ্যা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ফিস-ফিস করে গাঢ় সুরে বলেছিল গভীর

অন্ধকারে–"কেন এসেছেন? কেন এসেছেন? আমার জন্যে?"

বলেই সৌরভের মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছিল সন্ধ্যা। নিঃসীম অন্ধকারেও যেন তার কালো চোখ জোড়া নক্ষত্রর মতো জ্বলছে। অথবা যেন যুগল 'ব্ল্যাকহোল'। অনন্ত রহস্যে ভরা।

খাটো গলায় বলেছিল সৌরভ–"তোমার কথা শুনতে, এই মন্দিরের রহস্য জানতে, ঐ লম্বা পুরুতটার পেট থেকে খবর বের করতে।"

"ভৈরব ভটচায? খুন করে ফেলবে আপনাকে। চলুন পালাই।"

"পালাবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখান থেকে নিয়ে চলুন আমাকে। আপনার সেবাদাসী হয়ে থাকব। আপনার বউয়ের পায়ের জুতো হয়ে থাকব।"

ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল সৌরভের মাথার ভেতরটা। সন্ধ্যা এখনও তার বুকে লেপটে আছে। কথা বলার সময়ে তার মুখ থেকে ভেসে আসছে লবঙ্গর গন্ধ। গলার সুরে আদিম আকর্ষণ। শিরশির করে ওঠে সৌরভের সর্বাঙ্গ।

আর ঠিক সেই সময়ে মন্দিরের পাথরগুলোয় যেন ফাটল ধরে যায় এক অমানুষিক আর্তনাদে।

গর্ভগৃহের ভেতর থেকে ভেসে এল রক্ত জল-করা সেই চিৎকার। তারপরেই ঠক্ ঠক্ ঠক্ করে যেন তিনটে কসাইয়ের কোপ পড়ল কাঠের ওপর রাখা মাংসের ওপর। পরক্ষণেই ধপাস করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল একটা ভারি বস্তু।

থ হয়ে গেছিল সৌরভ। ডাকাবুকো সাংবাদিক সে। কিন্তু জীবনে এ হেন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। মুহূর্তে মুহূর্তে এত রোমাঞ্চ?

অকস্মাৎ অদ্ভুত চিৎকার করে উঠে সৌরভকে ছেড়ে দিয়ে গলি থেকে জ্যা-মুক্ত তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল সন্ধ্যা। সে চিৎকার বুক চাপড়ানো হাহাকার, না পিঞ্জর থেকে উড়ে যাওয়ার উল্লাস, তা সঠিক বোঝা গেল না।

সৌরভ কিন্তু যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু। অবশ। তখনও স্তম্ভিত। কে চেঁচালো অমনভাবে? রাত্রি নিশীথে এই থমথমে পরিবেশে এ কোন নাটক জমে উঠেছে পাতাল-ঘরে?

সন্ধ্যা ততক্ষণে ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়েছে বন্ধ দরজার ওপর। এঁটেসেঁটে থাকা পাল্লা দুটো দমাস করে খুলে গেছে ওর দেহের ভারে। গলির ভেতর থেকে সৌরভ দেখছে, ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল সন্ধ্যা। তার লবঙ্গলতিকা তনুর পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেঝেতে লম্বমান একটা দেহ।

সৌরভ আর কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ধেয়ে গেল গর্ভগৃহে।

মেঝেতে আছড়ে পড়া দেহটা পুরোহিত ভৈরব ভটাচাযের। দুচোখের পাতা পুরোপুরি খোলা। চোখের তারায় তারায় প্রকটিত পুঞ্জীভূত আতঙ্ক আর বিভীষিকা। নাক-মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। খুলি আর কপাল চৌচির। পাশে পড়ে একটা লাঠি। হাতলটা রুপো দিয়ে বাঁধানো।

আর, জোরে জোরে দুলছে মন্দিরের চূড়ো থেকে নেমে-আসা লম্বা শেকলটা। সোনার মুকুটও দুলছে ঘন ঘন।

ঘরের বাতাসে একটা উৎকট গন্ধ।

এইবার খেলে গেল সৌরভের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। খপ করে তুলে নিলে লাঠিটা।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিল, তাই। রুপোর হাতলে সিসে ঠাসা। তাই এত ভারি। এরই চোটে খুলি আর কপাল গুঁড়িয়েছে ভৈরব ভটচাযের।

চোখ তুলে তাকায় সৌরভ। সন্ধ্যা চেয়ে রয়েছে অন্যদিকে। সেদিকে মেঝেতে পাতা রয়েছে হরিণের চামড়া। সামনে কোষাকুষি। আর নেহাতই বেমানান একটা বস্তু। সবুজ প্লাস্টিকের একটা জাগ।

সিধে হয়ে দাঁড়াল সৌরভ। শূন্য ঘরে রহস্যময় এই হত্যা নিয়ে তার মাথা ঘামানোর আর দরকার নেই। এখুনি চম্পট দেওয়াই মঙ্গল।

সন্ধ্যা ওর দিকে ফিরে তাকিয়েছে। কালো চোখে আশ্চর্য দ্যুতি। ফুলে উঠেছে নাকের পাটা। ঠোঁট শক্ত।

"কোথায় যাচ্ছেন?"

ক্যামেরা-কেসের বাটন খুলতে খুলতে সৌরভ বললে–"আগে ডিউটি, তারপর পলায়ন।"

ছোঁ মেরে হাত থেকে ক্যামেরা কেড়ে নিল সন্ধ্যা–"ভগবান ভৈরব ঠাকুর যাকে মেরেছেন, তার ফটো তুলতে যাবেন না। তাকে নিয়ে আর কেচ্ছা করবেন না। তাকে ভুলে যান। শুধু আমাকে নিয়ে চলুন।"

"তোমাকে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে।" কালো বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে সন্ধ্যার দুই চোখে–"এই পাপমন্দিরে আর এক মুহূর্তও নয়। পাপের সাজা পেয়েছে ভৈরব ভটচায–আমি থাকলে আমিও মরব। পাপ তো আমিও করেছি।" বলতে বলতে দুলন্ত শেকলের দিকে ফিরে চাইল সন্ধ্যা। মশালের লাল আভায় সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তখনও দুলে দুলে উঠছে সোনার মুকুট। অদৃশ্য বিচারকের অমোঘ বিধান যেন ঐ সুবর্ণ-কিরীট।

আচমকা সৌরভের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্ধ্যা। হতচকিত সৌরভের সমস্ত স্মার্টনেস উধাও হয় এই দুঃসাহসিকতার সামনে। ওকে ঠেলে গর্ভগৃহের বাইরে বের করে দিয়ে কপাট বন্ধ করার আগে কালো কটাক্ষ হেনে বলে সন্ধ্যা–"এক মিনিট। আমি আসছি।"

রাত প্রায় একটা।

বারান্দায় ঠায় দাঁড়িয়ে মৃদুলা। আজ ওদের বিয়ের সপ্তম দিবস। আর আজকেই কিনা সৌরভ নিপাত্তা হলো?

রাতের খাওয়া শেষ হতেই সৌরভ বলেছিল–"মৃ, ছোট্ট একটা ডিউটি সেরে আসি, কেমন? ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরব।"

যৌবনস্পর্ধিত বক্ষদেশের ওপর থেকে জরিপাড় আকাশী রঙের শাড়ির আঁচল সরিয়ে দামিনী-নয়নে বলেছিল মৃদুলা–"এত রাতে ডিউটি? কোথায় গো?"

এক হাতে ক্যামেরাটা টেনে নিয়ে আর এক হাতে বউয়ের টোল পড়া ফর্সা গাল দুটো টিপে দিয়ে সৌরভ বলেছিল কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে–"তোমার সতীনের কাছে।"

সেই থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মৃদুলা। হু-হু হাওয়ায় বড় ভাল লাগে এই সময়ে বারান্দায় দাঁড়াতে। সমুদ্র অশান্ত গর্জন করেই চলেছে। ফেনার মুকুট ঢেউয়ের মাথায় বয়ে এনে একটার পর একটা আছড়ে যাচ্ছে বালির ওপর। সৈকতে বসে আছে জোড়ায় জোড়ায় নারীপুরুষ। এ হোটেলের বারান্দাগুলিও খালি নেই। উদর সেবার পর সকলেই বায়ু সেবন করে চলেছে ঘরের লাগোয়া চিলতে বারান্দাগুলোয়।

রাত এগারোটা পর্যন্ত ইন্দ্রনাথ রুদ্রও ছিল পাশের বারান্দায়। আড়চোখে দেখে গেছে মৃদুলা। ডিটেকটিভরা এত ভাবুক হয়? কাহিনীগুলো তাহলে সত্যি? সত্যিই কড়ি আর কোমল চরিত্রের অধিকারী অত্যন্ত সুপুরুষ এই মানুষটা?

রাত বারোটার সময়ে ইন্দ্রনাথ উঠে গেল ঘরের মধ্যে। অথচ জ্বালা রইল ঘরের আলো। নিশ্চয় বই পড়ছে।

আর কতক্ষণ প্রতীক্ষায় থাকবে মৃদুলা? হোটেলের গেট বন্ধ হয়ে গেছে রাত ঠিক দশটায়। সৈকত এখন জনশূন্য। চাঁদের আলোয় অপরূপ লাগছে সমুদ্রের সদা-চঞ্চল ঢেউগুলো। প্রাণশক্তিতে ভরপুর সৌরভের গায়ে গা লাগিয়ে এই মুহূর্তগুলোই উপভোগ করার বাসনা নিয়ে বিয়ের পাট শেষ করেই এখানে চলে এসেছিল মৃদুলা। কিন্তু আক্কেলের বলিহারি যাই মানুষটার। বিপদ-

আপদ হলো না তো?

বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে মৃদুলার।

আর ঠিক সেই সময়ে একটা সাইকেল রিকশা ঝরঝর ঝরঝর শব্দ করতে করতে এসে দাঁড়াল বন্ধ গেটের সামনে।

কিন্তু ও কি! রিকশায় সৌরভের পাশে ও মেয়েটা কে?

মেয়েটা এখন দাঁড়িয়ে আছে মৃদুলার সামনে।

সৌরভ দেখছিল দুজনকে। একজন দারুণ ফর্সা। আর একজন দারুণ কালো। কিন্তু দুজনেরই মাথা থেকে পা পর্যন্ত যৌবনের ঢল নেমেছে।

সন্ধ্যা এখন বিনম্র। মৃদুলা কিন্তু উগ্র।

গলায় যেন খোলা ক্ষুর ঝলসে ওঠে—"একে এনেছ কেন?"

সন্ধ্যার হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে বারান্দায় রেখে এল সৌরভ। বলল—"সন্ধ্যা, রাতটা ঐখানে কাটাও। মৃ, সব বলছি।"

রাত কাটল। ভোর হলো। দরজার কড়া নড়ে উঠল।

সৌরভের বাহুতে মাথা রেখে বুকে মুখ গুঁজে তখন সুখস্বপ্ন দেখছে মৃদুলা। মৃদু মৃদু হাসছে। কর্কশ কড়া-নিনাদে তার ঘুম ভাঙল না।

ভাঙল সৌরভের। মৃদুলার মাথার তলা থেকে বাহুটা সন্তর্পণে সরিয়ে এনে নামল খাট থেকে।

এবার আরও জোরে ধাক্কা পড়ল দরজায়।

অত্যন্ত বিরক্ত হয় সৌরভ। এরকম অসভ্যতা অন্ততঃ এই হোটেলে আশা করা যায় না।

পাজামার দড়িটা আঁটতে আঁটতে গিয়ে দরজা খুলেই চমকে উঠল ভীষণভাবে।

এ যে ধড়াচূড়া আঁটা পুলিশ অফিসার! রোদে পোড়া কালো হনু-উঁচু মুখখানা বুঝি ড্রাকুলা সিনেমা থেকে নেমে এসেছে। চোখে লাল রক্তের ছিটে। কষ বেয়ে রক্তের বদলে গড়াচ্ছে পানের কষ। হাসছে অকারণে—ফলে বেরিয়ে পড়েছে কুকুরে দাঁত দুটো।

পেছনেই দাঁড়িয়ে হোটেলের মালিক শশধর সাহা। গোল ফুটবলের মতো মাথায় যেন শুকনো খড় খাড়া হয়ে আছে। ভদ্রলোকের টাক কপাল থেকে শুরু করে শেষ হয়েছে ঘাড়ের ওপর। কানের ওপর সাদা লম্বা চুলগুলো একটু হাওয়া পেলেই দাঁড়িয়ে উঠে খড়ের মতো। খাঁদা নাক, মোটা ঠোঁট আর লোমশ ভুরু। গোল মুখ আর গোলগাল চেহারা। শশধর সাহা এ অঞ্চলে একখানা দর্শনীর বস্তু।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মৃদুলা।

এ হেন বস্তুটি আকর্ণ হেসে বললে—"ভেতরে চলুন, স্যার। এখানে কথা বললে হোটেলের দুর্নাম হবে। পার্টিরা মচকে যাবে।"

পেছন ফিরে তাকায় সৌরভ। খাটে উঠে বসেছে মৃদুলা। অনাবৃত বুকের ওপর চাদর টেনে ধরেছে।

শুষ্ক কণ্ঠে বললে সৌরভ—"মৃ, তৈরি হয়ে নাও। গেস্ট এসেছেন। সন্ধ্যাকে উঠিয়ে দাও।"

ঘরের দরজা এখন ভেজানো। খাটে বসে সৌরভ আর মৃদুলা। চেয়ারে শশধর সাহা আর দেখন-হাসিয়ে ড্রাকুলা মার্কা পুলিশ অফিসার। সন্ধ্যা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে এক কোণে। ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে।

সৌরভ মঞ্চে হিরোর পার্ট করেছে অনেকবার। ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে জানে। মনে যা ভাবে, মুখে তা ফোটায় না।

এখন তার অন্তরজোড়া আতঙ্ক। মুখ কিন্তু নির্বিকার।

বললে জলদগম্ভীর গলায়—"কি হেতু আগমন?"

ড্রাকুলা মার্কা অফিসার বললে—"মহাশয় কি নাটক করেন?"

"আপনাকে দেখে করতে ইচ্ছে যাচ্ছে। এত সকালে উপদ্রব কেন?"

মোষের শিং থেকে তৈরি কালো কুচকুচে নস্যির ডিবে বের করল পুলিশ অফিসার। পেঁচিয়ে ঢাকনি খুলতে খুলতে বললে—"কাল রাতে কোথায় ছিলেন?"

"ডিউটিতে। এই আমার প্রেস কার্ড।"

বড় বড় লাল হরফে PRESS লেখা কার্ডের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে অফিসার। ফটোটার সঙ্গে মিলিয়ে নেয় সৌরভের মুখ।

"হুম। সৌরভ গুহ। আপনাকে থানায় আসতে হবে। আর ঐ মেয়েটাকেও।" শেষের কথাটা বর্ষিত হলো সন্ধ্যাকে লক্ষ্য করে। লাল চোখের চাউনি দেখেই সে বেচারি ভয়ে কেঁচো হয়ে গেছে।

"কেন?" একটুও না দমে বললে সৌরভ।

"ভৈরব মন্দিরের পুরোহিত ভৈরব ভটচাযকে খুন করার জন্যে। আর," বলে ফোঁ-ফোঁ করে দু নাকে নস্যি টেনে নিয়ে নাক মুছতে মুছতে—"সোনার মুকুট চুরি করার অপরাধে।"

এবার আর অ্যাকটিং নয়। প্রকৃতই চমকে ওঠে সৌরভ। নিমেষমধ্যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা দৃশ্য।

গর্ভগৃহ থেকে একটা পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে আসছে সন্ধ্যা। কি আছে তাতে, তা জানতে চায়নি সৌরভ। নিশ্চয় জামাকাপড় আর ব্যক্তিগত জিনিস।

লাল চোখ পাকিয়ে সৌরভের মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করে গেল অফিসার। সৌরভ যে অজান্তে প্রথমে সন্ধ্যা, পরে বারান্দার দিকে তাকিয়েছে, তাও দেখল।

উঠে দাঁড়াল পরক্ষণেই। লম্বা লম্বা পা ফেলে পৌঁছল বারান্দায়। ফিরে এল সেই পোঁটলাটা নিয়ে।

তীব্র কণ্ঠে শুধাল সন্ধ্যাকে—"কি আছে এতে?"

সন্ধ্যার ওষ্ঠাধর ঈষৎ দ্বিধাবিভক্ত হলো—শব্দ বেরোল না।

খাটের ওপর পোঁটলা রেখে গিঁট খুলল অফিসার।

ওপরে খান কয়েক শাড়ি আর ব্লাউজ টেনে তোলার পর তলায় দেখা গেল সোনার মুকুটটা। আর, একটা চামড়ার থলি।

চামড়ার ফিতে দিয়ে কষে বাঁধা মুখটা। গিঁট খুলতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায় ড্রাকুলা মার্কা অফিসার।

তারপরেই উন্মুক্ত হলো থলির মুখ। উপুড় করে ভেতরকার বস্তুগুলোকে ঢেলে দিল খাটের সাদা চাদরের ওপর।

তখন জানলা দিয়ে রোদ ঢুকছে। আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে খাটে পড়ছে। সেই আলোয় সহস্র রামধনুর রঙ ছিটিয়ে ঝলমল করে উঠল একরাশ জহরৎ।

সৌরভ নিষ্পলক। স্তম্ভিত। কানের কাছে ধ্বনিত হলো পুলিশ অফিসারের বিদ্রূপ কণ্ঠ—"থানায় চলুন প্রেসবাবু। এই মেয়ে—চল্!"

আর ঠিক তখনই নাটক মোড় নিল অন্যদিকে।

দোরগোড়া থেকে ভেসে এল শীতল কণ্ঠস্বর—"শশধরবাবু, এ ঘরে আসতে বললেন কেন?"

ভেজানো পাল্লা খুলে দরজার ফ্রেমে ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে যেন চলমান ছবির নায়ক—ইন্দ্রনাথ রুদ্র। দাঁতে কামড়ে আছে টোব্যাকো পাইপ—সরু সুতোর মতো ধোঁয়ার রেখা ওপরে উঠে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

হেঁ হেঁ করে উঠল শশধর সাহা—"দেখুন দিকি কি ঝঞ্ঝাট! মার্ডার কেস। চুরির কেস। আপনি স্যার দেখুন হোটেলের যেন দুর্নাম না হয়। খবর পাঠিয়েছিলুম ঐ জন্যেই।"

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে হাতে ধরল ইন্দ্রনাথ। ভেতরে এসে ফের ভেজিয়ে দিল দরজা।

বলল—"সংক্ষেপে বলুন।"

এতক্ষণ এই উটকো উৎপাতের দিকে জ্বলন্ত চাহনি নিক্ষেপ করে চলেছিল ড্রাকুলা মার্কা পুলিশ অফিসার। এবার ছাড়ল পুলিশী হুঙ্কার—"আপনি আবার কে?"

সঙ্গে সঙ্গে কাঁচুমাচু হয়ে যায় শশধর সাহা—"আজ্ঞে উনি স্যার ইন্দ্রনাথ রুদ্র—"

"স্যার নয়, শুধু ইন্দ্রনাথ রুদ্র। প্রাইভেট ডিটেকটিভ," মন্দ্রমন্থর কণ্ঠে বললে ইন্দ্রনাথ—"আপনি বিনোদ নায়েক?"

চোয়াল ঝুলে পড়ে পুলিশ অফিসারের—"আ-আপনি আমাকে চেনেন?"

"নামে চিনি। কেসটা কী?"

"কাল রাতে এই ভদ্রলোক গেছিলেন ভৈরব মন্দিরে। আজ সকালে পূজোরীরা দেখে ভৈরব ভটচায, আই মীন, পুরুত ঠাকুরের মাথা ফেটে চৌচির। পুরুতের লাঠি দিয়েই তাকে খুন করা হয়েছে। সেবাদাসী পালিয়েছে। সোনার মুকুটও নেই। এখন দেখা যাচ্ছে মন্দিরের জহরতও লোপাট হয়েছে। ঐ দেখুন।"

বুকের ওপর এক হাত ভাঁজ করে রেখে আর এক হাতে পাইপ ঠোঁটে ঠেকিয়ে শুনে গেল ইন্দ্রনাথ।

তারপর বললে ধীর স্বরে—"এই ভদ্রলোক—আপনার নাম—?"

শুষ্ক কণ্ঠে বললে সৌরভ—"সৌরভ গুহ।"

"উনি যে কাল রাতে মন্দিরে গেছিলেন, তার প্রমাণ?"

এতক্ষণে একটা বিষম ধূর্ত হাসি ছাড়ল বিনোদ নায়েক। ফলে, আর কদর্য দেখাল মুখখানা—লাল ছোপধরা দাঁতগুলো প্রকট হয়ে যাওয়ায়।

বললে কাটা কাটা গলায়—"এক নম্বর প্রমাণ এই ক্যাশ মেমোটা। এই হোটেলের ম্যাকস বারের ঠিকানা। রুম নাম্বার থার্টি এইট। মৃতদেহের পাশে পড়েছিল এই ক্যাশ মেমো," বলতে বলতে বুক পকেট থেকে কাগজটা টেনে বের করল বিনোদ নায়েক—"দেখবেন?"

"না। সৌরভবাবু, ক্যাশ মেমো আপনি ফেলে এসেছিলেন? আর কেউ রেখে আসেনি তো?"

"না, না, আমার ক্যামেরার ফাঁকে গোঁজা ছিল। পড়ে গেছে।" গলা ভেঙে গেছে সৌরভের।

"বিনোদবাবু", ইন্দ্রনাথ পাইপে বার কয়েক টান দিল—"দু নম্বর প্রমাণ আছে নাকি?"

"সাক্ষী আছে। রিকশাওয়ালাকে পাকড়েছি। একই রিকশাতে উনি একা গেছেন, ফিরে এসেছেন এই পাজী মেয়েটাকে নিয়ে। চলুন, চলুন, এবার ওঠা যাক।"

কিন্তু নাটক যে এত মুহুর্মুহু মোড় নেবে তা কে জানত?

সকৌতূহলে আপনি সব দেখছেন। আপনিও কি জানতেন সন্ধ্যার আর এক রূপ দর্শনের সৌভাগ্য আপনার হবে?

এক কোণে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল কালো বিদ্যুতের মতো হিলহিলে যে মেয়েটা, এবার তাকান তার চোখের দিকে। কি দেখছেন? বাঘিনীর চোখের মতো মনে হচ্ছে নাকি? শিকার ধরার পূর্বমুহূর্তে যেন নিশানা ঠিক করে নিচ্ছে!

আচম্বিতে পৈশাচিক সুর জাগ্রত হলো তার কানের পর্দা ফাটানো তীক্ষ্ণ চিৎকারে—"খুনী! খুনী! খুনী! আমার রক্ষককে মেরেছে! আমার ইজ্জৎ কেড়েছে! এখন আমাকেও মারতে চলেছে। খুনী! খুনী! খুনী!"

ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ বজ্রপাত ঘটলেও বুঝি এমনভাবে কেউ চমকে উঠত না। মৃদুলার মুখের দিকে আর তাকানো যাচ্ছে না। এরকম হানিমুন কেউ কোনোদিন কল্পনা করেছে? সৌরভ! সৌরভ! এ কি করলে তুমি?

আর তারপরেই সত্যি সত্যি প্রলয় ঘটল ঘরের মধ্যে।

ইন্দ্রনাথ ভেজানো দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল। পিঠের দিকে দরজার পাল্লা দুটো যে এক ইঞ্চির মতো ফাঁক হয়েছে, তা তার দেখবার কথা নয়। কারোরই সেদিকে নজর নেই তখন। রণরঙ্গিনী পিশাচিনী সন্ধ্যা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে।

পাল্লা দুটো ইঞ্চি খানেক ফাঁক হতেই একটা কালো নলচে ঢুকে এল সেই ফাঁকে। তারপর গুলি বর্ষণ হলো তার মধ্যে থেকে। পরপর দুবার। দুটো গুলিই ইন্দ্রনাথের ডান কাঁধের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে দিল সন্ধ্যার বুকের বাঁ দিক।

ইন্দ্রনাথের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখা গেল সঙ্গে সঙ্গে।

মুখের পাইপ মুখে রেখেই চকিতে উবু হয়ে বসে পড়ল, কোমর থেকে রিভলবার টেনে বের করল এবং ঘুরে গিয়েই দরজা টেনে খুলে ফেলে বসে বসেই পরপর দুবার গুলিবর্ষণ করল সিঁড়ির দিকে।

চোস্ত বিলিতি সুট পরা ব্রোঞ্জকঠিন পুরুষটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বটে, কিন্তু প্রাণ নিয়ে নয়। নিষ্প্রাণ দেহটা আছড়ে পড়ল দোতলার চাতালে। ইন্দ্রনাথের গুলি কখনো ফসকায়নি—ফসকায় না—ফসকাবে না!

বিনোদ নায়েক যেন কিরকম হয়ে গেছে। এ হেন ক্লাইম্যাক্সের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। সন্ধ্যার রক্তাক্ত কলেবরকে লুটিয়ে পড়তে দেখে জ্ঞান হারিয়েছে মৃদুলা। সৌরভ মুহ্যমান। শশধর সাহা বোধহয় এবার কেঁদে ফেলবে।

সিধে হয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ। সারা হোটেলে তখন হইচই আরম্ভ হয়ে গেছে।

রিভলবারটা কোমরে গুঁজে প্রশান্ত স্বরে বললে ইন্দ্রনাথ—"মালয়েশিয়ার মুশা হিতম-এর নাম শুনেছেন বিনোদবাবু? শোনেননি। গভর্নমেন্টের অ্যান্টি-নার্কোটিকস কমিটির মাইনে করা জল্লাদ। ও দেশে হেরোইন পাচার যে করে, তার ফাঁসি হয়। ভৈরব

ভটচায আর সন্ধ্যার লাশ ফেলতেই মুশা হিতম এসেছিল এখানে। দুজনেই সে খবর পেয়ে পালাবার মতলব এঁটেছিল। কারণ ঐ মন্দিরের তলায় উষ্ণ প্রস্রবণের পাশে পাথরের সুড়ঙ্গে পাবেন হেরোইনের স্টক। মালয়েশিয়ার যুবসমাজের সর্বনাশ রোধ করতেই মুশা হিতম এসেছে শুনে আমিও এসেছিলাম খুনোখুনি রোধ করতে। কিন্তু খুন করলাম নিজেই। সে কৈফিয়ৎ দেব যথাস্থানে। এবার বলুন সৌরভবাবু, ভৈরবকে কে খুন করেছে?"

ঢোক গিলল সৌরভ। তার গলা শুকিয়ে গেছে। জড়ানো স্বরে বললে—"ভগবান ভৈরব ঠাকুর নিজে।"

অচঞ্চল স্বর ইন্দ্রনাথের—"খুলে বলুন।"

ঘরের বাইরে তখন হট্টগোল। 'খুন! খুন!' চিৎকার। দরজা খুলে গেল এক ধাক্কায়।

ইন্দ্রনাথ শুধু চাইল শশধর সাহার দিকে। বুঝল শশধর। উঠে গিয়ে বাইরে থেকে দরজা টেনে দিয়ে ভিড় হটাতে লাগল গলাবাজি করে।

সেই ফাঁকে গতরাতের ঘটনা সংক্ষেপে বলে গেল সৌরভ।

সব শুনে বিনোদের দিকে তাকিয়ে বললে ইন্দ্রনাথ—"চোখ দেখে চরিত্র বোঝা যায়। সৌরভবাবু নিষ্পাপ। রহস্যটার কিনারা এখুনি করতে চাই। যাবেন আমার সঙ্গে? সৌরভবাবু, আপনিও চলুন। মিসেস গুহকে আমার ঘরে রেখে যান।"

এবার আর রিকশা নয়, পুলিশ জীপ। বটের জঙ্গলের উঁচু-নিচু রাস্তা বেয়ে ছুটছে জীপ। এ অঞ্চলে বাঁদরের বসবাস একটু বেশি। ডালে ডালে তাদের লাফালাফি বেড়েছে ছুটন্ত জীপের গর্জনে। বাঁ দিকের জঙ্গলে অনেকগুলো কাক উড়ছে। কর্কশ নিনাদে আকাশ বাতাস ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে।

এসে গেছে মন্দির। জীপের মধ্যে জুতো রেখে নেমে পড়ল তিনজনে—ইন্দ্রনাথ, সৌরভ আর বিনোদ।

প্রবেশ-পথেই পুলিশ পাহারা বসেছে। পুজোরীরা ঢুকতে পারছে না। দু পাশে কুষ্ঠ-রুগী ভিখিরিরা যথারীতি কাপড় বিছিয়ে রোজগার করে চলেছে। আজ তাদের ব্যবসা ভালই চলছে।

গর্ভগৃহ। ভৈরব ভটচাযের লাশ এখনও পড়ে রয়েছে। মাছি উড়ছে মুখের ওপর। মশাল নিভু নিভু।

টর্চের আলোয় মুকুটহীন শেকলটা দেখল ইন্দ্রনাথ। অনেক উঁচুতে চূড়োয় আটকানো শেকলের অগ্রভাগ। তলায় ঝুলত সোনার মুকুট—এখন তা নেই।

টর্চের আলো নেমে এল মৃতদেহের পাশে। হরিণের চামড়া, কোষাকুষি। সবুজ প্লাস্টিকের জাগ।

জাগের ঢাকনি খুলেছে ইন্দ্রনাথ। গন্ধ শুঁকছে। নাক সিঁটকে বললে—"দিশী মদ। গেলাসটা কোথায়?"

গেলাস!

চড়াং করে ওঠে সৌরভের মাথার ভেতরটা। গেলাস! বউকে নিয়ে পুজো দিতে এসে সবুজ জাগের পাশে একটা সবুজ প্লাস্টিকের গেলাস সে দেখেছিল। ভৈরব ভটচাযের মৃত্যুর পর ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে শুধু জাগটা দেখেছিল—গেলাস তো দেখেনি!

"গেলাস!"

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে ইন্দ্রনাথ—"হ্যাঁ, গেলাস। কিছু বলবেন?"

বলল সৌরভ, "গেলাস ছিল না মৃতদেহের পাশে।"

স্বগতোক্তি করল ইন্দ্রনাথ—"রহস্যটা ঐখানেই। গেলাস নেই, কিন্তু শেকল দুলছে। চলুন, বাইরে যাওয়া যাক।"

রহস্যটা ফাঁস করে দিলে কুষ্ঠরুগী ভিখিরিগুলো। যাদের দিকে ঘৃণাভরে কেউ ফিরে তাকায় না। তারা কিন্তু সব দেখে, সব বোঝে, সব জানে।

ইন্দ্রনাথ এদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে কি জিজ্ঞেস করেছিল, তার বিশদ বিবরণে যাওয়ার দরকার নেই। তাদের অনেকেই আঙুল তুলে দেখিয়েছিল জঙ্গলের সেই দিকে—যেখানে সমানে গলাবাজি করে চলেছে কাকগুলো।

তিন মূর্তি তক্ষুণি অভিযানে গেছিল সেখানে। আশ্চর্য জঙ্গল বটে। পায়ের তলায় বালি—মাথার ওপর ডাল-পাতার চাঁদোয়া। শাখামৃগ আর বায়স বাহিনীর চিৎকারে কানের পোকা বেরিয়ে যায় আর কি!

এসে গেছে হট্টগোলের মূল অঞ্চল। এখানে বটের ভিড় একটু কম। বালির ওপর চিৎপাত হয়ে পড়ে একটা বড়সড় মুখপোড়া হনুমান। মরে কাঠ।

রাজ্যের বাঁদর জড়ো হয়েছে সেইখানে। গোল হয়ে ঘিরে রয়েছে মড়াটাকে।

তিন মূর্তিকে দেখেই চনমনে হয়ে ওঠে বাঁদরের দল। ভাবভঙ্গী সুবিধের মনে হয় না। চড়াও হবে নাকি?

গলা চড়িয়ে ইন্দ্রনাথ বললে—"বিনোদবাবু, ভৈরব ঠাকুরের হত্যাকারী ঐ হনুমান।"

"অ্যাঁ!" বিনোদ যেন খাবি খায়। "বলছেন কি?"

"বাঁদররা কিছু ভোলে না। তারা মানুষের অনুকরণও করে। প্রতিহিংসাও নেয়। কালোমুখো একটা হনুমান বহুদিন ধরে পুজোরীদের ডালি থেকে কলা কেড়ে খাচ্ছিল দেখে ভৈরব ভটচায একদিন তাকে লাঠিপেটা করে। লাঠিটাকে চিনে রাখে সেই হনুমান। চিনে রাখে ভৈরব পুরুতকে। মন্দিরের উঁচু ফোকরের নাগাল মানুষে পায় না—কিন্তু বাঁদরে পায়। সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে লাফিয়ে শেকল ধরে নেমে কলা খাওয়া নিশ্চয় তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছিল। কাল রাতে সে কেন ঐ ফোকর গলে শেকল বেয়ে গর্ভগৃহে নেমেছিল, তা ভগবান জানেন আর জানত ঐ হনুমান মহাপ্রভু। হয়ত তাকে দেখেই লাঠি তুলেছিল ভৈরব ভটচায—তক্ষুণি অনুকরণ প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়েছে হনুমান। লাঠি ছিনিয়ে পিটিয়েছে ভৈরব ভটচাযকে। তারপরেই নিয়ে গেছে গেলাসটা।"

ঝটিতি প্রশ্ন করল বিনোদ—"কেন? হনুমান গেলাস নেবে কেন?"

"গেলাসে মদ ছিল বলে। ভৈরব তখনও চুমুক দেয়নি—অথবা চুমুক দিতে যাচ্ছে—এমন সময়ে আবির্ভাব ঘটে হনুমানের। আপনার পায়ের কাছে খালি গেলাসটা গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

বালির ওপর থেকে সবুজ গেলাস তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ফের বললে ইন্দ্রনাথ—"হুঁ, যা ভেবেছিলাম, তাই। মদের গন্ধ। ফোরেনসিক ল্যাবে পাঠালে গেলাসের গায়ে বিষ পাবেন।"

"বিষ!" বিনোদ এবার বিহ্বল।

"আগে থেকেই মাখিয়ে রাখা হয়েছিল, যাতে মদ ঢেলে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ কাজ শুরু করে দেয়। বিনোদবাবু, হনুমানের হত্যাকারী সন্ধ্যা।"

"সন্ধ্যা!"

"মুখখানা ওরকম করবেন না। হাসি পাচ্ছে। মদ খাওয়ার লোভেই গেলাস ছিনিয়ে নিয়েছিল হনুমান। নিশ্চয় বহু রাতে সে দেখেছে ঠিক ঐ সময়ে ভৈরবের মদ্যপান, কিন্তু জানত না গেলাসে আছে বিষ।"

"সন্ধ্যার কাজ?" যেন বিশ্বাস করতে পারে না সৌরভ।

"হ্যাঁ, সন্ধ্যারই কাজ। পাপ তার চিন্তায়, পাপ তার কাজে। ভৈরব তাকে দিয়ে অনেক পাপ কাজ করিয়েছে। পালিয়ে গিয়ে আরও করাত। কিন্তু পার পেত না মুশা হিতমের হাত থেকে। মুশা খুঁজছিল দুজনকেই। তাই গেলাসে সে বিষ মাখিয়ে রেখেছিল—মুশা হিতমের মেন টার্গেট মদ্যপানের পর অক্কা পেত। সোনার মুকুট আর জহরত নিয়ে হাওয়া হয়ে যেত সন্ধ্যা একাই—কিন্তু সৌরভবাবু, সেই সময়ে আপনি গিয়ে পড়ায় তার মাথায় খেলে যায় নতুন প্ল্যান। আপনার আড়ালে থেকে গা ঢাকা দেওয়ার অভিনব প্ল্যান। কিন্তু প্ল্যান ভণ্ডুল করে দিল আপনার ক্যাশ মেমোটা।"

"রিকশাওয়ালাটা?" আমতা আমতা করে বলে বিনোদ নায়েক।

মুচকি হাসল ইন্দ্রনাথ—"খুনের মামলায় কেউ নিজেকে জড়াতে চায় না, বিনোদবাবু। সত্যিই কি আপনি কোনো রিকশাওয়ালাকে দিয়ে কবুল করাতে পেরেছেন? যদি তাকে পেতেন—সঙ্গে করেই আনতেন নাকি সৌরভবাবুকে সনাক্ত করার জন্যে?"

বোবা মেরে গেল ড্রাকুলা মার্কা পুলিশ অফিসার।

রোমাঞ্চকর কাহিনী, তাই না? এখনও কি যেতে চান বটের জঙ্গলের সেই পাতাল মন্দিরে, যেখানকার মেঝে গরম হয়ে থাকে উষ্ণ প্রস্রবণের উষ্ণতায়, যেখানকার অধিদেবতা বায়ুশরীর নিয়েও পাপের সাজা দিয়ে যান হনুমানের মাধ্যমে?

যাবেন না। আমার উপদেশ নিন।

ছবি : ধ্রুব রায়